গল্পসংগ্রহ

অজেয় রায়

গল্পসংগ্রহ

গল্পসংগ্রহ অজেয় রায়

লালমাটি

১৯৩৫-২০০৮
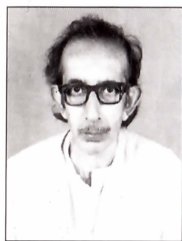
প্রকাশকের নিবেদন

ছোটোদের জন্য অ্যাডভেঞ্চারের গল্প নিয়ে বই প্রকাশ করার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই মনে ছিল।

'লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র' ছেপে বের করবার ব্যাপারে শান্তিনিকেতনে যাতায়াতের ফলে অজেয় রায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁরই বাছাই করা রচনা ও নির্দেশ নিয়ে এই সংগ্রহ প্রকাশ করা হল। কিন্তু তাঁর অকস্মাৎ প্রয়াণে তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার আশা অপূর্ণ রইল বলে মর্মাহত।

গ্রন্থশেষে লেখকের ভগিনী শ্রীমতী অপর্ণা দেবী ও তাঁর বন্ধুপ্রতিম শ্রীঅনাথনাথ দাস লেখকের পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য সংযোজন করে দেওয়ায় উপকৃত হয়েছি। গ্রন্থপ্রকাশে শ্রীসুবিমল লাহিড়ী, শ্রীকৃষ্ণেন্দু চাকী, শ্রীসুগত রায় ও শ্রীদেবাশিস সেন-এর সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

গল্পসংগ্রহ

অজেয় রায়

লালমাটি
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

Galpasangraha
by Ajeya Roy

প্রকাশ :
বইমেলা ২০০৯

প্রকাশক :
নিমাই গরাই

অক্ষরবিন্যাস :
লালমাটি
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
কৃষ্ণেন্দু চাকী

মুদ্রণ :
নিউ রেনবো ল্যামিনেশনস
৩১এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৭

মূল্য: ১০০ টাকা

উৎসর্গ

প্রিয় দেবাশিস ও অভিজিৎকে

সূচিপত্র

ভূমিকা

গল্প লেখার গল্প

পাকেচক্রে লেখক বনলাম।

এম এ পাসের রেজাল্ট বেরুতেই কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির দরখাস্ত ছাড়তে শুরু করেছিলাম। একটা মাস্টারি লেগে গেল। সংসারে অনটন। বাছবিচারের সময় নেই। তখুনি দিয়ে নিলাম।

জায়গাটা অচেনা; ব্যান্ডেলের কাছে। অজ পাড়াগাঁ নয়, তবে গ্রাম বটে। কোঠা বাড়ি অল্প। ধানক্ষেত, পুকুর, ঝোপজঙ্গল, খেলার মাঠ সব মিলেমিশে রয়েছে। স্কুলবাড়িটা পাকা। পুরনো স্কুল। দূর দূর থেকে ছেলেরা পড়তে আসে। বই আগলে ধুলো পায়ে ইস্কুলে হাজির হয়। শিক্ষকরা আসেন কেউ হেঁটে কেউ বা সাইকেলে।

কাছে একজনের বাড়িতে আমার থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক করে দিলেন হেডমাস্টারমশাই।

একেবারে ছোকরা এবং শহুরে লোক। নতুন মাস্টার সম্বন্ধে তাই ছাত্রদের কৌতূহল আর মেটে না। হাঁ করে দেখে তার ধরনধারণ পোশাকআশাক উলটো পালটা প্রশ্নও চলে। ভারি অস্বস্তি হয়। যা হোক মাসখানেক বাদে সামলে উঠলাম। সহকর্মী অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। তাঁরা আমায় আপন করে নিলেন।

কিন্তু ছাত্রদের নিয়ে বেশ মুশকিলে পড়লাম।

এখানে ছাত্ররা কড়া শাসনে অভ্যস্ত। তারা সাদামাটা বকুনির চেয়ে চড়চাপড় গাঁট্টাকেই বেশি মানে। আমি কারো গায়ে হাত দিতে পারি না। ছেলেরা আমার ক্লাসে বড্ড কথা বলে। পড়া করে আসে না। কথা না শুনলে ধমক দিই। চশমাটি চোখ থেকে নামিয়ে গুম মেরে থাকি। আমার শাস্তির দৌড় বড়োজোর— 'দাঁড়িয়ে থাক।'

ওসব থোড়াই কেয়ার করে ছাত্ররা। হেডমাস্টারমশাই খুব ডিসিপ্লিনের ভক্ত। তিনি লক্ষ্য করলেন ব্যাপার। একদিন আমায় ডেকে বললেন, 'মাস্টারমশাই, ক্লাসে ডিসিপ্লিনটার দিকে খেয়াল

রাখবেন। একটু গোলমাল হচ্ছে। ছেলেরা পড়াটড়া করে আসছে তো? দরকার হলে শক্ত হবেন।'

ভেবে পাই না কী করব!

অন্য মাস্টাররা বুদ্ধি দিলেন, 'অত নরম হলে কি ক্লাস ম্যানেজ করা যায়? একটু কড়া হন।'

ভূগোল স্যার বিপুলকায় ভূপেনবাবু বজ্রমুষ্টি আন্দোলিত করে হুংকার ছাড়লেন, 'এই! এই হচ্ছে দাওয়াই। এক ডোজ পড়লেই সব টিট। একদিন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখুন। ব্যাস প্রবলেম সলভড। এসব সোজা ছেলে নয় মশাই— বিচ্ছু! বিচ্ছু।'

অনেক টিচার মাথা নাড়লেন। মালুম হল ভূপেনবাবুর ফরমুলায় তাঁদেরও সায় আছে।

চুপ করে থাকি। ছাত্রদের মারধোর করতে আমার বাধে। যে স্কুলে পড়েছি সেখানে মারের রেওয়াজ ছিল না। আর নিজের বাড়িতে বা স্কুলে কখনো মার খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। আমার ধারণা মেরে ধরে ছেলেদের শোধরানো বা বাগানো যায় না। মারের ব্যথায় ছেলেরা প্রথম প্রথম ভয় পায় বটে। কিন্তু পরে মার সহ্য হয়ে গেলে ঠ্যাঁঠা হয়ে যায়। তার চেয়ে অন্তরে ঘা দিতে পারলে কথা শোনে। উপদেশগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছয়। কিন্তু উপায়টা যে কী ভেবে পাই না।

সব মাস্টার যে শাসন করতে ছাত্র ঠ্যাঙান তা নয়। কিন্তু তাঁদের ভারিক্কি চেহারা। চোখ পাকিয়ে ধমক, গার্জেন বা হেডমাস্টারমশাইকে নালিশ করার হুমকি, তাতেই কাজ হয়। সেটুকুও যে ভালো মতো পারি না। অল্প বয়স এবং নিরীহ চেহারা আমার কাল হয়েছে। ছাত্ররা পেয়ে বসেছে।

এইভাবে চললে যদি আমায় পার্মানেন্ট না করে? হেডমাস্টার যদি আমায় অযোগ্য ভাবেন? মনে মনে মুষড়ে পড়ি। উপায় একটা বেরিয়ে এল। অদ্ভুত উপায়। ক্লাস সিক্সে, ইংরেজি পড়াচ্ছি। হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা হয়ে গেছে। তখনও রেজাল্ট বেরোয়নি, পড়ার চাপ কম, ছেলেদের ক্লাসে আটকে রাখাই প্রধান কর্তব্য।

খানিক পড়ালাম। ছেলেগুলো আর পড়তে চায় না। ছটফট করছে। ক্লাসে গোলমাল শুরু হয়ে গেল। এই ছোটোদের বাগানোই বেশ কঠিন। পরীক্ষা বা পাঠ্য বিষয়ে আলোচনা করলে উঁচু ক্লাসে তবু খানিকটা কান দেয়। ছোটোদের ওসব মোটে ভালো লাগে না।

ধমক লাগাই— 'আঃ আস্তে। চুপ। কথা নয়।'

গোলমাল একটু থিতোয়, ফের বাড়ে। পাশের ঘরে হেডমাস্টারমশাই ক্লাস নিচ্ছেন। যদি তাঁর ডিসটারবেন্‌স হয়? উদ্‌বিগ্ন হই। 'স্যার একটা গল্প বলুন।' কচি গলায় অনুরোধ আসে।

আমি গল্প অনেক জানি। বই পড়া আমার নেশা। বিশেষত অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। আগেও ছেলেরা ধরেছে গল্প বলতে। সাহস পাইনি। কী জানি ক্লাসে গল্প বলা উচিত হবে কিনা? সেদিন মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। বললাম, 'বলতে পারি যদি তোমরা চুপ করে থাক। একদম কথা না বল। কী, রাজি?'

—'হ্যাঁ স্যার, হুঁ স্যার।' ক্লাসসুদ্ধু আশ্বাস দিল।

কী বলা যায়? চট করে যা মাথায় এল শুরু করে দিলাম— 'রবিনহুড।'

গল্প বলা আমার অভ্যেস আছে। নিজের ছোটো ভাইবোনদের কত গল্প শুনিয়েছি। সুযোগ পেলেই রাতে খাবার আগে তারা দাদার কাছে গল্প শুনতে বসে।

ধীরে ধীরে বলে চলি। ফুটিয়ে তুলি গল্পের পাত্রপাত্রীদের হাবভাব, বীরত্ব, অ্যাডভেঞ্চার। যাতে কানে শুনে ছেলেরা মনের ভিতর পরিষ্কার দেখতে পায় সেই অচেনা দেশের, অচেনা লোকগুলোর ছবি। দুরন্ত ছেলেরা চোখ বড়ো বড়ো করে শোনে দস্যু রবিনহুডের কীর্তিকলাপ।

হঠাৎ পিছনের বেঞ্চে দুজনে কিঞ্চিৎ ঠেলাঠেলি। কিছু জোরে জোরে কথা।

অমনি গল্প বন্ধ করলাম। সেই বেঞ্চের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললাম— 'ফের? তবে থাক।'

গোটা ক্লাসটা মহা বিরক্তিতে শাসিয়ে উঠল, 'অ্যাই কী হচ্ছে?'

একটি অপরাধী নালিশ জানাল, 'স্যার, ও আমার পা মাড়িয়ে দিল।'

তক্ষুনি দ্বিতীয়জন কাতর কণ্ঠে সাফাই গাইল, 'ইচ্ছে করে নয় স্যার। শুনতে শুনতে ভুল করে।'

—'হুঁ। মনে রেখো, আর হলে কিন্তু—'

ফের গল্প শুরু করি।

ঢং! ঘণ্টা পড়ল। রবিনহুডের গল্প মস্ত বড়ো। আধঘণ্টায় আধখানাও হয়নি। 'পরের দিন বলব,' বলে উঠলাম।

পরদিন ওই ক্লাসে ঢুকতেই 'গল্প গল্প', করে চেঁচাতে থাকে ছেলেরা। বললাম, 'আগে একটু পড়াই। তারপর বলব। গোলমাল করলে কিন্তু বলব না।'

ছেলেরা চুপ করে পড়া শোনো। পিরিয়ডের পনোরো মিনিট রবিনহুড বললাম। এইভাবে পাঁচ দিনে শেষ করলাম গল্পটা।

আমার গল্প বলার খ্যাতি হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল সারা ক্লাসে। যে ক্লাসেই যাই দাবি আসে— 'গল্প। একটা গল্প বলুন স্যার।'

নিজের কাজ গুছোতেই ক্লাসে ক্লাসে গল্প বলা শুরু করলাম।

প্রথমত, গল্প শোনার লোভে ছেলেরা চুপ করে থাকে। গোলমাল করে না। তাহলে যে সেদিন গল্প বলা বন্ধ। দ্বিতীয়ত, এই টোপ দিয়ে দিব্যি পড়াটাও তৈরি করিয়ে নেওয়া যায়।

পিরিয়ডের শেষ দশ-বারো মিনিট গল্পের পালা। তার আগে পড়া। আগের দিনের দেওয়া টাস্ক ধরি। নতুন পড়া বুঝিয়ে দিই। নিয়ম করেছি, পড়া ধরলে ক্লাসে বারোজনের বেশি উত্তর না দিতে পারলে সেদিন সেই ক্লাসে গল্প বন্ধ। ফলে কেউ পড়া না পারলে অন্য ছেলেরাই তাকে খেঁকিয়ে ওঠে— 'অ্যাই পড়া করিসনি কেন?'

আর-একটা নিয়ম— যে ছেলে পর পর দুদিন পড়া তৈরি করে আসবে না তার ভাগ্যে দ্বিতীয় দিন গল্প শোনা নিষেধ। অপরাধীকে ক্লাস থেকে বের করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় দূরে। যাতে তার কানে গল্পের কথা না আসে। অথচ সে দেখতে পাচ্ছে ক্লাসসুদ্ধু উদ্‌গ্রীব হয়ে গিলছে গল্পের কথা। উঃ কী যন্ত্রণা!

—'স্যার মধু শুনছে। কাছে চলে এসেছে।'

একদিন গল্পের সময় অভিযোগ শুনে দূরে দাঁড় করানো শাস্তি পাওয়া মধু কখন গুটিগুটি এসে দাঁড়িয়েছে ক্লাসের কাছাকাছি। গলা বাড়িয়ে কান খাড়া করে শুনছে। সে আর থাকতে পারেনি। কিন্তু অন্য ছেলেরা ছাড়বে কেন? তারা কষ্ট করে পড়া তৈরি করে এসে গল্প শুনতে পাবে, আর মধু ফাঁকি দিয়ে ফোকট্‌সে শুনবে? ওটি হচ্ছে না। তাই ধরিয়ে দিয়েছে।

এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। মধুর মতন হতভাগ্যরা অন্য ছেলেদের হাতে পায়ে ধরে গল্পের ফাঁকটুকু পরে শুনে নেয়। তবে স্যারের মুখে শোনার স্বাদ নাকি আলাদা। অমন করে বলতে পারে না কেউ। তাছাড়া অন্যরা বলতেও চায় না। জব্দ করে।

একসঙ্গে পাঁচটা ধারাবাহিক চালালাম। দারুণ সব গল্প!

হোয়াইট ফ্যাং। টোইন্টি থাউজেন্ড লীগ্‌স্‌ আনডার দ্য সী। রবিনসন ক্রুসো। এমনি সব।

বাঘা বাঘা দুষ্টু ছেলে, যারা সব মাস্টারের ভীতির কারণ তারা অবধি আমার ক্লাসে টুঁ শব্দটি করে না গল্প ভালো করে শোনার লোভে। এমনকী পড়াও করে আসে।

একদিন কামাই করেছিলাম। পরদিন স্কুলে যেতেই ম্যাথমেটিক্স-এর টিচার ভানুবাবু ধরলেন, 'কাল আসেননি যে?'

বললাম, 'একটু জ্বর হয়েছিল।'

—'তা বেশ। কিন্তু আপনার ক্লাস নিতে আর কক্ষনো যাচ্ছি না। নেভার। এই বলে রাখলুম। জ্বালিয়ে মেরেচে মশাই। ক্লাসে ঢুকতে-না-ঢুকতেই ছেলেগুলো চেঁচাতে লাগল— আপনি কেন? আমাদের স্যার কই? তারপর বলে গল্প বলতে হবে। তা অন্য গল্প চলবে না। কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো না কী— সেই গল্পটা চাই। বুঝুন ঠ্যালা। নামই শুনিনি জন্মে।'

জানা গেল আমার ক্লাস নিতে আরও দু-তিনজন মাস্টারের ওই একই হাল হয়েছে। অথচ আর কোনো শিক্ষক কামাই করলে আমাকে তাঁর ক্লাসে নিয়ে যাবার জন্য ছেলেদের কী ঝুলোঝুলি। ওই গল্পের লোভে। বকেবকে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। অন্য মাস্টাররা হাসেন। তাঁদের তো মজা। খাটুনি কমে। বলেন— 'কেমন জব্দ।'

তবে ক্লাস নাইন-টেন-এ ধারাবাহিক গল্প বলতে কিছুতেই রাজি হইনি। সে সব ক্লাসে পড়ার চাপ বেশি। সবদিন গল্প বলার সময় মেলে না। তবু ছেলেরা ছাড়ে না। তাই যেদিন সময় পাই নানা টুকিটাকি গল্প বলি— বিখ্যাত সব ঐতিহাসিক ঘটনা। নাম করা লেখক, বৈজ্ঞানিক, পর্যটকদের জীবনের বিচিত্র কাহিনি। পৃথিবীর নানান জায়গাকার অদ্ভুত অদ্ভুত জীবজন্তু। বইয়ে লেখা বানানো গল্পের চাইতে সে সমস্ত খবর কম আকর্ষণীয় নয়।

একদিন হেডমাস্টারমশাই আমায় ডেকে বললেন, 'আপনি নাকি ক্লাসে ইন্টারেস্টিং গল্প বলেন?'

এই রে! আমতা আমতা করি, 'আজ্ঞে মানে একটু-আধটু। পিরিয়ডের শেষের দিকে।'

—'দেখবেন পড়ায় যেন ক্ষতি না হয়।'

—'আজ্ঞে না। কোর্স আমি ঠিকমতো এগুচ্ছি।'

—'অল রাইট। অল রাইট। ভালো বইয়ের গল্প শুনলে সাহিত্যে উৎসাহ হয়। নলেজ বাড়ে। এবার লাইব্রেরির বই

কেনার সময় আপনি একটা লিস্ট দেবেন ছোটোদের বইয়ের।'

বোঝা গেল হেডমাস্টার আমার গল্প বলার বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং অখুশি নন। নিশ্চিন্ত হলাম।

এইভাবে বছর খানেক চলার পর আমার গল্পের পুঁজি এল ফুরিয়ে। ভালোমতো জানা বড়ো গল্প সব বলে ফেলেছি। ছোটোদের ভালো লাগে এমন রোমাঞ্চকর কাহিনি আরও কত পড়েছি। কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে সে সব উপন্যাসের খুঁটিনাটি গেছি ভুলে। কাঠামোর খানিকটা শুধু মনে আছে আর গল্পের কিছু পাত্রপাত্রী। বইগুলি একবার ঝালিয়ে নিতে পারলে হত। কিন্তু সে সব বই কোথায়? নানাজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়েছি। লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়েছি। এখানে ভালো লাইব্রেরি নেই, বই জোগাড় করতে পারি না।

এখন গল্প বলা থামাবারও উপায় নেই। তাহলে আর ক্লাস ম্যানেজ করতে হচ্ছে না। নিজেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছি। মহা দুশ্চিন্তায় পড়ি।

উঁচু ক্লাসের টুকরো টুকরো ইন্টারেস্টিং গল্পের স্টক এখনও প্রচুর। নানা পত্রপত্রিকায় এমনি কত ঘটনা চোখে পড়ে। ছোটোদের ক্লাস নিয়েই ভাবনা। ধারাবাহিক চালাবার মতো রোমাঞ্চকর উপন্যাস যে ছাই আর কিছু মাথায় আসছে না। আর এক-একদিনে শেষ হওয়া ছোটো ছোটো গল্প বললে কাজ হাসিল হবে না। এই ধারাবাহিকের টানেই ছেলেরা পড়া তৈরি করে আসে। ক্লাসে ডিসিপ্লিন বজায় থাকে। টানা গল্পে একদিনও ছেদ দিতে তারা রাজি নয়। কিন্তু ছোটো গল্প এক-আধদিন না শুনলেও তেমন এসে যায় না। বিপাকে পড়ে যে গল্পগুলো প্রায় ভুলে গিছলাম সেগুলোও বলতে শুরু করলাম। কিছু মনে আছে— বাকিটা বানাই। কে আর ধরবে? মনে মনে একটু সংকোচ হয়। পরে ছেলেরা যদি পড়ে এই বইগুলো, কী ভাববে?

বলতে বলতে মনে মনে হাসি। আসল লেখকরা যদি জানতেন তাঁদের কাহিনির আমার হাতে কী হাল হচ্ছে...।

এমনি আরও ছয় মাস চালাবার পর আধখানা সিকিখানা মনে থাকা গল্পের ভাণ্ডারও আমার শেষ হয়ে এল এবার? মরিয়া হয়ে এক দুঃসাহসিক কাণ্ড করে বসলাম।

ক্লাস সেভেন, সেকশন-এ-তে যে গল্পটা বলছিলাম সেটা শেষ হয়ে গেছে। 'আজ নয় কাল থেকে', বলে ঠেকালাম দুদিন। তারপর স্রেফ বানিয়ে এক গল্প শুরু করলাম।

বিষয়— আফ্রিকা অভিযান। গল্পের নায়ক এক বাঙালি বৈজ্ঞানিক এবং তাঁর দুই যুবক সঙ্গী। এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্র ধরে তারা বেরিয়ে পড়ল এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারে।

আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেক কিছুই পড়েছি। তাই থেকে বর্ণনা দিতে লাগলাম অভিযানের পথের, সেখানকার গাছপালা, জীবজন্তু, অধিবাসীদের। বলতে বলতে চরিত্রগুলো দিব্যি জীবন্ত হয়ে উঠল। জমে গেল গল্প।

আসলে রোমাঞ্চকর গল্প বানাতে আমাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি। কল্পনায় আমি অ্যাডভেঞ্চারের জাল বুনি। অমনি ঘটনা যেখানে যা পাই পড়ে ফেলি। কত ঝোপ জঙ্গল ভরা মাঠে ঘাটে, নদীর তীরে, নির্জন প্রান্তরে এক বা দু-একটি বন্ধু নিয়ে ঘুরেছি অ্যাডভেঞ্চারের আশায়। ছোটোখাটো অ্যাডভেঞ্চার জুটেও গেছে। পুরনো ভাড়া বাড়ি পেলে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখেছি গুপ্তধন আছে কিনা। বই পড়া গল্পের সঙ্গে নিজের বানানো টুকরে টুকরো অ্যাডভেঞ্চার শুনিয়েছি ভাইবোনদের। এতখানি বানানো, আস্ত একখানা উপন্যাসের প্লট ফাঁকা থাকে কখনো? ছেলেদের আগ্রহ দেখে মনের সুখে লাগাম ছেড়ে দিয়ে ছোটালাম ঘটনার পর ঘটনার স্রোত। তিন সপ্তাহে, নয় পিরিয়ডে একটু একটু বলে শেষ করতে হল কাহিনি।

পরদিনই নিবারণ এসে বলল, 'স্যার বইয়ের নাম, লেখকের নামটা বলুন-না।'

—'কেন?'

—'বইটা কিনে ফেলব।'

অ্যাঁ! বলে কী!

নিবারণ খুব বই পড়তে ভালোবাসে। তার কাকা কলকাতায় কাজ করেন। যে গল্পগুলো আগে বলেছি তার কয়েকখানা বই সে কিনে ফেলেছে। বাবাকে দিয়ে আনিয়েছে কলকাতা থেকে।

—'তোমার ভালো লেগেছে?' কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করি।

—'হ্যাঁ স্যার। দারুণ।'

—'আগের গুলোর মতন?'

—'হ্যাঁ স্যার।'

—'পরের দিন, 'আগে পড়া'। 'ইংরেজি নামটা ঠিক মনে পড়ছে না,' ইত্যাদি বলে নিবারণকে এড়িয়ে গেলাম।

এ যে সম্পূর্ণ আমার বানানো বলি কী করে? বললে কি আর

বিশ্বাস করবে? মনে একটু গর্বও হয়। আমার বানানো গল্প পয়সা দিয়ে কিনে পড়তে চাইছে।

গল্পটা লিখে ফেললে কেমন হয়? এখনও সদ্য সদ্য মনে আছে। পরে ভুলে যাব। শেষটায় লিখেই ফেললাম, তবে কোথাও ছাপাবার জন্য দিতে সাহস হল না।

এর আগে আমার দুটি গল্প ছেপেছে একটি ছোটোদের পত্রিকা। গল্প দুটি মজার এবং আকারে নেহাত ছোটো। তিন নম্বর গল্পটা পাঠাতে আর ছাপেনি। আমার লেখক হবার উৎসাহেও ভাঁটা পড়েছে। মনে ভেবেছি এই ঢের। আর কোথাও লেখা ছাপাতে চেষ্টা করিনি। লেখক হবার স্বপ্ন মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি।

মনে ভরসা এসে গিছল। তাই ক্লাস নাইন, সেকশন এ-তে ফের একটা অ্যাডভেঞ্চার বলতে শুরু করলাম। পুরো নিজের বানানো। সেটাও বেশ জমল।

কয়েক মাসের মধ্যেই ওই স্কুল ছাড়লাম। চাকরি বদলালাম। এলাম শান্তিনিকেতনে।

গল্প বানানোর অভ্যেসটা তখন মোক্ষম রকম চেপে বসেছে। একটা ছোটো গল্প লিখে পাঠিয়ে দিলাম কলকাতার এক নামকরা ছোটোদের পত্রিকায়। অবাক কাণ্ড! সেটা ছাপা হল। ফের একটা পাঠালাম। সেটাও ছাপা হল। দুটো গল্প ছাপার মাঝখানে এক বছরের বেশি ফাঁক। তাতে কী? এটুকুই বা আশা করেছি কি? হ্যাঁ, এ যাবৎ আমার যা ছাপা হয়েছে সব ছদ্মনামে। আসল নাম দিতে ভরসা হয়নি।

হঠাৎ খবর পেলাম ওই পত্রিকার সম্পাদিকা শান্তিনিকেতনে এসেছেন বেড়াতে। আলাপ করার ভারি ইচ্ছে। সাহসে আর কুলোয় না। শুধু সম্পাদিকা নন, নামকরা লেখিকা। ওঁর গল্প আমি কত পড়েছি। দূর থেকে দেখলাম। চশমা পরা রাশভারি চেহারা। কোনো বড়ো লেখকের সঙ্গে কখনো পরিচয় নেই। ওঁদের সম্বন্ধে মনে খুব ভয় ভক্তি। না জানি কেমন ভাবে কথা বলেন! না দেখে যা দু-একটা ছেপেছেন। চেনা হলে আমার সম্বন্ধে ধারণা কী দাঁড়াবে ভগবান জানেন। হয়তো উলটো ফল হবে। আর লেখাই ছাপবেন না। সম্পাদিকার বাড়ির সামনে কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করলাম। কত লোক আসছে যাচ্ছে। শেষে একদিন বুক ঠুকে ঢুকে পড়লাম।

আলাপ হতে ভয় ভেঙে গেল। অতি সাধাসিধে লোক। হ্যাঁ

আমার গল্প দুটোর কথা মনে আছে। উৎসাহ দিলেন— 'আরও লেখো। এবং নিজের নামে লেখো।'

উৎসাহ পেয়ে লিখে ফেললাম কয়েকটা ছোটো গল্প আর কয়েকটা প্রবন্ধ। সম্পাদিকা বছরে দু-তিনবার শান্তিনিকেতনে আসেন। লেখা নিয়ে গিয়ে সংশোধন করিয়ে নিই। তারপর সেগুলো ছাপাও হল ওই পত্রিকায়। আরও দু-তিনবছর কেটে গেল এর মাঝে।

সেই মস্ত অ্যাডভেঞ্চারটা কিন্তু এখনও বের করিনি। সম্পাদিকা যদি চটে যান? ভাবেন লাইপেয়ে মাথায় উঠেছে। বেশি বিরক্ত করছে। নিজের মনেই ঘষামাজা করি লেখাটা।

একবার সাহস করে উপন্যাসটা নিয়ে হলাম হাজির।

—'এটা কী?' জাবদা খাতাটার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে সম্পাদিকা প্রশ্ন করলেন।

কাঁচুমাচু ভাবে বলি, 'আজ্ঞে উপন্যাস। একটু দেখে দেন যদি।'

—'হুম্। বিষয়টা কী?'

—'আজ্ঞে অ্যাডভেঞ্চার। বিজ্ঞান ভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চার। আফ্রিকার পটভূমিকায়।'

—'আচ্ছা দেখব।' খাতাটা নিলেন তিনি।

সাতদিন আর ওমুখো হইনি। বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। একেবারে উপন্যাস ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। গেল বুঝি সব কেঁচে। কেমন আলাপ জমে উঠছিল। সেটাই বা কি কম পাওনা! আবোল-তাবোল লেখাটার কথা যত ভাবি লজ্জা পাই। পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের মন ভোলানো আর পাকা সম্পাদিকার পছন্দ হওয়ার ঢের তফাত।

ফের গুটিগুটি হাজির হলাম।

লেখাটার কথা আর তুলি না। সম্পাদিকা নিজেই তুললেন 'বড্ড বানান ভুল।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কিছু কাটছাঁট দরকার। দাগ দিয়ে দিয়েছি।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ব্যাস এই পর্যন্ত। ভালোমন্দ আর কিছু বললেন না। ঘামতে ঘামতে লেখাটা ফেরত নিয়ে এলাম। বকুনি দেননি এই যথেষ্ট। ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করি— ছাপানো যায়? পরে ভাবলাম— না থাক! ছাপাবার মতো হলে নিজেই বলতেন। লেখাটা আবার

বাক্সবন্দী হল। বড়ো অ্যাডভেঞ্চার ছাপানোর সাধ বুঝি আর মিটল না।

মাস দুই বাদে ওই সম্পাদিকার এক চিঠি পেলাম। পড়ে আমি থ! লিখেছেন— তোমার রোমাঞ্চকর উপন্যাসটা শিগগির পাঠাও। সামনের পুজোসংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় ছাপতে চাই। বানানগুলো ঠিক করবে। দাগ দেওয়া জায়গাগুলো বাদ দেবে। পরিষ্কার করে কপি করবে।

অ্যাঁ। একেবারে পুজো সংখ্যায়! এ যে মেঘ না চাইতে জল। ফুর্তির চোটে দু-পাক নেচে নিলাম ঘরের ভিতর। মনে একটু ধন্দ— সত্যি বেরুবে তো? যদি শেষমেশ খারিজ হয়। কাউকে তাই বলতে পারলাম না ভরসা করে। ঘাবড়ে গিয়ে উপন্যাসের নামটা অবধি ঠিক করতে পারলাম না। লিখলাম, অনুগ্রহ করে নামটা আপনারা দিয়ে দেবেন।

সত্যি বেরল সেই অ্যাডভেঞ্চারের উপন্যাস। নাম— মুঙ্গু। পাঠকদের পছন্দও হল।

সেই শুরু। তার পর থেকে লিখেই চলেছি। নানা রকম ছোটো গল্প। বড়ো বড়ো অ্যাডভেঞ্চার।

সন্দেশ
ফাল্গুন ১৩৮৮

যেমন ইচ্ছা সাজো

এগারো ক্লাসের পানু আর তার ক্লাসের বন্ধুরা সবাই বেজায় ভাবিত। কারণ— 'ভারতমাতা বিদ্যামন্দির'-এর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উৎসব সমাগত। পানু অবশ্য দৌড়ঝাঁপ মোটেই করে না। তবুও এই উৎসবে একটি পুরস্কার তার প্রায় বাঁধা। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে যে 'Go as you like it' বা 'যেমন ইচ্ছা সাজো' প্রতিযোগিতা হয় তাতে পানু গত দুবছরের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু এবার তাকে এক বিষম বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর সেই নিয়েই তার আর তার সঙ্গীদের এত ভাবনা।

ব্যাপারটা হল দশ ক্লাসের দীপঙ্কর হঠাৎ কোথা থেকে এক থিয়েটারি মামার আমদানি করেছে। এই মামা নাকি তাকে এমন মেক-আপ দেবে, আর চলন-বলনে এইসা এলেমদার করে দেবে যে পানুকে এবার আর পাত্তা করতে হচ্ছে না। মাতুল-নির্ণীত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় দীপঙ্কর যত ফুলছে, মাতুলহীন অসহায় পানু আর তার দলবল ততই দমে যাচ্ছে। অনেক ভেবেও পানু একটা উপায় খুঁজে পাচ্ছে না— একটা চমকপ্রদ সাজ, যার সাফল্য নিশ্চিত।

যাকগে, কালের গতি তো আর রোধ করা যায় না। পানুদের দুশ্চিন্তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে নির্ধারিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিনও এসে পড়ল। এই অনুষ্ঠানে বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতিত্ব করতে রাজী করানো হয়েছে।

হেডমাস্টার মশাই-এর বিশেষ অনুরোধে রাজী হয়ে তিনি বললেন— 'ওইদিন আমায় আর একটা জায়গায় যেতে হবে। তা ওখান থেকে ফিরে এসেই আমি যাব। না না, কারোর নিতে আসার দরকার নেই। হয়তো অনেকক্ষণ বসে

থাকতে হবে। আমি নিজেই খুব যেতে পারব। 'ভারতমাতা বিদ্যামন্দির' তো—খুব চিনি।'

হেডমাস্টার মশাই বলে এসেছেন, এই সন্ধ্যা ছটা নাগাদ গেলেই চলবে।

প্রতিযোগিতার দিন। সারাদিন ধরে স্কুলের সামনের মাঠে মহোৎসাহে দৌড়ঝাঁপের প্রতিযোগিতা চলছে। ক্রমশ বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। প্রতিযোগিতার পাটও শেষ হয়েছে। এবার পুরস্কারের পালা। ইতিমধ্যে সভাপতি মহাশয়ও এসে গেছেন। আবালবৃদ্ধ জনসাধারণ অবাক বিস্ময়ে এই প্রথিতযশা সাহিত্যিককে লক্ষ্য করেছে। শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রু-কেশ, চোখে প্যাঁসনে আর গলায় এক পাক দিয়ে জড়ানো একটা মটকার চাদর, খবরের কাগজের ছবির কৃপায় এই মূর্তি তাদের বিশেষ পরিচিত। স্বল্পবাক কিন্তু বয়সের তুলনায় সতেজ চলাফেরা। অবশ্য চলাফেরা তিনি করেছেন না, মঞ্চের উপর চেয়ারে বসে মৃদু মৃদু হাসি মুখে সমস্ত কিছু লক্ষ্য করছেন।

মাইকে ঘোষণা করা হল— এবার 'Go as you like it' আরম্ভ হবে। দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণ অনেকগুলি চানাচুরওলা, আইসক্রিমগুলা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল এদের মধ্যে অনেকেই নকল। মঞ্চের সামনে চানাচুরওয়ালাদের ভিড় জমে গেল।

—চাই চানাচুর, সল্টেড বাদাম, এক আনা দুআনা। নে—বেন?

—চাই আইস... ক্রি... ম, কুলপি-মালাই—

কেউ কেউ আবার সভাপতিকে চানাচুর বেচার চেষ্টা করতে লাগল। সভাপতি এক আনার চীনাবাদাম কিনে ফেললেন, তারপর স্থানীয় জমিদার প্রধান বক্তার বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে দিলেন।

ক্লাস নাইনের তারাপদ পাগল বেশে বেজায় হুল্লোড় লাগিয়ে দিল। অবশ্য ছোটো ছোটো ছেলেগুলো ঢিলটিল ছুড়ে তারাপদকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে কসুর করছিল না।

এমন সময়ে বিহারী দারোয়ানবেশী দীপঙ্কর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল। লম্বা-চওড়া দীপঙ্করকে মানিয়েছে খাসা। মাথায় পাগড়ি, গায়ে লাল ফতুয়া, মালকোঁচামারা ধুতি, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা। আর সবচেয়ে দর্শনীয় তার গোঁফ আর গালপাট্টা। ইয়া মোটা আর কালো একজোড়া পাকানো গোঁফ ইঞ্চিখানেক চওড়া গালপাট্টার সঙ্গে কোলাকুলি করছে। কপালে সযত্নে অঙ্কিত এক তিলক,

হাতে এক পাঁচহাত তেল-চকচকে বাঁশের লাঠি। সদ্য মুলুক থেকে আসা এক সাক্ষাৎ ভোজপুরী।

সার্থক তার থিয়েটারি মামার তালিম। ইস্কুলের আসল দারোয়ানদের নিষ্প্রভ করে দিয়ে দারোয়ান দীপঙ্কর মসমস করে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো। তারপর লাঠি ঠুকে চোস্ত হিন্দিতে কুচোকাচাদের ধমকাতে আরম্ভ করল :

—'এও বালবাচ্ছালোক, ভিড় মৎ করো! একদম বাহার যাও!' বলেই, 'খবরদার' বলে এমন এক হাঁক পাড়ল যে দুই তিন ক্লাসের ছেলেগুলো তো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। প্রধান বক্তার ছোটো ছেলেটা বাদাম ফেলে বাবাকে জড়িয়ে ধরল।

সবাই দীপঙ্করকে দেখে চমৎকৃত। হেডমাস্টার মশাই খুব খুশি খুশি ভাব করে সভাপতির কাছে বলতে লাগলেন— 'হেঁ হেঁ কেমন লাগছে? মানে ছেলেপুলেদের ব্যাপার। তা সেজেছে বেশ। কী বলেন?'

সভাপতি মশাই বিষয়টা খুব উপভোগ করছেন বলে মনে হল। এরপর ভোজপুরী যখন তাঁর সামনে এসে 'রাম রাম বাবুজী' বলে মস্ত এক সেলাম ঠুকল তখন তার দাড়ি গোঁফের ফাঁকে ফুটে ওঠা হাসি কারুরই চোখ এড়াল না।

দীপঙ্কর এরপর চরম দারোয়ানি দেখাতে আরম্ভ করল। ল্যাঠি ঠুকে, হিন্দি বাংলা বকুনি ঝেড়ে সে চানাচুরওয়ালাদের ভিড় একদম সাফ করে ফেলল। কেবল পাগল তারাপদর কাছে একটু বেকায়দায় পড়েছিল। তারাপদ থুতুটুতু ছিটিয়ে, চেঁচিয়েমেচিয়ে এমন কাণ্ড করল যে ভোজপুরি 'আরে শিয়ারাম শিয়ারাম, একদম সত্যনাশ কর দিয়া' বলে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করল। মোট কথা দীপঙ্করের সাফল্যে মাস্টার ছাত্র সবাই মুখরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু একাদশ ক্লাসের ছেলেদের মনে সুখ নেই। ছি ছি, পানুটা এমনভাবে ডোবাল! মাঠে এল না পর্যন্ত! বাড়িতে খোঁজ করতে গিয়ে জানা গেল, সে দুপুর থেকে বেরিয়ে গেছে। ঘরে তার ছোটোকাকা রেগে আগুন হয়ে বসে আছে। পানু নাকি চটি আর চাদর নিয়ে পালিয়েছে। বাবুর নবাবি করা হচ্ছে, ফিরে এলে এর ফল ছোটোকাকা হাতেনাতে বোঝাবে।

প্রায় সন্ধ্যা সাতটা বাজে। এমন সময় মঞ্চের কাছেই একটা গাড়ি এসে থামল। যিনি গাড়ি থেকে নামলেন তাঁকে দেখে তো পুরো জনতা স্তম্ভিত। সভাপতির মূর্তিমান যমজ ভাই! সেই দাড়ি, সেই চুল, সেই চাদর— বুঝিবা ইনি একটু বয়স্ক। মাঠসুদ্ধ লোকের চোখ ছানাবড়া। পাগল তারাপদও তার পাগলামি স্রেফ ভুলে গেল।

যাঁকে নিয়ে এই ব্যাপার তিনি কিন্তু অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এসে হেডমাস্টার মশাইকে বললেন— 'দেখুন ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। তা আপনাদের প্রতিযোগিতা সব শেষ তো? বেশ বেশ।'

হেডমাস্টার মশাই খানিকক্ষণ হাঁ করে দ্বিতীয় সভাপতির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই চমকে মঞ্চাসীন প্রথম সভাপতির দিকে তাকালেন।

ততক্ষণে প্রথম জন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। ক্রমাগত হাত কচলাতে কচলাতে বলতে লাগলেন— 'স্যার স্যার আমি পানু। সভাপতি সেজেছিলাম। মানে Go as you like it-এর জন্যে...'

ব্যাপারটা অনুধাবন করেই ভয়ানক চটে গিয়ে হেডমাস্টার মশাই ঘটনাস্থলেই পানুকে উত্তমমধ্যম দেবেন কি না স্থির করছেন, এমন সময় আসল সভাপতি সাহিত্যিক মশাইয়ের চোখ পানুর ওপর পড়ল। বেশ কিছুক্ষণ তিনি স্রেফ ভ্যাবাচাকা মেরে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে তাঁর জীবন্ত প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ক্রমশ হেডমাস্টার মশাই, হেডপণ্ডিত মশাই, প্রধান বক্তা, ছাত্ররা, চানাচুরওলারা, পাগল সবাই হি হি হো হো করে অট্টহাসি জুড়ে দিল। কেবল ভোজপুরি দীপঙ্কর এই রসিকতায় যোগদান করল না।

খানিক পরে হাসির বেগে পানুর বিপদের মুখ কেটে যাওয়ার পর হেডমাস্টার মশাই হুকুম করলেন— 'ওহে, মঞ্চের নীচে আমাদের পুরোনো সভাপতিকে একখানা চেয়ার দেওয়া হোক!'

সভার কাজ আরম্ভ হয়েছে এমন সময় হেডমাস্টার মশাই হঠাৎ সভাপতি সাহিত্যিককে জিজ্ঞেস করলেন— 'আচ্ছা, আপনি সাতটার সময় এসে ঠিক সময়ে এসেছি বললেন কেন? আমার মনে হচ্ছে আপনি যেন ছটায় আসবেন বলেছিলেন।'

পানুই তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে উঠল— 'স্যার, অপরাধ নেবেন না। আমিই ওনাকে পরে গিয়ে বলেছিলাম যে আপনি সাতটায় আসতে বলেছেন। ভেবেছিলাম ওই সময়টুকু আমিই সভাপতির হয়ে কাজ চালিয়ে দেব।'

হেডস্যার আর একবার পানুকে উত্তমমধ্যম দেবার কথা চিন্তা করতে গিয়ে তার দাড়ির দিকে চেয়েই হেসে ফেললেন আর আড়চোখে আসল জনের দাড়ির সঙ্গে একবার মিলিয়ে নিলেন।

সে বছরও যে পানুই 'যেমন ইচ্ছা সাজো'র প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল তা আর বলাই বাহুল্য।

নাড়ুবাবুর পেন উদ্ধার

নাড়ুবাবু যখন সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলছে— রাগে, দুঃখে, হতাশায়! ওঃ, এক সপ্তাহের মধ্যে দু-দুটো পেন পকেটমার হয়ে গেল! প্রথমটা না হয় বাজে ছিল কিন্তু এবারেরটা একটা দামি সেফার্স। আর শুধু কি তাই? ওই সবুজ সেফার্সটা তিনি তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখার জন্য প্রাপ্ত মূল্যের টাকায় কিনেছিলেন। বড্ড পয়া পেন ছিল।

নাড়ুবাবু একজন উঠতি লেখক। ওই সেফার্সটা না পেলে তাঁর লেখার হাতই আসতে চায় না। এ তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন। পেনটা খুললেই, প্লট চরিত্র ভাষা সব হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসতে থাকে। অন্য পেন নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছেন— স্রেফ সময় নষ্ট। এক কলম লেখা এগোয়নি।

আর আজ কি না সেই পেনটা গেল! নাড়ুবাবু আর ভাবতে পারেন না।

অফিস টাইমে বাসে উঠে পেন সামলাই বা কী করে? এদিকে আবার পেন নিয়ে না গেলেও চলে না। ওঃ, যা ভিড়! বিশেষত যাবার সময়। আসার সময় না হয় কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরে ভিড়টা কমে গেলে বাসে চাপেন। কিন্তু যাবার সময় তো আর এক ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরোনো যায় না। তা হলে যে খাওয়াই হবে না।

আর বাসে উঠে কোনোরকমে রড আঁকড়ে ঝুলে থাকাই দায়। তার মধ্যে কি আর কে তার পকেটের ভার দয়া করে লাঘব করছেন, তার খেয়াল রাখা যায়? তিনিই তো কত সময় পয়সা বার করতে গিয়ে ভুল করে নিজের ভেবে অন্যের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছেন। অসম্ভব ব্যাপার।

তা পেন না হয় আবার হবে কিন্তু ওইটি না ফিরে পেলে যে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ইতি।

রাত্রে খাবার পর ছাদে উঠে ক্রমাগত পায়চারি করছেন। মাথাটা ঠান্ডা না হয়ে উত্তরোত্তর গরমই হয়ে উঠছে। প্রায় স্ফুটনাঙ্কে যখন পৌঁছেছে হঠাৎ সেই সময় বুদ্ধিটা বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। দেখা যাক কী হয়। মরিয়া হয়ে উঠেছেন নাড়ুবাবু। হ্যাঁ, ওই ভাবেই চেষ্টা চালাবেন। যাক কিছু পয়সা আর পরিশ্রম।

পরদিন নাড়ুবাবু সময়মতোই অফিসে হাজির হলেন। আর গিয়েই সাতদিনের ছুটির দরখাস্ত দিলেন ঝেড়ে— 'আঙ্কেল সিরিয়াস।' অফিসের লোকদের বলে এলেন, কাকা এই আছেন কি নেই। ডাক্তার বদ্যি তাঁকে একাই সব সামলাতে হচ্ছে। কবে আবার জয়েন করতে পারবেন, ঠিক কিছুই বলতে পারছেন না।

পরদিন থেকে নাড়ুবাবু তাঁর অভূতপূর্ব অভিযান আরম্ভ করলেন।

অফিসের সময়মতো খেলেন। তারপর পান চিবোতে চিবোতে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়ালেন। হুড়মুড় করে বাস এসে পড়ল। বাসের গায়ে লোক বাদুড়-ঝোলা ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে বাসের মধ্যকার এবং উঠতি যাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল লেগে গেল। একপক্ষ উঠতে দেবেন না, অন্যপক্ষও অপ্রতিরোধ্য। নাড়ুবাবু বহুদিনের অর্জিত দক্ষতার গুণে ওরই মধ্যে টুক করে সেঁদিয়ে পড়েছেন। কেউ উঠলেন, কেউ পারলেন না। কেউ-বা নেমেছেন, কিন্তু ধুতির কোঁচাকে বাস ছেড়ে নামানো যাচ্ছে না। হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। তালেগোলে বাস দিল ছেড়ে।

এ লাইনে একমাত্র... নং হল অফিস পাড়ায় যাবার বাস। আর এ সময় তাই সবকটাতেই থাকে ভয়ানক ভিড়। এর মধ্যে কি নিজেকে বাদে অন্যকিছু সামলানো চলে।

নাড়ুবাবু উঠে জুৎ করে দাঁড়ালেন— রডটা দুহাতে আঁকড়ে ধরলেন। তারপর সজোরে গলা চড়ালেন— 'দেখবেন মশাইরা, পকেট সামলান। অসাবধান হয়েছেন কি পকেট থেকে পেন হাওয়া হয়ে যাবে। আমার মশাই, গতকালই একটা নতুন পেন চলে গেল।'

দু-একটা সহানুভূতিসূচক গলা পাওয়া গেল।

—'যা বলেছেন। আমারও একটা গেছে আগের মাসে।'

—'আরে এ লাইনটা পেন চুরির জন্য বিখ্যাত।'

একটি দাদু গোছের বৃদ্ধের চাঁচাছোলা গলা শোনা গেল— 'একখানা মোটে বাস। আর বাসও বাড়ায় না। আমাদের গর্ভমেন্ট যা হয়েছে। বেশ, তবে পকেট মারা গেলে গর্ভমেন্ট আমাদের ক্ষতিপূরণ দিক। কেন দেওয়া হবে না বলুন?'

নাড়ুবাবুকে আর বেশি কিছু বলতে হল না। বাসসুদ্ধ সবাই তাদের স্বচক্ষে দেখা বা বিশ্বস্তসূত্রে শোনা নানারকম চমকপ্রদ পকেটমারার কাহিনি পরস্পরকে শোনাতে আরম্ভ করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে পেনটেনগুলোর প্রতি সাবধান হয়ে উঠল।

নাড়ুবাবুর অফিস অনেকটা পথ। কিন্তু তিনি মাঝামাঝি গিয়েই নেমে পড়লেন। গড়ের মাঠে এক চক্কর ঘুরে নিয়ে আবার একটা ফিরতি বাসে উঠলেন এবং উঠেই হাঁক ছাড়লেন— 'মশাইরা, পেন সামলে, আমার কালই একটা গিয়েছে। শুনলাম এ লাইনে পেন হাতাবার কয়েকজন নামকরা ওস্তাদ যাতায়াত করছে।'

ব্যস, আগেকার মতোই সারা বাস পকেটমারার আলোচনায় গরম হয়ে ওঠে। যে যার পকেটে হাত দিয়ে জিনিস-টিনিস সব আছে কিনা দেখে নেয়। নাড়ুবাবু বাড়ির কাছে এসে নেমে পড়লেন।

এইরকম বার কয়েক যাতায়াত করে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লেন। তা মেহনত তো কম হয়নি। মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কীরে নাড়ু, এখনই ফিরলি?'

—'হ্যাঁ মা, তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে গেলাম। এরকম এখন কয়েকদিন পাব।'

—'তা বেশ।' বলে মা চলে গেলেন, আর নাড়ুবাবুও পাশ ফিরে এক লম্বা ঘুম মারলেন।

এটাই আপাতত নাড়ুবাবুর দৈনন্দিন কর্মধারা হয়ে দাঁড়াল। চারদিন ধরে তাঁর ওই রুটিন চলছে। সকালে অফিস টাইমে বাসে ঘোরা আর উঠেই সকলকে পকেটমার সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া।

নাড়ুবাবুকে এখন বাসের লোক বেশ চিনে গেছে।

—'এই যে দাদা, এসে গেছেন?'

—'আরে দাদাকে দেখেই পকেটের কথা মনে পড়ে গেল। দেখি আবার সব ঠিকঠাক আছে কি না।'

নাড়ুবাবুও সাবধান করেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পকেটের জিনিসপত্তর সব সামলে। খুব খারাপ রাস্তা মশাই।'

ছেলেছোকরা টিপ্পনি কাটে, 'কী দাদা, কাজের ফাঁকে পরোপকার করে একটু পুণ্য সঞ্চয় করছেন নাকি?'

—'আরে জানিস না, দাদা হলেন পকেটমার নিবারণী সংঘের একজন জাঁদরেল মেম্বার।'

নাড়ুবাবু রাগেন না, হাসেন।

কোনো নতুন যাত্রী জানতে চায়, 'কী ব্যাপার বলুন তো? পকেটমার হয়েছে নাকি?'

নাড়ুবাবু তৎক্ষণাৎ বিস্তারিত করে বোঝান— 'খুব সামলে চলবেন। এই সময় এই রুটের বাসে পকেটের জিনিসপত্তর একেবারে অস্থাবর। বিশেষ করে পেন। এই দেখলেন আছে, পাঁচ মিনিট পরেই দেখবেন হাওয়া।'

আর তিনি বাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাসসুদ্ধ লোকের নানান পকেটমারের গল্প মনে পড়ে যায়। কারো কারো পকেটমারার গল্পের স্টক ফুরিয়ে যাওয়ায় চুরি ডাকাতি রাহাজানির গল্পে বাস মুখর হয়ে ওঠে।

নাড়ুবাবু হৃষ্টচিত্তে সব লক্ষ করেন।

এইরকম কয়েকবার যাতায়াত করে বাড়ি ফিরে আসেন। আর এসেই টেনে ঘুম।

সেদিন পঞ্চম দিন। নাড়ুবাবু অফিসের দিকে থেকে যাত্রী বাসটা থেকে গড়ের মাঠের কাছে প্রথম ট্রিপটা দিয়ে নামলেন। একটু হাওয়া খেয়ে আবার একটা উল্টোদিকের বাস ধরবেন। তারপর আবার অফিসের দিকে।... এইরকম চলবে, বেশ কিছু পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে। তা যাক, তিনি ছাড়ছেন না।

গড়ের মাঠে গাছের ছায়ায় ঘুরছেন। একজন পেন্টালুন আর হাওয়াই শার্ট পরা মাঝবয়সি লোক একই সঙ্গে বাস থেকে নেমে গুটি গুটি তাঁর পিছনে পিছনে আসছিল। হঠাৎ কাছে এসে ডাকল, 'ও, মশাই, ইদিকে একবার আসবেন— একটা কথা ছিল।'

নাড়ুবাবু আড়চোখে চেয়ে বললেন, 'বলুন।'

—'চলুন-না ওই ফাঁকা গাছটার নীচে। তাড়া আছে?'

—'নাঃ, তাড়া তেমন নেই, চলুন।'

গাছতলায় এসেই লোকটি তেড়িয়া হয়ে উঠল : ' আচ্ছা মশাই, কদিন ধরে দেখছি আপনি ওই সময়টাতে বাসে চড়ে কেবল ইদিক-উদিক করেন। উঠেহ

কেবল পকেটমারের গল্প ফাঁদেন। বলি, ব্যাপারখানা কী? আপনার আর কিছু কাজকর্ম নেই নাকি?'

নাড়ুবাবু বললেন, 'মানে, আমার পেনটা সেদিন গেল কি না। তাই অন্যদের একটু সাবধান করে দিচ্ছি। আর কিছু নয়।'

—'ওঃ, খুব যে দেখছি অন্যের ভালোমন্দের চিন্তা। তা পেনটা ফিরে পেলে কী করবেন?'

—'আজ্ঞে, কাল থেকেই আবার অফিস যাব। তবে না পাওয়া পর্যন্ত অফিসমুখো হচ্ছি না। আমার পয়া পেন মশাই।'

—'বটে।' লোকটি গম্ভীর হয়ে যায়। 'কবে হারিয়েছিল?'

—'সোমবার সকাল দশটা নাগাদ।'

—'অ', ইতিমধ্যে লোকটি তার দুহাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এই দুহাতই বার করে এনে নাড়ুবাবুর সামনে দুই মুঠো খুলল। দু মুঠোয় নানান রঙের হরেক রকমের এক গাদা পেন।

—'দেখুন কোনটা আপনার। সব কটাই নিয়ে এসেছি।'

নাড়ুবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁর সবুজ সেফার্সটিকে চিনে ফেলেছেন, আর টপ করে তুলে নিয়েছেন লোকটির প্রসারিত মুঠো থেকে। পরম আদরে হাত বোলাতে থাকেন তাঁর হারানিধির গায়ে।

'ব্যস, মিলেছে তো? তাহলে আর কাল থেকে ঝুট ঝামেলা করবেন না। ওঃ ভারি তো একটা পেন গিয়েছিল! আজ পাঁচদিন ধরে কী কাণ্ডটাই-না আরম্ভ করেছেন।'

নাড়ুবাবু বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'ভারি পয়া পেন মশাই। এটা ছাড়া আমার লেখাই বেরোয় না।'

—'আর আমার হালটা কী হয়েছে ভাবুন তো?' লোকটি ক্ষুব্ধস্বরে বলে ওঠে, 'আজ পাঁচদিন ধরে স্রেফ হাত গুটিয়ে বসে আছি। আপনার জ্বালায় সব কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। আমার আবার এই বাস রুটে সকালের অফিস টাইমে মাত্র এক ঘণ্টা ডিউটি। ব্যস, তারপরেই অন্য লোকের পালা। আর আমি বাকি সকালটা বিলকুল বেকার। তা রোজগারপাতি না থাকলে সংসারটা চালাই কী করে বলতে পারেন?'

নাড়ুবাবু অপ্রস্তুতের মতো মাথা চুলকান।— 'আজ্ঞে তা ঠিক চিন্তা করিনি। মানে...'

—'ঠিক আছে। পেন তো পেয়ে গেছেন। কাল থেকে বাসে উঠে ওইসব বাজে বকবেন না তো?'

—'মোটেই না। কী দরকার আমার মুখব্যথা করে। স্রেফ অফিস যাব আর আসব।' নাড়ুবাবু অম্লানবদনে উত্তর দেন।

—'হ্যাঁ, মানে, ওই পুলিশ-টুলিশে দেবার মতলব নেই তো?'

—'আরে না না।' নাড়ুবাবু শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন— 'আবার পেনটা খোয়াই! আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

—'তাহলে কথা দিচ্ছেন। মনে রাখবেন কিন্তু। প্রমিস।'

—'বিলক্ষণ বিলক্ষণ, চলুন-না একটা পান খাওয়া যাক।' পেন ফিরে পাওয়ার আনন্দে নাড়ুবাবু গদগদ।

—'সরি, আজ একদম সময় নেই। একটু কাজ আছে। নমস্কার।' লোকটি ততক্ষণে হন হন করে বাসস্টপের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

পরদিন থেকে নাড়ুবাবু অফিস যেতে আরম্ভ করলেন, এবং সবুজ সেফার্সটি বুক পকেটে নিয়েই।

প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে। নাড়ুবাবু লেখায় বেশ নাম করে ফেলেছেন। আর এখনও সেই সবুজ সেফার্সটিতেই তিনি লিখে থাকেন।

বাসে সেই লোকটির সঙ্গে তাঁর বারকয়েক দেখা হয়েছে। চোখাচোখি হতেই তিনি পরিচিতের মতন তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁত বার করেছেন। লোকটি কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

১৩৭১

মধুর ভাগ

মাটির ওপর ক্যানভাস বিছিয়ে পিঠোপিঠি বসেছিলেন প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ এবং বিল। প্রফেসর ঘোষ একটি ক্যামেরা পরীক্ষা করছেন। বিলের পাশে শোয়ানো রয়েছে একটি রাইফেল ও একটি পিস্তল। আর একটা রাইফেলের কলকব্জায় বিল তেল লাগাচ্ছেন সযত্নে।

মাথার ওপর ঝাঁকড়া গাছটার ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের সূর্যের আলো এসে পড়েছে মাটিতে। আলোছায়ার রকমারি নকশা বুনেছে।

কিছু দূরে দুটো তাঁবু পড়েছে। অনেক লোক তাঁবুগুলির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে নানা কাজে। কয়েকজন মাটিতে বসে করছে গল্পগুজব। রাঁধুনি বিশালকায় জাম্বো— একা একটা গাছের তলায় বসে কুটছে একরাশ তরকারি।

প্রায় একশো মিটার দূরে উত্তর দিকে শুরু হয়েছে জঙ্গল। ঘন নয়, পাতলা বনভূমি। একটি ক্ষীণকায়া নদী এসে ছোটো জলাভূমি তৈরি করেছে ওখানে, তারই আশেপাশে গাছপালা ঝোপঝাড় জন্মে ওই বনভূমির সৃষ্টি। তাঁবু পড়েছে যেখানে সেখানটা বেশ খোলামেলা, শুধু মাঝে মাঝে এক-একটা বড়ো ঝাঁকড়া গাছ। পিছনে দক্ষিণ দিকে দেখা যাচ্ছে খোলা প্রান্তর। সেখানে বড়ো গাছ খুব কম। আবহাওয়া গরম হলেও এখনও বৃষ্টি নামেনি, তাই খোলা মাঠ বেশ রুক্ষ, প্রায় তৃণহীন।

এই জায়গাটা আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ অংশে বেচুয়ানাল্যান্ডের (অধুনা বতসোয়ানা) অন্তর্গত। প্রফেসর ঘোষ আফ্রিকায় সাফারিতে বেরিয়ে কয়েকদিন হল এখানে তাঁবু ফেলেছেন। শিকারি বিল তাঁর বন্ধু এবং এই অভিযানে পথপ্রদর্শক।

কিচ কিচ কিচ! কোনো পাখির তীক্ষ্ণ গলা শুনে ঘোষ মাথা তুললেন। দেখলেন, জাম্বো যে গাছের নীচে বসেছে সেই গাছের ডালে বসে টুনটুনির মতো একটি ছোট্টপাখি। নাচানাচি করছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে আর ডাকছে সমানে। পাখিটির পাখা ও মাথার রং কালচে, হলুদ রঙা ঠোঁট, পেট ধূসর বর্ণ।

বিলও দেখছিলেন পাখিটাকে। বললেন, 'এই পাখির নাম হনি গাইড (Honey Guide)।'

প্রফেসর ঘোষ বললেন, 'ও এই হচ্ছে হনি-গাইড। বাঃ! আফ্রিকার এই বিশেষ জাতের পাখির কথা আমি পড়েছি। বৈজ্ঞানিক নাম ইন্‌ডিকেটর জ্যানথোনোটাফ (Indicator Xanthonotuf)। এই পাখিরা নাকি মানুষকে বা ভালুককে ডেকে নিয়ে যায় কোনো লুকোনো মধুভরা মৌচাকের কাছে। ওরা কেউ সেই মৌচাক ভাঙলে একটু মধু আর মৌকীট ভাগ পাওয়ার আশায়।'

তারপর নিজের মনেই বলেন, 'তাহলে বাংলায় এদের নাম দেওয়া যায় মধুপ্রদর্শক।'

বিল বললেন, 'হুঁ তাই। আমি এই পাখি দেখেছি আগে। এদের এই গল্পও শুনেছি। এই অঞ্চলে যখন এসেছিলাম আগের বার। তবে এদের মৌচাকের হদিশ দেওয়ার ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখার সুযোগ পাইনি।'

প্রফেসর ঘোষ ক্যামেরা বাগিয়ে হনি-গাইড বা মধু-প্রদর্শক পাখির কয়েকটা ফোটো তুললেন।

পাখিটা ডাকছিল, নাচানাচি করছিল ডালে-ডালে জাম্বোর ঠিক মাথার ওপর। যেন সে জাম্বোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। জাম্বো আফ্রিকান উপজাতির লোক। এ পাখির স্বভাব নিশ্চয়ই জানে। কারণ জাম্বো বারবার মাথা তুলে আগ্রহভরে দেখছিল পাখিটাকে। মাঝেমাঝেই সে আড়চোখে নজর করছিল ঘোষ ও বিলকে। হয়তো তার পাখিটার পিছু পিছু মধুর লোভে যাওয়ার খুব ইচ্ছে। কর্তাদের সামনে কাজ ফেলে যাবে কিনা ভেবে ইতস্তত করছে।

অবশেষে থাকতে না পেরে উঠে দাঁড়ায় জাম্বো। রান্নার কাজ রইল পড়ে। দলের আরও কয়েকজন মালবাহক উপজাতীয় মানুষ পাখিটার ডাকাডাকি শুনে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল ওই দিকে। জোজো নামে তাদেরই একজনকে কী জানি ইশারা করল জাম্বো। মনে হল যেন ওর সঙ্গে যেতে ডাকছে। জোজো কিন্তু ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ চায় না যেতে। জাম্বো একটু মুখভঙ্গি করে প্রফেসর ঘোষ ও বিলকে একবার টেরিয়ে দেখে নিয়ে পাখিটাকে অনুসরণ করতে শুরু করল।

যেই জাম্বো পা চালিয়েছে, হনি-গাইড় পাখিটার ফুর্তি যেন গেল বেড়ে। সে অমনি কাছে আর একটা গাছে উড়ে গিয়ে ডাকাডাকি লাফালাফি করতে থাকে। জাম্বো সেই গাছটার তলায় গিয়ে পাখিটার দিকে তাকাতেই পাখিটা খানিক তফাতে আর একটা গাছে উড়ে যায়। সে নাগাড়ে ডাকছে, নাচছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে উত্তেজিত ভাবে। কিচ কিচ কিচ— মধু। মধু পাবে। এসো চটপট আমার সঙ্গে।

পাখির হাবভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না জাম্বোর। সে পাখিটার ওপর নজর রেখে পায়ে-পায়ে এগোয়। পাখিটি ক্রমেই জঙ্গলের কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জাম্বোকে। নিশ্চয়ই ওই বনের ভিতর কোথাও সে মৌচাকের সন্ধান পেয়েছে।

—'হুজুর, জাম্বোকে যেতে বারণ করুন পাখিটার সঙ্গে।'

পিছনে টিকের গলা শুনে ঘোষ অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে বলল— 'কেন?'

টিক আফ্রিকান উপজাতির লোক। এই অভিযাত্রী দলের সঙ্গে এসেছে কাজ করতে। টিক বলল— 'হুজুর, ওই পাখি জাম্বোকে ঠিক বিপদে ফেলবে।'

—'বিপদে ফেলবে? কীভাবে?'

—'তা জানি না। তবে ফেলতে পারে কোনো বিপদে। কারণ ওই পাখিটা গতকাল জাম্বোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বনের ভিতর গাছে একটা মৌচাক দেখিয়েছিল। লোভী জাম্বো পাখিকে ফাঁকি দিয়েছে। গোটা চাকটা ভেঙে নিয়ে চলে আসে। পাখিকে একটুও তার ভাগ দেয়নি।'

—'তাতে হয়েছেটা কী?'

—'হুজুর ওই পাখিরা ভীষণ চালাক। ওরা মধু খেতে খুব ভালোবাসে। নিজেরা মৌচাক থেকে মধু খেতে পারে না মৌমাছির ভয়ে। তাই ওরা কোনো মানুষকে কষ্ট করে ডেকে এনে দেখায় চাকটা। কিন্তু ওই মৌচাক ভেঙে মধুর ভাগ না দিলে বেজায় চটে যায়। তখন সেই মানুষকে বিপদে ফেলার ফন্দি করে। আমার খুড়ো একবার ওইরকম একটা পাখিকে ঠকিয়েছিল। ভাগ দেয়নি মৌচাকের মানে মধুর। পরদিন সেই পাখি খুড়োকে ডাকাডাকি করে নিয়ে গিয়ে সোজা হাজির করে এক সিংহর সামনে। ভাগ্যিস খুড়ো ছিল গাছে চড়তে ওস্তাদ। সিংহ আক্রমণ করার আগেই তরতর করে উঠে যায় কাছে একটা উঁচু গাছের মগডালে। ঘণ্টা দুই সেই গাছের নীচে ঘোরাফেরা করে সিংহটা চলে গেলে তবে নেমে পালায়। বরাতজোরে সেবার খুব বেঁচে গিয়েছিল খুড়ো।

এমন ভুল সে আর করেনি। জাম্বো পুব দেশের লোক। এই জাতের পাখির হালচাল ঠিক জানে না। আমরা এই অঞ্চলের লোকরা জানি।'

বিল মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁ। এই ব্যাপারটা আমিও শুনেছি সেবার।'

প্রফেসর ঘোষ বললেন, 'জাম্বো যে পাখিটাকে ভাগ দেয়নি তুমি জানলে কী করে?'

—'হুজুর কাল নিজের চোখে দেখলাম দূর থেকে। জাম্বো একটা পাত্রে মৌচাকটা ভরে নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এলো। পাখিটা তার পেছন পেছন সমানে আসছিল উড়ে-উড়ে, ডাকতে-ডাকতে। ওই ডাকের ভাষা আমরা বুঝি। একটু মধুর ভাগ চাইছে। জাম্বো ঢিল ছুড়ে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিল পাখিটাকে।'

—'তুমি তখন বললে না জাম্বোকে, পাখি কী চাইছে?'— বিল জানতে চাইলেন।

—'বলেছিলাম হুজুর। জাম্বো বিশ্বাস করল না। ভাবল মজা করছি। তাছাড়া পাখিটা ততক্ষণে চলে গেছে।'

প্রফেসর ঘোষ একটু উদ্‌বিগ্ন ভাবে হনি-গাইডের পিছু পিছু জাম্বোর চলা দেখতে থাকেন। বিলও ভুরু কুঁচকে গুম মেরে রইলেন। টিক সরে গেল তফাতে।

এই ফাঁকে প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ এবং বিল-এর পরিচয়টা জানাই।

ডক্টর নবগোপাল ঘোষ বিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী। অধ্যাপক। বাঙালি। নিবাস কলকাতা শহরে। দেশে-বিদেশে প্রায়ই ঘোরেন গবেষণার উদ্দেশ্যে বা বক্তৃতা দিতে। বিল ইউরোপীয়। পুরো নাম উইলিয়াম হার্ডি। থাকেন পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়ায়। রোদে-জলে পোড় খাওয়া দীর্ঘ পাকা বাঁশের মতো কাঠামো। একদা দুর্ধর্ষ শিকারি এই ব্যক্তি সারা পূর্ব-আফ্রিকায় ডেয়ারিং বিল নামে খ্যাত। বহু বছর ধরে বাস করছেন আফ্রিকায়। তবে বিল এখন শিকার ছেড়ে দিয়েছেন। যারা আফ্রিকায় বেড়াতে আসে তাদের গাইডের কাজ করেন। প্রফেসর ঘোষ আগেও কয়েকবার এসেছেন আফ্রিকা মহাদেশে। বিলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছে তখন। ঘোষ ও বিল ছাড়া এই সাফারি পার্টির বাকিরা সবাই নানা কাজের জন্য ভাড়া করা উপজাতীয় লোক। বিল উপজাতিদের ভাষা দিব্যি জানেন। প্রফেসর ঘোষও শিখেছেন অল্পস্বল্প। দেশি লোকেরাও অল্পস্বল্প ইংরিজি বুঝতে ও বলতে পারে।

বেচুয়ানাল্যান্ডে প্রফেসর ঘোষ আগে কখনো আসেননি। এবার তাঁর

আফ্রিকা-ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য এই মহাদেশের কিছু অঞ্চলের জীবজন্তুর ফোটো তোলা এবং এখানকার কিছু দুর্লভ কীটপতঙ্গের স্পেসিমেন সংগ্রহ করা।

প্রফেসর ঘোষ ও বিল দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। নবগোপাল ঘোষ মাঝারি উচ্চতা, মাঝারি স্বাস্থ্যের, নিরীহ অধ্যাপক সুলভ দেখতে। চেহারার অমিল থাকলেও স্বভাবে এক জায়গায় প্রফেসর ঘোষ এবং ডেয়ারিং বিলের বেজায় মিল। উভয়েই দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় এবং প্রকৃতিপ্রেমী। দেখতে দেখতে হনি-গাইড পাখিটাকে অনুসরণ করে জাম্বো অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের ভিতরে।

বিল হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। বলেন, ‘চলুন প্রফেসর, ব্যাপারটা দেখা যাক।’ কী ভেবে বিল তাঁর পিস্তলটাও তুলে নিলেন। ঘোষও উঠলেন। বনের দিকে রওনা দিলেন। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে দলের কয়েকজন দেশি লোক ঘোষ ও বিল-এর পিছু নিল কৌতূহলে।

বনের মধ্যে কোথায় রয়েছে জাম্বো বোঝা মুশকিল। এদিক-সেদিক ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ হনি-গাইড পাখির তীক্ষ্ণ স্বরের ডাক কানে আসে। পাখির ডাক লক্ষ্য করে জংলা সরু পথ ধরে চলেন ঘোষ ও বিল। সহসা দেখা পেলেন জাম্বোর।

চারপাশে মোটামুটি ঘন গাছপালার মাঝে খানিক ফাঁকা জায়গা। সেখানে অল্প কিছু বেঁটে-বেঁটে ঝোপ আর মধ্যিখানে এক বড়ো গাছ। গাছটার গুঁড়ি সোজা উঠে গেছে প্রায় দশ-বারো ফুট। তারপর ডাল বেরিয়েছে।

হনি-গাইড সেই গাছটায় বসে ডাকছে। আর জাম্বো নীচে দাঁড়িয়ে দেখছে মাথা তুলে।

পাখিটা এডালে-ওডালে বসছে উড়ে-উড়ে আর বারবার গাছের গুঁড়ি থেকে প্রথম যে ডালটা বেরিয়েছে সেই জোড়ের কাছে বসে ডাকছে জোরে জোরে এবং ডানা ঝাপটাচ্ছে।

বিল নজর করেন যে ওই প্রথম ডাল বেরুনোর জোড়ের ঠিক ওপরে গুঁড়ির গায়ে একটা মাঝারি গর্তের বা ফোকরের মুখ। তিনি প্রফেসরকে দেখালেন ফোকরটা। পাখিটা যেন জাম্বোকে প্রাণপণে ওই ফোকরটা দেখাবার চেষ্টা করছে, আহ্বান জানাচ্ছে, আবার সরে যাচ্ছে অন্য ডালে।

—‘ওই গর্তে কি মৌচাক আছে?’— বলেন প্রফেসর ঘোষ।

—‘থাকতেও পারে। কী জানি?’

ওই ফোকরটা জাম্বোর চোখেও ধরা পড়েছিল। পিছনে যে বিল ও ঘোষ এসে হাজির হয়েছেন তা সে টের পেয়েছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখেছে একবার। মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার জানিয়েছে হুজুরদের। তবে বিল ও ঘোষের দিকে আর সে দৃক্‌পাত করেনি। আপাতত সে মধুর প্রলোভনেই মজে আছে।

জাম্বো গাছটায় উঠতে লাগল। তার দেহ বিরাট এবং ভারী। তাই সে সাবধানে উঠল, গুঁড়ির খাঁজে-খাঁজে হাতে পায়ে আঁকড়ে প্রথম মোটা ডালটায় চড়ে বসল জাম্বো। তারপর ডাল পাকড়ে ফোকরের কাছে গিয়ে যেই উঁকি মারতে যাবে ভিতরে, মৌচাকটা দেখতে, বিল হেঁকে বললেন তাকে, 'ওহে ওই গর্তে হাত ঢুকিয়ো না। বেশি কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ো না। আগে একটা ডাল ভেঙে খানিক দূর থেকে ঢোকাও গর্তে।'

—'কেন হুজুর?'— জাম্বো অবাক, 'ঠিক আছে, হাত ঢোকাচ্ছি না। আগে ভালো করে দেখে নিই মৌচাক আছে কিনা। তারপর ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়িয়ে মৌচাক কেটে বের করব। এখন লাঠি দিয়ে খোঁচালে মৌমাছিরা যে রেগে গিয়ে কামড়াবে আমায়।'

—'যা বলছি করো।'— বিল কড়া সুরে বলেন।

জাম্বো বিরক্ত মুখে একটু পিছিয়ে গিয়ে গাছে ঝুলে থাকা একটা সরু লম্বা ডাল ভেঙে আস্তে আস্তে ঢোকায় গর্তে।

ফোঁস! একটা সাপের হাঁ করা মাথাসুদ্ধ শরীরের ফুটখানেক আবির্ভূত হয় গর্তের ভিতর থেকে। ফটাস। ছোবল পড়ে লাঠিতে অর্থাৎ ডালটায়।

—'বাপরে!' আর্তনাদ করে জাম্বো ডালটা ফেলে দেয়। বিদ্যুৎ গতিতে একটা মোটা সাপ তেড়ে বেরিয়ে আসে। ফুট তিনেক লম্বা সাপ। রাগে ফুঁসছে। জাম্বো প্রাণভয়ে পেছোতে চেষ্টা করে ডাল বেয়ে। মাত্র কয়েক হাত দূরে সাপটা। জাম্বো নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার আগেই হয়তো ছোবল খাবে।

দুম! বিলের পিস্তল গর্জে ওঠে। পিস্তলের গুলিতে সাপের মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। প্রাণহীন সরীসৃপের দেহটা মাটিতে আছড়ে পড়ে ধড়ফড় করতে করতে স্তব্ধ হয়।

—'প্যাফ অ্যাডার!'— পিস্তল পকেটে রেখে সাপের দেহটা দেখে মন্তব্য করেন বিল, 'ভীষণ বিষাক্ত সাপ! এই ভয়টাই করছিলাম। গর্তে সাপ থাকতে পারে।'

প্রফেসর ঘোষ সাপটা দেখতে দেখতে বলেন, 'অ্যাডার। মানে ভাইপার

অর্থাৎ বোড়া গোত্রের সাপ। চন্দ্রবোড়া জাতীয়। ওঃ দারুণ টিপ তোমার বিল! জাম্বো আজ খুব বেঁচে গেছে।'

এবার জাম্বোর দিকে নজর ফেরে। সে তখন গাছের ডাল আঁকড়ে প্রায় ঝুলছে। চোখ বিস্ফারিত।

—'নেমে এসো।'— জাম্বোকে ডাকেন বিল।

জাম্বো মাথা নাড়ে। মনে হল, গাছ বেয়ে নেমে আসার শক্তিটুকুও সে হারিয়ে ফেলেছে।

—'জাম্বোকে নামিয়ে আনো।'— পিছনে জড়ো হওয়া স্তম্ভিত লোকগুলিকে আদেশ দেন বিল।

তারা গাছে উঠে দড়ির মই লাগিয়ে প্রায় ঘাড়ে করে নামিয়ে আনে জাম্বোকে। মাটিতে নেমেই ধপ করে বসে পড়ে জাম্বো। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তার মুখ তখনও ফ্যাকাশে। থরথর করে কাঁপছে শরীর। ধাতস্থ হতে তার মিনিট দশেক সময় লেগে যায়।

ঘোষ এবার প্রশ্ন করলেন জাম্বোকে— 'আচ্ছা জাম্বো, এই পাখি যে মৌচাকের সন্ধান দেয় তুমি আগে জানতে?'

—'আজ্ঞে না। এখানে এসে শুনলাম।'

—'কার কাছে?'

—'জোজো। গতকাল এমনি একটা পাখি এসে ডাকাডাকি করছিল। তখন জোজো বলল আমায়।'

—'কাল নাকি এই পাখিটার দেখানো মৌচাক পেয়ে তুমি পাখিকে ভাগ দাওনি মধুর?'— জিগ্যেস করেন বিল।

—'এই পাখিটা?— কেমন ধাঁধায় পড়ে জাম্বো, কী জানি। তবে ঠিক এমনই দেখতে ছিল পাখিটা।'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেই পাখিটাই এসেছিল আজ। তুমি কি কাল ভাগ দিয়েছিলে ওকে মৌচাকের? পাখির পাওনা মজুরি।'

—'না।'

—'কেন? জোজো বলেনি তোমায়? এই হনি-গাইড পাখিরা তাদের দেখানো মৌচাক থেকে মধুর ভাগ না পেলে খুব চটে যায়। শোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। ফাঁদে ফেলে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, যে ফাঁকি দিয়েছে তাকে।'

—'না, বলেনি তো!'

—'আশ্চর্য! জোজো এই অঞ্চলের লোক। হনি-গাইডের এই স্বভাব তার না জানার কথা নয়। জোজো কি কাল তোমার সঙ্গে গিয়েছিল জঙ্গলে মৌচাক ভাঙার সময়?'

—'হ্যাঁ গিয়েছিল।'

—'চাকটা কে ভেঙেছিল? তুমি না জোজো?'

—'আমি।'

—'চাক নিয়ে ফেরার সময় পাখি ওর ভাগ চায়নি? মানে পিছন পিছন আসেনি ডাকতে-ডাকতে?'

—'হ্যাঁ, আসছিল। কিন্তু জোজো বলল, এই পাখিরা মৌমাছির শত্রু। চাক ভাঙতে মৌমাছিরা জব্দ হয়েছে, তাই ভারি খুশি হয়ে ডাকছে পাখিটা। ধন্যবাদ জানাচ্ছে আমাদের।'

—'জোজো কি ওই মৌচাকের মধু খেয়েছে?'

—'খেয়েছে। তবে তখন নয়। পরে রাতে। আমি তখুনি একটু মধু চেখে দেখলাম। জোজো খেল না। ও বলল, জরুরি কাজ আছে। তাই চলে গেল তখন। মৌচাক নিয়ে আমি একাই ফিরলাম। পাখিটা বড্ড জ্বালাচ্ছিল তাই তাড়িয়ে দিলাম।'

বিল ঘোষকে বললেন, 'বুঝেছেন প্রফেসর, জোজো ইচ্ছে করেই বিপদে ফেলতে চেয়েছিল জাম্বোকে। কিন্তু কেন?'

এবার প্রফেসর ঘোষ প্রশ্ন করলেন জাম্বোকে, 'আচ্ছা তোমার সঙ্গে কি জোজোর ঝগড়া হয়েছে কখনো?'

—'হ্যাঁ হুজুর, হয়েছে। একটু লজ্জিত ভাবে জানায় জাম্বো। ও বেশি মাংস খেতে চাইছিল অন্যদের চেয়ে। আমি দিইনি। জোজো রেগে খারাপ একটা গালি দিল আমায়। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। জোজোকে মারতে গেলাম। অন্যরা অনেক কষ্টে থামায় আমাকে। নইলে মোক্ষম দু-ঘা লাগাতাম জোজোকে। অন্যরা অবশ্য জোজোকে খুব দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ওরই দোষ। যা হোক পরে মিটে গেছিল ব্যাপারটা। পরে জোজো একা এসে আমার কাছে মাপ চেয়ে নেয়। আমিও রাগ পুষে রাখিনি আর।'

প্রফেসর ঘোষ বললেন, 'সেই ঝগড়া হয়েছিল কবে?'

—'এই পাখি মৌচাক দেখানোর দুদিন আগে।'

এবার প্রফেসর ঘোষ বিলকে বললেন, 'আসল ব্যাপারটা বুঝছেন বিল?

জাম্বোর সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠবে না তাই শয়তান জোজো এই মতলব করেছিল জাম্বোকে জব্দ করতে। প্রতিশোধ নিতে। জাম্বো রাগ পুষে রাখেনি বটে, কিন্তু জোজো রেখেছিল। ওঃ! ভাগ্যিস তুমি জাম্বোকে ফলো করলে।'

ভয়ানক রেগে বিল হুংকার দিলেন, 'জোজোকে ধরে আনো।'

পিছনে দর্শক দেশি লোকরা ইতিউতি তাকিয়ে বলল, 'আরে জোজো গেল কোথায়? এই তো একটু আগেই সে ছিল এখানে। আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল।'

তারা ছুটল তাঁবুর দিকে।

কিন্তু জোজোর পাত্তা পাওয়া গেল না।

কিছু লোক হইহই করে ছুটছিল জঙ্গল ঢুঁড়ে জোজোকে ধরে আনতে। প্রফেসর ঘোষ তাদের বাধা দিলেন, 'থাক ওর পেছনে আর সময় নষ্ট করার দরকার নেই। ও একা একাই ফিরুক ওর গ্রামে। এই মাসের মাইনেটা যে আর পেল না, এটাই ওর কাছে মস্ত লোকসান। ভালোরকম শাস্তি।'

তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'সাবধান জাম্বো! ভবিষ্যতে আর কখনো এই হনি-গাইড পাখি মৌচাকের খোঁজ দিলে পাখিকে তার ভাগ দিতে ভুলো না।'

দূত

আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে এসে উপস্থিত হলাম। আমরা মানে— আমি, সুনন্দ ও মামাবাবু। আমার বাল্যবন্ধু সুনন্দ ও তার
মামা অধ্যাপক নবগোপাল বাবুর পরিচয় আপনারা আগেই পেয়েছেন ('ড্রাগন-ফ্লাই', সন্দেশ, এপ্রিল '৬৬)। নবগোপালবাবু বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী। সুনন্দ তাঁর সংসারে একমাত্র আপনজন— প্রিয় ছাত্র ও শিষ্য। নানা গবেষণায় যুক্ত হয়ে নবগোপালবাবু প্রায়ই দেশবিদেশে ভ্রমণ করেন। সুনন্দ সর্বদাই তাঁর সঙ্গে যায়। এবার সুনন্দের আগ্রহে আমিও তাদের সঙ্গে জুটে পড়েছি।

মামাবাবু এখানে এসেছেন এক আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে। দ্বীপের পাশেই একটি ছোটো জাহাজ নোঙর করেছে। জাহাজটি সামুদ্রিক গবেষণার উপযুক্ত আধুনিক যন্ত্রপাতিতে পূর্ণ। নানা দেশ থেকে আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিক গবেষক এসেছেন। সমুদ্র স্রোত, সমুদ্রগর্ভের প্রাণীকুল, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চলবে। অন্যান্য গবেষকরা জাহাজেই বাস করবেন স্থির করেছেন, অবশ্য আবহাওয়া খারাপ থাকলে বা ঝড় উঠলে দ্বীপে আশ্রয় নেবেন। থাকা-খাওয়ার সমস্ত সুবন্দোবস্তই জাহাজে বর্তমান। আমরা কিন্তু ঠিক করেছি মাটির ওপর থাকব। দিন-রাত অতটুকু জাহাজে বন্ধ হয়ে থাকা পোষাবে না। দ্বীপে একটি সুন্দর ছোটো কুটিরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। জাহাজের এক লশকর আপাতত আমাদের সঙ্গে কুটিরে থাকবে, আমাদের রান্নাবান্না ও অন্যান্য কাজ করে দেবে।

সীমাহীন সমুদ্রবুকে বিন্দুবৎ এই ভূখণ্ড। আমাদের দ্বীপটি প্রশান্ত মহাসাগরের

দক্ষিণ অংশে টঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত। প্রায় একশো-পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে টঙ্গা দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। তার মধ্যে মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশটিতে জনবসতি আছে।

প্রথম তিন-চার দিন আমি মহা ফ্যাসাদে পড়লুম। হাতে অফুরন্ত সময়— সারাক্ষণ কী করি কী করি চিন্তা। কিন্তু দুঃখের বিষয় করার তো কিছু পাই না।

মামাবাবু সক্কালে প্রাতরাশ করে জাহাজে চলে যান। তীর থেকে লঞ্চে করে গিয়ে জাহাজে ওঠেন। সারাদিন সেখানে কাটান— নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত থাকেন, ফেরেন সন্ধেবেলা। এক-একদিন রাত্রেও কাজ চলে— জাহাজেই থেকে যান সে রাত। সুনন্দ কোনো দিন তাঁর সঙ্গে যায়, সে দিন আমি একেবারে নিঃসঙ্গ।

এখানে বেড়াবার জায়গা অতি অল্প, দেখার বস্তুও ততোধিক সামান্য। মাত্র শ-খানেক স্থানীয় পলিনেশিয়ানের বাস এই দ্বীপে। এদের চেহারা সুশ্রী, চালাক চতুর হাবভাব। মাছ ধরে ও নারিকেল চালান দিয়ে প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করে। ইচ্ছে ছিল এদের সঙ্গে আলাপ জমাই। কিন্তু ভাষাই প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল। ওরাও বোঝে না আমার ভাষা, আমিও বুঝি না ওদের। কাজেই দূর থেকে লক্ষ্য করি।

দ্বীপটি প্রবাল দিয়ে তৈরি। ঝোপঝাড় গাছপালা প্রচুর। সমুদ্র-উপকূলে সারি সারি সুউচ্চ নারিকেল বৃক্ষগুলি সর্বদাই ঝোড়ো বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে।

প্ল্যান করলাম সমুদ্র দেখব। প্রাণভরে এই অকূল পাথার সুনীল জলধি দর্শন করেই সময় কাটাব।

যে পাশটায় নোঙর করেছে তার উল্টোদিকে, নির্জন সমুদ্রসৈকতে ঘোরাফেরা আরম্ভ করলাম। দ্বীপের এ অংশ জনবসতিহীন। জলের কিনারায় খাড়া দাঁড়িয়ে আছে এক আলোকস্তম্ভ। স্তম্ভের মাথায় সারা রাত আলো জ্বলে। উজ্জ্বল চক্ষু মেলে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সে পাহারা দেয়। সাগরবক্ষে জাহাজ ও নৌকোকে নিশানা দেখায়। কূলের কাছে কয়েকটা ডুবো পাহাড় আছে। সমুদ্রগামী তরণীকে এই অদৃশ্য বিপদ হতে সতর্ক করে দেবার জন্য আলোকস্তম্ভটি নির্মিত হয়েছে।

ওই আলোকস্তম্ভের একটি মাত্র রক্ষক। স্তম্ভের ডগায় ছোট্ট ঘরের জানলা দিয়ে তাকে দেখা যেত। শুনেছি লোকটা বড়ো মেশে না কারো সঙ্গে। একা একা সমুদ্রতীরে ঘোরে বা লাইটহাউসের মধ্যেই বসে থাকে।

সমুদ্রের আকর্ষণ বড়ো দুর্বার। সে সদাই চঞ্চল, সদাই অস্থির। দেখতে দেখতে নেশা ধরে যায়। সাগর দেখে ক্লান্তি আসত না আমার। যেদিন সুনন্দও

থাকত না, একা কূলে বসে দেখতাম— ঢেউগুলো প্রতি মুহূর্তে চলে এসে ক্রুদ্ধ গর্জনে লাফিয়ে পড়ছে বালির ওপর। আবার সরসর করে পিছিয়ে যাচ্ছে— পালিয়ে যাচ্ছে। জলোচ্ছ্বাসের একটানা সংগীত। দিকচক্রবালের জল নিয়ত বদলাচ্ছে। তীরের কাছে নানান সামুদ্রিক পাখি উড়ে বেড়ায়। কখনো ঢেউয়ের বুকে খোঁচা মারে মাছের আশায়। মস্ত বড়ো বড়ো কচ্ছপ ধীরে ধীরে ডাঙায় উঠে আসে। বালি খুঁড়ে ডিম পেড়ে বালি চাপা দিয়ে রেখে আবার ডুব মারে সাগরগর্ভে।

একটা জিনিস লক্ষ করছি, এখানকার বাতাসের গুণ। সমুদ্রের বাতাসে কিছুক্ষণ তাকালেই খিদে পেয়ে যায়। সারাদিন তাই কেবলই খাই খাই করি।

খাচ্ছি তো কম নয়! প্রচুর সমুদ্রের মাছ। অতি সুস্বাদু কচ্ছপের মাংস, তাছাড়া আছে টিনের খাবার। নামমাত্র মূল্যে নারকেল ও কলা মেলে। যখন-তখন নারকেল চিবুচ্ছি, দিনে গণ্ডাকয়েক কদলী গলাধঃকরণ করছি, কিন্তু তবু খিদে মেটে না কেন? আশা করছি দেশে ফেরার আগেই শরীরটা দিব্যি বাগিয়ে ফেলব।

দুই

সেদিন আমি সমুদ্রতীরে পায়চারি করছি, হঠাৎ দেখি কে একজন দাঁড়িয়ে। চোখে দূরবীন লাগিয়ে দূর আকাশের পানে তাকিয়ে আছে।

আরে এ তো সেই লাইটহাউসের রক্ষক। লোকটাকে ভারি রহস্যময় ঠেকত। ভালো করে দেখবার জন্যে কাছে এগিয়ে যাই।

সেও আমাকে দেখেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে। গায়ে নাবিকের পুরনো পোশাক। বয়স হয়েছে, কিন্তু বেশ শক্ত শরীর। রোদে পোড়া, জলে ভেজা পোড় খাওয়া চেহারা। একমুখ সাদা দাড়ি। মাথায় উশকোখুশকো পাকা চুল। তীব্র চোখের দৃষ্টি।

আমাকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ নজর করে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে রুক্ষ স্বরে সে প্রশ্ন করল— হ্যাল্লো, এখানে কী করছ? পাখি-টাখি মারার মতলব আছে নাকি?

বুঝলাম পাখি শিকার সে পছন্দ করে না। তাড়াতাড়ি উত্তর দিই— মোটেই না, সে রকম কোনো অভিসন্ধি নেই, স্রেফ সমুদ্রের হাওয়া খাচ্ছি। তাছাড়া দেখছই তো সঙ্গে আমার কোনো বন্দুক-টন্দুক নেই।

জবাব শুনে লোকটা একটু সন্তুষ্ট হল। বলল— বেশ বেশ। সমুদ্রের হাওয়া

অতি উত্তম বস্তু। সব রোগ সারিয়ে দেয়। আমি সারা জীবন এই হাওয়া টেনেছি বুক ভরে। কখনো অসুখ হয় না আমার।

একটু একটু করে ওর সঙ্গে ভাব জমাই।

নাম ভন ডিকি। জাতিতে ওলন্দাজ। আগে ছিল নাবিক। বয়স হওয়ার পর এই পদটি গ্রহণ করেছে!

আমাকে বলল— মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন ইন্ডিয়ান? ইস্ট ইন্ডিজের লোক?

আমি বলি— হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ ইন্ডিয়ান বেঙ্গলি। ক্যালকাটার নাম শুনেছ? সেখানে থাকি আমরা—

সে বলল— বটে, ক্যালকাটার লোক! ক্যালকাটার নাম শুনব না বলো কী হে! কতবার গিয়েছি ক্যালকাটা পোর্টে। খুব জমকালো শহর।

জিজ্ঞেস করি, একা লাগে না তোমার? এই নির্জনে সারাক্ষণ লাইটহাউসের মধ্যে সময় কাটাও?

ডিকি বলল, না না, একা লাগবে কেন? সমুদ্রই তো আমার সঙ্গী রয়েছে। ঢেউয়ের ভাষা আমি বুঝি! কত রাজ্যের খবর বয়ে এনে আমায় শোনায়। দেশেও আমার আপনজন তেমন কেউ নেই। তাছাড়া সারা জীবন সাতসাগরের বুকের ওপর চষে বেড়িয়েছি, জল দেখে দেখে অভ্যেস হয়ে গেছে। লোনা বাতাস নাকে না গেলে দম আটকে তোলে। এ বয়েসে আর গ্রামে ফিরে, প্রতিবেশীর ভিড়ে শুকনো ডাঙায় ঘর বাঁধতে পারব না। এই দ্বীপেই তাই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব ঠিক করেছি।

ডিকি তার নাবিক জীবনের, সমুদ্র-ভ্রমণের অনেক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা শোনাল। চমৎকার দিলখোলা বৃদ্ধ— আমার সঙ্গে ভারি ভাব হয়ে গেল তার।

দেখছিলুম কথা বলতে বলতে ডিকি মাঝে মাঝে একদৃষ্টে দূর দিগন্তে তাকিয়ে থাকছে। দূরবীন চোখে দিয়ে কী জানি দেখবার চেষ্টা করছে! কৌতূহলী হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম— কী দেখছ ডিকি? কোনো জাহাজ-টাহাজ আসবার কথা আছে নাকি?

—না না জাহাজ নয়। পাখি! গরম পড়ে গেল, এখন তাদের এসে পড়বার কথা।

—কী পাখি? কোত্থেকে আসবে!

—প্লোভার! গোল্ডেন প্লোভার। আসবে বহু দূর থেকে। প্রশান্ত মহাসাগরের

উত্তর সীমায় সেই যে ঠান্ডার দেশ, সেখান থেকে আসবে। সেখানে এখন শীত এসে পড়ল। তুষারপাত হবে। সারা দেশ ঢেকে যাবে বরফে। কনকনে হিমেল হাওয়া বইবে। প্লোভাররা তাই এ সময়ে প্রতি বছর দক্ষিণে চলে আসে। কিছু পাখি এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়। আমি তাদেরই জন্য প্রতীক্ষা করছি।

আশ্চর্য হয়ে বলি— বলো কী হে! এই দুস্তর প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে আসবে সামান্য ওই ছোট্ট পাখিগুলো? এ অসম্ভব!

ডিকি ঘাড় নাড়ে— দেখতে ওইটুকু হলে কী হবে পাখির জান ভারি কঠিন। অবশ্য এসে যখন পৌঁছয় খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে; কিন্তু তবুও আসে, প্রতি বছর আসে। আবার সেই উত্তরদেশে যখন শীত কমে গরম পড়ে, পাখিরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়।

রাত্রে খাওয়ার পর মামাবাবুর সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলে।

মামাবাবুকে বললেন, ঠিকই বলেছে ডিকি। অক্টোবর মাস নাগাদ এখানে প্যাসিফিক গোল্ডেন প্লোভারের আগমন ঘটে।

প্রশ্ন করি— কত বড়ো পাখি এই প্লোভার!

—বড়ো নয়, ছোটো পাখি। আসলে প্লোভার হল তিতির। তিতির একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীতে প্রায় পঁচাত্তর রকম স্পিসিস অর্থাৎ প্রজাতি আছে। গোল্ডেন প্লোভার বা সোনালি তিতিররা স্বভাবে যাযাবর। বুঝলে, ভারতবর্ষের গোল্ডেন প্লোভার দেখা যায়— কেবল শীতকালে। ভারতের বাইরে থেকে আসে শীতকাল কাটাতে।

—তা ওই 'প্যাসিফিক' আখ্যাটা আবার জুড়লেন কেন?

—কারণ প্যাসিফিক মানে প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে এই পাখিগুলির যোগ আছে। যে গোল্ডেন প্লোভারদের বাস আলাস্কায় পশ্চিমে ও সাইবেরিয়ায় পূর্ব প্রান্তে তাদেরই নাম প্যাসিফিক গোল্ডেনপ্লোভার। প্রতি শীতে এই প্লোভাররা 'মাইগ্রেট' করে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে আসে হাওয়াই, টঙ্গা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দ্বীপে। কারণ উত্তর গোলার্ধে যখন শীত দক্ষিণে তখন গ্রীষ্ম!

—বলেন কী প্রত্যেক বছর আসে, আবার ফিরে যায়।

মামাবাবু বললেন, সত্যি, 'বার্ড-মাইগ্রেশন' এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক ঘটনা। পৃথিবীতে শত শত জাতের পাখি আছে যারা স্বভাবে যাযাবর। প্রতি বছর তাদের

দেশে অর্থাৎ যে অঞ্চলে তারা ডিম পাড়ে সেই অঞ্চলে যখন শীতের আবির্ভাব ঘটে যাযাবর পাখিরা তখন অন্য কোনো অঞ্চলে উড়ে যায়। এক-এক জাতের পাখি এক-একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে এসে শীতকাল কাটায়। বোধহয় ঠান্ডার ভয়ে বা কীটপতঙ্গ ইত্যাদি খাদ্যের অভাব হওয়ায় শীতের আগমনে যাযাবর পাখিরা দলে দলে তাদের অন্য আস্তানা অভিমুখে রওনা হয়। সেখানে তখন উষ্ণতর আবহাওয়া, প্রচুর খাদ্য। কোনো কোনো জাতের পাখি আছে যারা সাগর গিরি মরুভূমি লঙ্ঘন করে দূর দূর দেশে চলে যায়। যেমন ধরো, ছোট্ট পাখি আর্টিক 'টার্ন', উত্তর মেরুর কাছে বাড়ি। উত্তর গোলার্ধে শীত পড়লে চলে আসে দক্ষিণ গোলার্ধেরও দক্ষিণ অঞ্চলে। যাওয়া-আসায় মোটামুটি বাইশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে! প্যাসিফিক গোল্ডেন প্লোভাররাও বড়ো কম হয় না— যাতায়াতে বারো তেরো হাজার মাইলের ধাক্কা!

মামাবাবু ডিবে বের করে একটিপ নস্যি নিলেন। গোটা দুয়েক সজোরে হাঁচলেন। একটু দম নিয়ে ফের বলতে আরম্ভ করলেন—

পাখিরা তাদের শীতকালীন আস্তানায় তো হাজির হল। সেখানে আরামে কাটাল কটা মাস। এদিকে নিজেদের দেশে ক্রমে শীত যায় কমে। আবহাওয়া উষ্ণতর হয়ে ওঠে— গ্রীষ্ম এসে পড়ে। পাখির দল কোনো অজানা সংকেতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর দেখা যায় দলে দলে পাখি ফিরে চলেছে যে যার দেশে।

দেশে ফিরে তারা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। মাস গড়ায়, শাবকরা বড়ো হয়। আবার সে রাজ্যে শীত আসে এগিয়ে। শীতের প্রারম্ভে কাচ্চা-বাচ্চা সমেত পাখির দল আবার ঘর ছাড়ে।

দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছিল। তাই তো, এতদিন চোখের সামনে গাছে গাছে কত পাখি দেখেছি। ভেবেছি সবারই বাসা বুঝি ধারে-কাছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে এমন বিদেশি অতিথিরা থাকেন কে জানত? ভিন দেশের মানুষ দেখে আকৃষ্ট হয়েছি। কল্পনা করেছি দূর দেশ থেকে কত অজানা পথ বেয়ে এসেছে লোকটি! কত না-জানা পৃথিবীর খবর রাখে ও। কিন্তু ওই যে পাখির দল, তারাও নাকি আসে অনেক দূর দেশ থেকে, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। প্রতি বছর চলে তাদের যাযাবরী ভ্রমণসূচি। যদি ওদের ভাষা বুঝতাম, কত দেশ-দেশান্তরের বার্তা ওরা পৌঁছে দিত আমাদের কানে।

প্রশ্ন করলাম— ভারতবর্ষেও বোধ হয় অনেক যাযাবর পাখি আসে বাইরে থেকে?

মামাবাবু বললেন, নিশ্চয়ই। শীতের আগে দেখনি নানা জাতের হাঁস সার বেঁধে আকাশপথে উড়ে যায়। এরা ভারতে আসে হিমালয় অঞ্চল, মধ্য এশিয়া এমনকী আরও উত্তরে সাইবেরিয়া থেকে। হাঁস ছাড়াও অবশ্য আরও নানান পাখি আছে শীতকালে ভারতে চলে আসে ঠান্ডা অঞ্চল থেকে। আবার ফিরে যায় শীতের শেষে।

সুনন্দ ততক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। কোনো কথা বলেনি। মনে হল এ-সব তত্ত্বের অনেকখানিই তার জানা। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল— আচ্ছা ভারত থেকেও কি কোনো পাখি শীতকালে বেরিয়ে যায়?

মামাবাবু বললেন— হ্যাঁ, তাও যায় বৈকি। যেমন 'পাইড ক্রেস্টেড কুক্কু', বাংলাদেশে যাকে ডাকে চাতক বা শা-বুলবুল। কোথাও চলে মৌসুমি পাখি।

সুনন্দ বলে— অ্যাঁ, চাতক! তাই নাকি! ওই যে ফুট খানেক লম্বা, দেহের ওপরের অংশ কালো-সাদা ডোরা, নীচের অংশ সাদা। লম্বা ডোরাকাটা লেজ, মাথায় কালো ঝুঁটি। বর্ষার আগে দেখা যায়— সেই পাখিটা তো?

মামাবাবু বললেন, রাইট। শীতের আগে চাতকরা আফ্রিকায় চলে যায়। আবার ফিরে আসে বর্ষা নামার ঠিক আগে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর পথ বেয়ে।

রাত হয়ে গেছিল। মামাবাবু তাড়া দিলেন, এবার শুতে যাও। আমার কিন্তু মোটেই ইচ্ছে ছিল না আড্ডা ভাঙতে। সংকল্প করলাম— ভালো করে লক্ষ করতে হবে এই যাযাবর পাখি সমাজকে।

তিন

পরদিন বিকেলে সাগরবেলায় ডিকির সঙ্গে দেখা হল। আজ সুনন্দ ছিল সঙ্গে। ডিকি আমাদের সহাস্যে অভ্যর্থনা জানাল।

কত রাজ্যের গল্প শোনাল সে। কত দেশ সে দেখেছে। কত বন্দরে তাদের জাহাজ ভিড়েছে। কত বিচিত্র তাদের অভিজ্ঞতা। এক-একটা কাহিনি রীতিমতো উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য।

ডিকি বলল— টঙ্গা দ্বীপপুঞ্জকে প্রথম সভ্যমানবের দরবারে পরিচিত করিয়ে দেয় তাদেরই পূর্বপুরুষ ওলন্দাজরা— সপ্তদশ শতাব্দীতে। তারপর এবেল টাসমেন, ডা. কুক-এর মতো আরও অনেক নামজাদা ক্যাপ্টেনের জাহাজ নোঙর করেছে টঙ্গা দ্বীপপুঞ্জে। কুক তো তিন-তিনবার এসেছিলেন। ভারি সহৃদয়

ব্যবহার পেয়েছিলেন তিনি পলিনেশিয়ানদের কাছ থেকে। খুশি হয়ে দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ করেন— ফ্রেন্ডস আইল্যান্ডস।

ডিকির সঙ্গে আমিও এখন উৎকণ্ঠিত চিত্তে পাখির আগমনের অপেক্ষা করছি। ডিকি বলল, ওরা আসছে; আমি বেশ অনুভব করছি খুব কাছে এসে পড়েছে। হয়তো বা আজকালের মধ্যেই—

ডিকির অনুমান সঠিক হল।

সেইদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তিনজন কুটিরের বাইরে চাঁদের আলোয় বসে। সহসা কানে এল ক্ষীণ আওয়াজ— কিচির মিচির, কিচমিচ কিচমিচ— শব্দ ক্রমশ এগিয়ে এল। দ্বীপের আকাশ মুখর হয়ে উঠল পাখির কাকলিতে। এক খণ্ড মেঘ যেন ভেসে এল মাথার ওপর। দেখলাম কিছু পাখি কিন্তু এল না— সোজা উড়ে বেরিয়ে গেল দ্বীপ ছাড়িয়ে। বাকিরা কিছুক্ষণ চক্কর দিল তারপর নামতে আরম্ভ করল।

আগন্তুক প্যাসিফিক গোল্ডেন প্লোভারদের সেই প্রথম ব্যাচ। পর পর কদিন ধরে আরও কয়েক ঝাঁক পাখি এসে আশ্রয় নিয়েছিল দ্বীপে।

সক্কালে বেরিয়ে পড়লাম।

দ্বীপের যে অংশ নির্জন সেদিকটায় নেমেছে প্রচুর পাখি। এখানে একটি অগভীর জলাশয় আছে। চারপাশে ঘাসবন। পাখিরা জলাশয়ের চতুর্দিকে আস্তানা গেড়েছে।

দেখি ডিকি ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে। অসংকোচে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাখিদের মাঝে। পাখিগুলি তাকে দেখে বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছে না— যেন অতি পরিচিত ব্যক্তি। পাখির চেঁচামেচিতে রীতিমতো সরগরম হয়ে উঠেছে সেই নির্জন স্থান।

পাখিগুলি মাপে আমাদের দেশের তিতিরের মতোই। ডানা ও দেহের ঊর্ধ্বাংশের রঙ খয়েরি তাতে সোনালি ও হলদে ছিটছিট। নীচের অংশ— বুক, গলা ছাই রঙের। সোজা শক্ত ঠোঁট। ঘাড় উঁচু করে সরু সরু ঠ্যাং ফেলে চলাফেরা করছে।

মামাবাবু বললেন— যেখানে এখন দেখছ হালকা কালো রং, প্রজনন ঋতুতে, ডিম পাড়ার সময় কিন্তু রং বদলে হয়ে যাবে কালো।

পাখিগুলো যেমন তীব্র বেগে ওড়ে, তেমনি মাটির ওপর দ্রুত ছোটে। তাদের মেজাজ ভারি তিরিক্ষি। একটু কাছে এগিয়েছি, অমনি তীক্ষ্ণ গলায় অ্যাইসা চেল্লাচেল্লি জুড়ে দিল যে কী বলব!

ডিকি কটমট দৃষ্টিতে তাকাল। আমরা সসংকোচে দূরে সরে গেলাম।

—নানা উপায়ে সে শ্রান্ত ক্লান্ত পাখিদের পরিচর্যা করতে থাকে। ফার্স্ট এড-এর বন্দোবস্ত করে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে। পকেট থেকে শুকনো মাছ, গমের দানা, আরও অনেক রকম পাখির খাবার বের করে ছড়িয়ে দেয়।

একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করছি। মনে হচ্ছে যেন পাখিগুলো ডিকির পূর্বপরিচিত! মামাবাবুকে জিজ্ঞেস করি— তাহলে কি একই পাখির ঝাঁক প্রত্যেক বছর এই দ্বীপে উপস্থিত হয়। কি-ন্তু, আলাস্কা— সাইবেরিয়া— অতদূর থেকে বিশাল প্রান্তর মহাসাগর পেরিয়ে এই ছোট্ট দ্বীপে পথ চিনে আসবে কী করে!

মামাবাবু বললেন, এ এক রহস্য। আজও পক্ষিতত্ত্ববিদরা এই রহস্যের সঠিক কোনো কিনারা করতে পারেননি। জানা গেছে, প্রত্যেক বছর যাযাবর পাখিরা শুধু যে একই শীত যাপনের এবং একই প্রজনন ভূমিতে, একই এলাকায় ফিরে আসে তাই নয়, কিছু পাখি একই নির্দিষ্ট বাসায় অভ্রান্তভাবে বছর বছর হাজির হয়। আকাশযাত্রায়ও এরা একটি সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে। যাওয়া-আসার পথে বিশ্রাম কেন্দ্রগুলিতেও পথশ্রান্ত পাখিরা প্রায় একই সময়ে এসে পৌঁছয়।

কেউ কেউ বলেন হয়তো কিছু ভৌগোলিক চিহ্ন, দিনে সূর্যের অবস্থান, রাতে আকাশের ভাষা, বায়ুর গতি ইত্যাদি মাইগ্রেটরি বার্ডদের দিকনির্ণয়ে সহায়তা করে। কিন্তু ধরো, যেখানে সামনে পার হতে হয় দিকচিহ্নহীন দুস্তর সাগর বা মরুভূমি, তখন? দেখা গেছে সে পথও পাখিরা দ্বিধাহীন চিত্তে সঠিক লক্ষ্যে তীর বেগে পার হয়ে যায়। কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের চালনা করে কে জানে?

সুনন্দ বলল, কিন্তু ডিকি পাখিদের আলাদা করে চিনছে কী করে?— সব কটাই তো দেখতে একরকম!

মামাবাবু বললেন, হয়তো দেখে দেখে ওর দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আলাদা করে চিনবার ক্ষমতা জন্মেছে তবে আমার ধারণা ও প্রধানত চিনছে রিং দেখে।

—রিং?

—হ্যাঁ, লক্ষ্য করে দেখো অনেক পাখির পায়েই রিং পরানো রয়েছে।

দূরবীন দিয়ে ভালো করে দেখলুম, তাই তো! হালকা অ্যালুমিনিয়ামের আংটি পরা, ওপরে আবার ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে কী সব লেখা! কী উদ্দেশ্য?

মামাবাবু বললেন— ওটা চিহ্ন। যাযাবর পাখিদের নিয়ে যারা গবেষণা করে তারা এ-জাতীয় পাখি ধরে পায়ে আংটি পরিয়ে দেয়। রিং-এর ওপর লেখা

থাকে একটা নির্দিষ্ট ক্রমিক সংখ্যা, যে ব্যক্তি বা সংস্থা পরিয়েছে তার নাম ঠিকানা ইত্যাদি—

এইরকম রিং পরানো পাখি যদি ধরা পড়ে বা মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তাহলে রিং-এর ঠিকানায় খবর পাঠানো হয়— অমুক নম্বর পাখি, ঠিক অমুক সময়ে, অমুক জায়গায় দেখা গিয়াছে। সাধারণত এরকম চিহ্ন দেওয়া পাখিকে বন্দী করে না রেখে, বা মেরে না ফেলে, ছেড়ে দেওয়াই নিয়ম। এমনি করে জানা যায় একটি বিশেষ পাখি কোন পথে যাতায়াত করে কোথায় কোথায় থাকে। কোথায় শীতকাল কাটায়। কোথায় বা তারা ডিম পাড়ে ইত্যাদি খবর—

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সমুদ্রগবেষক দলের প্রধান মি. রিচার্ডসন এবং তাঁর কজন সঙ্গীসাথী। বাইনকুলার লাগিয়ে তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন এই আশ্চর্য পক্ষী সমাগম।

দেখলাম সদ্যোজাত শাবকগুলিও সঙ্গে এসেছে। বললাম— ইস, কত টুকুটুকু ছানা দেখুন! এতটা পথ ওরা পাড়ি দেয় কী করে!

মামাবাবু বললেন, হুঁ, সঙ্গে তো আসেই। অনেক সময় আবার সবে ডিম ফোটা বাচ্চারা বাপ-জ্যাঠাদের সাহায্য ছাড়াই ঠিক পথ চিনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছয়। কী অদ্ভুত শক্তি!

হঠাৎ শুনি ডিকি মহা উত্তেজিতভাবে চিৎকার করছে— সেই বাচ্চাটা গেল কোথায়? এবার দেখছি না তো? আগের বার এল, কী সুন্দর ফুটফুটে ছানা। পায়ে টুকটুকে লাল গয়না পরিয়ে দিলুম— কিন্তু গেল কই?

মামাবাবু বললেন— শুনছ, ডিকিও রিং পরাবার বিদ্যে জানে।

অনেক খুঁজেও ডিকি পাখিটির সন্ধান পেল না।

পেছন থেকে রিচার্ডসন মন্তব্য করলেন, কে জানে, হয়তো পথে ঝড়ঝাপটায় অক্কা পেয়েছে! কিংবা কেউ ধরে খেয়েছে।

আরেকজন বললেন, হতে পারে। গোল্ডেন প্লোভারের মাংস আর ডিম কিন্তু খেতে ভারি সুস্বাদু। ইউরোপের বাজারে বেজায় চাহিদা। চড়াদামে বিক্রি হয়।

রিচার্ডসন বললেন— দেখছেন প্রফেসর ঘোষ, বুড়োর কী দুশ্চিন্তা। বড়ো ভালোবাসে পাখি। এদের জন্যই ও দ্বীপ ছেড়ে নড়তে চায় না।

ডিকি কিন্তু অচিরেই তার শোক ভুলে গেল। অনেকগুলি নতুন ছানা পেয়ে সে আবার মহাখুশি।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। সূর্য মাথার ওপর। আমরা এবার ঘরে ফিরলাম। ডিকি বোধহয় আজ আর নাওয়া-খাওয়ার সময় পাবে না।

চার

আমিও পাখি নিয়ে মজে গেলুম। সময় কাটাবার ভাবনা রইল না।

সুযোগ পেলেই ডিকির সঙ্গে সঙ্গে ফিরি। পক্ষী সমাজের হাবভাব আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করি। ক্রমে পাখিরা মেনে নিল আমাকে। কাছে গেলে আর মারমুখী হয়ে উঠত না। আমার সম্বন্ধে তাদের ভয় ভেঙে গেল। যদিও ডিকির মতো অতটা লাই তারা আমায় কোনোদিনই দেয় না।

শ্রান্ত বিহঙ্গগুলি প্রথমে বিশ্রাম নিল; তারপর লেগে গেল তড়িঘড়ি বাসা বানাতে।

এদের বাসার কোনো ছিরিছাঁদ নেই। মাটিতে ঘাসবনে অল্প গর্ত করে কাঠি-কুটো জড়ো করে ঘর বানায়। সারাদিন তারা নিজেদের মধ্যে বকর বকর করছে; ঝগড়াঝাঁটিও হচ্ছে আর প্রাণপণে খুঁটেখুঁটে বেড়াচ্ছে খাবারের অন্বেষণে।

একদিন দেখি ডিকি উদ্‌বিগ্ন মুখে আকাশের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় দেখে বলল— আবহাওয়ার লক্ষণ ভালো নয়, বোধহয় ঝড় উঠবে। দেখছ না পাখিরা কেমন ভয় করছে। ওরা ঠিক বুঝতে পারে। তাই তো। পাখিরা দেখলাম বেশ সন্ত্রস্ত, ভীত স্বরে ডাকছে।

সত্যি সত্যিই ঝড় উঠল বিকেলে। অবশ্য বাতাসের বেগ বেশি ছিল না, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে গেল।

গোল্ডেন প্লোভারের মাংসের সুখ্যাতি শোনবার পর থেকেই সুনন্দের মনে আর শান্তি নেই। আমাকে কেবলই খোঁচায়— যা-না, রাত্তিরে লুকিয়ে গোটা দুই পাখি ধরে আন। খাসা রোস্ট খাওয়া যাবে।

ওরে বাবা; ডিকি জানতে পারলে মহা কেলেঙ্কারি হবে। আর আস্ত রাখবে না।

—দূর বোকা! অতগুলো পাখির মধ্যে থেকে দুটো সরালে বুঝতেই পারবে না?

—কিছু বলা যায় না। মনে হয় ও সব কটাকে চেনে। যদি ধরে ফেলে? আমি পারব না— ইচ্ছে হলে তুই নিজে যা—

—যদি আমিই ধরতে পারতাম তবে তোকে এত সাধব কেন? বেটারা ভারি বেরসিক। আমি কাছে গেলেই এমন বিরাট হৈ চৈ জুড়ে দেয় যে রাজ্য সুদ্ধ জাগিয়ে তোলে—

মামাবাবুও উৎসাহ দিলেন না। কী দরকার। জানতে পারলে বুড়ো মহা চটে যাবে।

হতাশ হয়ে সুনন্দকে এ যাত্রা প্লোভারের রোস্ট খাবার আশা ত্যাগ করতে হল।

ডিকির কাছে জানতে চেয়েছি— পাখিকে আংটি পরানোর কায়দা তুমি শিখলে কোত্থেকে?

ডিকি বলছে, এক পক্ষিতত্ত্ববিদের কাছ থেকে। বছর চারেক তিনি এই দ্বীপে এসেছিলেন। কিছুদিন ছিলেন। গোল্ডেন প্লোভারদের মাইগ্রেশন ও জীবনযাত্রা নিয়ে রিসার্চ করছিলেন ভদ্রলোক। তিনিই রিং পরানোর কায়দা ও প্রয়োজনীয়তা শিখিয়ে দেন। আমি এখন প্রত্যেক বছর নতুন পাখিদের কয়েকটাকে নম্বরি রিং পরিয়ে চিহ্ন করে দিই। খেয়াল রাখি তারা বছর বছর ফিরে ফিরে আসে কি না? নোট করে রাখি। তারপর সেই বৈজ্ঞানিককে চিঠি লিখে খবর জানাই।

বাঃ, ডিকি যে দেখছি একজন রীতিমতো গবেষক।

মামাবাবু শুনে বললেন, ওহে, ডিকিকে এত ফেলনা ভেবো না। পক্ষীসমাজের রহস্য উদ্‌ঘাটনে এরকম সব নগণ্য লোকদের দান বড়ো কম নয়। অনেক অজানা তথ্য জানা গেছে এদের চেষ্টায়।

একদিন শুনি ডিকি নিজের মনে বিড়বিড় করছে— কই পেটুক এল না যে এখনও! এতদিন দেরি হওয়া তো উচিত নয়!

জানতে চাই— ডিকি, পেটুক কে?

—একটা পাখি। ভারি লোভী। দিনরাত কেবল খাই খাই করে, তাই নাম দিয়েছি পেটুক। এমন ওস্তাদ লাইটহাউসের ওপরের ঘরে আমার কাছে হাজির হবে খাবারের লোভে। ওর জন্যে শামুক, গুগলি, ফড়িং-এর স্টক রাখতে হয় আমায়।— কী জানি, হয়তো জল ঝড়ে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনা—

দেখলুম পেটুকের জন্য সে বেজায় চিন্তিত।

পাঁচ

আমাদের দ্বীপে আগমনের পর প্রায় দু সপ্তাহ অতীত হয়েছে। কদিন আর পাখি দেখতে যাইনি, একটু একঘেয়ে লাগছিল। মামাবাবুদের জাহাজে যাচ্ছিলাম আধুনিক গবেষণাপদ্ধতি দেখতে। দ্বীপের অন্যান্য অংশেও বেড়াচ্ছিলাম।

সেদিন দুপুরে দেখলাম আরও কটা প্লোভার হাজির হল দ্বীপে। চোদ্দো-পনেরোটা পাখির এক ছোটো দল। পাখি দেখার ইচ্ছাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বিকেলে নতুন পাখিগুলি দেখতে গেলাম।

পুরনো পাখিদের আস্তানা আমার বিলক্ষণ চেনা হয়ে গেছে। বাসা-টাসা বানিয়ে তারা এখন গুছিয়ে বসেছে। প্রত্যেকটি বাসা আমি চিনি। দেখলাম পুরনোদের এলাকার কিছুদূরে কয়েকটা পাখি জড়ো হয়েছে। তোড়জোড় চালাচ্ছে ঘর বাঁধবার। এগুলিই নতুন আগন্তুক সন্দেহ নেই।

—একী!!

একটা পাখি দেখলুম, তার দুপায়ে দুটি রিং!

একটি রিং গতানুগতিক হালকা অ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিকের তৈরি কিন্তু অপর রিংটি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—

চকচকে টিনের পাত দিয়ে তৈরি মোটা রিং। গা এবড়োখেবড়ো। অন্য রিংগুলির মতো নিটোল মসৃণ নয়। কেউ যেন খেলাচ্ছলে টিন মুড়ে আংটি বানিয়ে পরিয়ে দিয়েছে। এত রিং পরা পাখি দেখেছি কিন্তু কারো দুপায়ে তো কখনো রিং দেখিনি। তারপর আবার বিচ্ছিরি দেখতে। কোনো বাচ্চা ছেলের কাণ্ড নিশ্চয়ই।

একটু পরে ডিকি এল। সেও এসেছে নতুন অভ্যাগতদের দর্শন করতে। তখন ডেকে বললাম—

—আচ্ছা দুপায়ে রিং পরানো কোনো পাখি আছে নাকি?

—অ্যাঁ, দুপায়ে রিং? কখনো দেখিনি তো! কই—?

পাখিটা দেখেই ডিকি লাফিয়ে উঠেছে— আরে ওই তো পেটুক। অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি বাপ? ভেবে ভেবে হয়রান হচ্ছি। তোকে আবার এই নতুন গয়নাটা পরাল কে?

পকেট থেকে কিছু খাবার বের করে মাটিতে ছড়িয়ে দিতেই পেটুক দৌড়ে এল।

কৌতূহলী হয়ে আমি কাছে গিয়ে দূরবীন লাগিয়ে নতুন রিংটা পরীক্ষা করছিলাম—

—আরে গায়ে যে কী সব লেখা রয়েছে। মনে হচ্ছে ইংরেজি হরফ! সাধারণ ক্রমিক সংখ্যা তো নয়! —ডিকি ধর তো ওকে—

ডিকি পেটুককে ধরে পা থেকে রিংটি খুলে নিল। বলল— তাই তো, কী সব আঁকিবুঁকি লেখা রয়েছে, ভালো পড়তে পারছি না। নাও দেখো তো হে—

রিং পরীক্ষা করেই আমি চমকে উঠি।

টিনের ওপর গভীরভাবে আঁচড় কেটে লেখা— প্লিজ হেল্প। লেটার ইনসাইড।

রিং খুলে ফেলতেই একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। পাতলা কাগজে ইংরেজিতে লেখা। চিঠির শেষে পত্রলেখকের নাম পড়ে বিস্ময়াবিষ্ট হলাম— স্যামুয়েল ওয়েকফিল্ড!

নামটি আমার সুপরিচিত। শুধু আমার কেন, আধুনিক জগতে এই বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিকের নাম কে না জানেন।—

ড. ওয়েকফিল্ড ছিলেন আর্কটিক-মেরু-গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর। মাস দুয়েক পূর্বে প্লেনে চড়ে আলাস্কায় যাচ্ছিলেন। পথে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে প্লেনটি নিখোঁজ হয়ে যায়। প্লেনে তিনিই ছিলেন একমাত্র যাত্রী, আর ছিল পাইলট, কো-পাইলট ইত্যাদি নিয়ে জনা তিনেক। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও প্লেন বা আরোহীদের কোনো হদিশই মেলেনি। ওয়ারলেসে শেষ খবর আসে যে তাদের প্লেন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পড়েছে। সম্ভবত আরোহী সমেত প্লেনটি সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। বিজ্ঞান জগতে ড. ওয়েকফিল্ড-এর মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি। মেরুপ্রদেশের আবহাওয়া ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। মাসের পর মাস সেই চিরতুষার রাজ্যে বাস ক'রে কঠিন অধ্যবসায় ও অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে তিনি গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন—

তারিখ দেখে বোঝা যাচ্ছে পত্রটি লিখতে হয়েছে দুর্ঘটনার পরে।

ড. ওয়েকফিল্ড কি তবে জীবিত ছিলেন! কিন্তু কোথায়?

তাড়াতাড়ি চিঠি পাঠ করলাম।

ড. ওয়েকফিল্ড লিখেছেন—

ঝড়ের কবলে পড়ে আমাদের প্লেন সমুদ্রের বুকে আছড়ে পড়ে। দৈবকৃপায় আমার প্রাণরক্ষা হয়। এক খণ্ড কাঠ আঁকড়ে ভাসতে ভাসতে এক ক্ষুদ্র অজ্ঞাত দ্বীপে এসে পড়ি। দ্বীপটি জনমানবশূন্য। সম্ভবত এই ভূখণ্ড কোনো সমুদ্রগর্ভস্থিত আগ্নেয়গিরির চুড়ো। আমার সাথীরা বোধহয় কেউ আর রক্ষা পাননি।

দেহের নানাস্থানে আঘাত লাগে। কয়েকদিন চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় শুয়ে থাকি।— এখন কোনোক্রমে জীবনধারণ করে রয়েছি। কিন্তু শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। এই দ্বীপে কোনো ফলমূল পাওয়া যায় না। কাঁকড়া, ঝিনুক বা সমুদ্রের খাঁড়ির স্বল্প জলে ছোটো ছোটো মাছই আমার একমাত্র খাদ্য। চকমকি

পাথর ঠুকে আগুন জ্বেলে তাই পুড়িয়ে খাচ্ছি। এদিকে শীতও এসে পড়েছে। এখানকার দারুণ ঠান্ডায় টিকে থাকবার মতো উপযুক্ত পোশাক আমার নেই, নেই মাথা গুঁজবার আশ্রয়।

হঠাৎ কতগুলি গোল্ডেন প্লোভার দেখে বিস্মিত হলাম। সামুদ্রিক পাখি ছাড়া অন্য কোনোরকম পাখি দেখিনি এ দ্বীপে। দ্বীপটা একেবারে নেড়া, প্রস্তরময়। উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি পাখির খাদ্যের একান্ত অভাব। কয়েকটা পাখির পায়ে দেখলাম রিং। নিশ্চয়ই মাইগ্রেটরি বার্ড। কেউ এদের মুভমেন্ট হারিয়ে দৈবাৎ ছিটকে এসে পড়েছে এই দ্বীপে।— মাথায় একটা প্ল্যান খেলে গেল। কে জানে হয়তো ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয় যে আমি এ যাত্রা এরূপ অসহায় ভাবে প্রাণ হারাই। নইলে এই দলছাড়া পাখিগুলি আমার সামনে এসে উপনীত হবে কেন।

অনেক কষ্টে খাবার লোভ দেখিয়ে একটা পাখিকে বন্দী করলাম। তামাকের কৌটো থেকে এক টুকরো টিন কেটে রিং বানিয়ে ভিতরে এই চিঠি ভরে পাখির পায়ে পরিয়ে দিলাম— কোনো পক্ষী-পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এই আশায়। জানি না এই পক্ষীদূত আমার প্রাণ রক্ষা করতে পারবে কি না।

যার হাতেই এই চিঠি যাক-না-কেন, দয়া করে যত শীঘ্র আমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন। আন্দাজ করছি দ্বীপটি আলাস্কার নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশে অ্যালুইশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। যদি আমার জীবন রক্ষা করা সম্ভব নাও হয় আমার রিসার্চ পেপারগুলি উদ্ধার করবেন।

দ্বীপের মধ্যস্থলে পাহাড়ের মধ্যে একটি ছোটো গুহা আছে। তার ভিতর রেখে যাব।

ঝড়ের সম্মুখীন হতেই বিপদের গুরুত্ব বুঝি। সঙ্গে কিছুটা রিসার্চ পেপার ছিল। বাক্স থেকে সেগুলি বের করে অয়েলক্লথে মুড়ে পিঠে হ্যাভারস্যাক পুরে নিই। প্রার্থনা করি আমার বহু সাধনায় ফল এই তথ্যগুলি যেন নষ্ট না হয়ে যায়—

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লাম জাহাজে মামাবাবুর কাছে।

মামাবাবু চিঠি পড়ে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন— সে কী! ড. ওয়েকফিল্ড এখনও বেঁচে, এখনও আশা আছে। এখনও হয়তো তাঁকে আমরা উদ্ধার করতে পারব।—

জাহাজে ওয়্যারলেস ছিল। তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠানো হল—

কটা দিন অধীর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাচ্ছি।... ড. ওয়েকফিল্ড অতি কষ্টসহিষ্ণু

ব্যক্তি। বিরুদ্ধ-প্রকৃতির সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে অভ্যস্ত! এবারের যুদ্ধেও তিনি কি জয়ী হতে পারবেন না?

ডিকি রোজ এসে খবর নেয়। আশ্বাস দেয়— ঘাবড়াও মৎ। আমি বলছি, বৈজ্ঞানিককে আলবাৎ বাঁচানো যাবে। এত কষ্ট করে পেটুক চিঠি বয়ে আনল কি এমনি এমনি—

দিন সাতেক পর।

তখনো ভালো করে দিনের আলো ফোটেনি। পূর্ব দিগন্ত সবেমাত্র রক্তাভ হয়ে উঠেছে, এখুনি উঁকি মারবেন দিনমণি। আমাদের কুটিরের দরজায় জোর করাঘাতের শব্দ হল। দ্বার খুলে দেখি, মি. রিচার্ডসন ও আরও কয়েজন জাহাজের অধিবাসী।

—কী ব্যাপার? এত সক্কালে?

রিচার্ডসন জড়িয়ে ধরলেন মামাবাবুকে— সুসংবাদ প্রোফেসর ঘোষ। খবর এসেছে। মুমূর্ষু অবস্থায় ওয়েকফিল্ডকে উদ্ধার করা হয়েছে। অবশ্য এখন তিনি অনেকটা সুস্থ। আর কিছুদিন দেরি হলে তাঁকে জীবিত রক্ষা করা যেত কিনা সন্দেহ—

রিচার্ডসন বললেন, আপনাদের প্রত্যেককে আমি বিজ্ঞান জগতের তরফ থেকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁরা আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েক দফা করমর্দন করে ফেললেন। মি. রিচার্ডসন জানালেন যে ওয়েক ফিল্ড-উদ্ধার অনারে আজ রাত্রে এক পার্টি দেওয়া হচ্ছে জাহাজে। আমরা তিনজন ভারতীয় হব প্রধান অতিথি। ডিকিকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে।

রিচার্ডসনদের সঙ্গে একটি নতুন মুখ দেখছিলাম। ভদ্রলোক সাগ্রহে আমাদের কথাবার্তা গিলছিলেন। হাতে ছোট্ট এক নোটবই। তাতে কী জানি সব লিখেও যাচ্ছেন। তাঁর কাঁধে ঝোলানো এক দামি ক্যামেরা।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল।— রয়টারের রিপোর্টার। নিউজিল্যান্ড থেকে সোজা এসেছেন। আমাদের একটা ইন্টারভিউ চান।

রিপোর্টার অনুরোধ জানালেন— প্লিজ আপনাদের নিজের মুখ থেকে এই চমকপ্রদ কাহিনির একটা বিবরণী চাই। আর আপনাদের ফোটো—

বিবরণী দেওয়া হল। কিন্তু ছবি তোলবার কথায় মামাবাবু ঘোরতর আপত্তি জানালেন— না না, আমার ছবি নয়। নিতে হলে অসিতের ছবি নিন। ওই তো হিরো—

আমারও আপত্তি আছে। আমি কেন? আসল বাহাদুর তো শ্রীমান পেটুক। নিলে ওর ছবিই নেওয়া উচিত।

সুনন্দ সাত তাড়াতাড়ি বলে উঠল— আহা, দিই-না ফোটো! বেচারা এতদূর থেকে এসেছেন।

বটে, আরও জোরালো বাধা দিলাম— কক্ষনো না। পেটুক ছাড়া কারো নয়—

অতএব সবাই চললেন পেটুকের আস্তানায়।

ডিকি ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছিল। সে সামনে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। পেটুকের কৃতিত্বে সে গর্বে দুলছে।

পেটুক কাছেই চরছিল। অত লোক দেখে প্রথমটা কাছে ঘেঁসতে চায় না। কিন্তু ডিকি পকেট থেকে খাবার বের করতে সে আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। ডানা ঝাপটে উড়ে এল।

খেতে খেতেই পেটুক ঘাড় বেঁকিয়ে ক্যামেরার সামনে পোজ দিল।

বন্ধু

দুটো দিন কাটতে-না-কাটতেই দীপের বেজায় একঘেয়ে লাগতে থাকে।

মা আর মাসির সঙ্গে দীপ দাদু-দিদার কাছে বেড়াতে এসেছে। সঙ্গে এসেছে দীপের দিদি টিংকু আর মাসতুতো দিদি পিংকু। দীপের বয়স বারো। পিংকু-টিংকুর বয়স পনেরো-ষোলো।

দীপের দাদু-দিদা থাকেন মেদিনীপুরে এক গ্রামে। একসময় ওই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন এই চৌধুরীরা। এখন জমিদারি নেই বটে তবে পুরনো দাপট আর ঐশ্বর্যের রেশ বেশ খানিকটা রয়ে গেছে।

বিশাল তিন-মহলা চৌধুরীবাড়ি এখন খাঁ খাঁ করে। মহলগুলি দোতলা। একতলা দোতলায় সার সার ঘরের পর ঘর বন্ধ। সামনে টানা রেলিং দেওয়া বারান্দা। ছোটোখাটো ফুটবল মাঠের মতো গোটা তিনেক ছাদ। সব নিঝুম, বিশেষত দোতলার অংশগুলি। এখন এ বাড়িতে চৌধুরী বংশের স্থায়ী বাসিন্দা বলতে কেবল দীপের দাদু ভবানন্দ চৌধুরী, দিদিমা, আর দাদুর এক ছোটো ভাই। এছাড়া আছে একপাল কাজের লোক। দীপের মা মাসি মামা অনেকবার চেয়েছেন, দীপের দাদু-দিদাকে নিজেদের কাছে শহরে নিয়ে রাখতে। কিন্তু দাদু-দিদা রাজি হননি। শহরে নাকি তাঁদের দমবন্ধ হয়ে আসে। এতকাল খোলা হাওয়ায় বাস।

দীপের মা-মাসি-মামা আর তাদের জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনরা একটু বড়ো হতেই এ গ্রাম ছেড়ে শহরে হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করেছে। বাড়ি অবশ্য আসত তখন ছুটিতে ছুটিতে। এখন আবার অনেক দিন ধরে শহরে বাস করার ফলে পুরোপুরি শহুরে হয়ে গেছে। গ্রামে আসতে তাদের আর ভালো লাগে না। নেহাতই বাবা-মায়ের টানে যেটুকু আসা।

এসব কথা দীপ তার মায়ের কাছে শুনেছে।

দীপ আগে বার তিনেক এ বাড়িতে এসেছে, কিন্তু রাতে থাকেনি। দিনে কয়েক ঘণ্টা মাত্র কাটিয়ে ফিরে গেছে।

এ গ্রামে তো আগে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। লণ্ঠন আর হ্যাজাকই ভরসা ছিল অন্ধকারে। ফাঁকা বিরাট বাড়িটা তখন সন্ধের পর বড্ড ভুতুড়ে ঠেকত। শহরবাসী মা মাসি মামারা তাই এলেও রাত কাটাত না। দিনে দিনে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে ফিরে যেত। ছোটো ছেলেমেয়েদেরও আনত না সবসময়। একদিনে এতখানি আসা-যাওয়ার ধকল তো কম নয়।

বছর খানেক আগে এ গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। চৌধুরীবাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নিয়েছে! ফলে অন্ধকারে ছমছমানি অনেকটা কমেছে। গরমে পাখা ঘোরার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই এবার ছেলেমেয়েদের স্কুলে গরমের ছুটি পড়তে মা মাসি এসেছেন— বাবা-মায়ের কাছে কটা দিন কাটিয়ে যেতে। সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও এনেছেন।

সকালসন্ধে দীপ খানিক সময় ক্লাসের হোমটাস্ক করে। বাকি সকাল আর বিকেল যেন তার কাটতে চায় না। বিশেষত বিকেল বেলাটা।

মা বলেন, ‘দিদিদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেল।’

—‘দূর দূর, ওদের সাথে খেলা মোটে জমে না।’

বাড়ির ভিতরে পাঁচিল ঘেরা বাঁধানো উঠোনে কায়দা করে ব্যাডমিন্টনের নেট টাঙানো হয়েছে। দিদিরা র‍্যাকেট হাতে কেডস মোজা স্কার্ট পরে খেলতে চায় বটে, কিন্তু খেলে কতটুকু? দীপের সঙ্গে দু গেম খেললেই তারা বেদম হয়ে পড়ে। তখন রেস্ট চাই। বসে বসে জিরোয়। অমনি শুরু হয় তাদের নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব। মাঝে মাঝে হি হি হু হু হাসি। উঠে যে ফের খেলবে, তার কোনো চাড়ই নেই। একে তো দুই দিদিই অতি বাজে খেলে, তার ওপর দু-এক গেম খেলেই রেস্ট। সকালে যদি বা কিছুক্ষণ খেলে, বিকেলে দিদিরা খেলেই না প্রায়। কেবল ছাদে বেড়ায় আর আড্ডা দেয়। বেজার হয়ে দীপ আর খেলতে চায় না দিদিদের সঙ্গে। তার চেয়ে একা একা ঘোরা ভালো।

গ্রামের ছেলেরা ফুটবল খেলে মাঠে। মাঠটা গ্রামের সীমানায়। চৌধুরী বাড়ি থেকে দূরে। দীপের ইচ্ছে ছিল যে ওদের সঙ্গে গিয়ে ফুটবল খেলে। সে ক্লাবে আর ক্লাস টিমে চান্স পায় ফুটবলে। কিছু কায়দা দেখাতে পারত গাঁয়ের ছেলেদের। কিন্তু মা বারণ করলে, ‘না না, ওদের সাথে খেলা ঠিক নয়। কী সব আজেবাজে

ছেলেরা খেলে। মাঠটাও দেখেছি আমি। একদম চষা ক্ষেত। খেলতে গিয়ে পা মচকাবে। ওসব এখানকার ছেলেদের পোষায়।'

মাঠটা ভালো নয় ঠিকই। কিন্তু অতগুলো ছেলে যদি সেখানে রোজ রোজ দিব্যি খেলে, দীপ পারবে না কেন? অমন এবড়োখেবড়ো মাঠে দীপ কত টুর্নামেন্ট খেলেছে কলকাতায়।

মায়ের আসল ইচ্ছেটা বোঝে দীপ। ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে খেলা তাঁর পছন্দ নয়। এই গ্রাম একদা চৌধুরীদের প্রজা ছিল। আজও সেটা মুছে যায়নি মা-মাসি-দাদু-দিদাদের মন থেকে। তাই চৌধুরীবংশের লোকেরা আজও পারতপক্ষে মেশেন না এই গ্রামের লোকেদের সঙ্গে। শুকনো ভদ্রতা করেন বড়োজোর, কিন্তু ঘনিষ্ঠ হন না।

ওই মাঠে যারা ফুটবল খেলে তাদের কয়েকজনের বাবা মা চৌধুরীবাড়িতে কাজ করেন। চাষবাসের কাজ। ধোপা নাপিত মিস্ত্রির কাজ। তাদের ছেলেদের সঙ্গে দীপকে খেলতে দিতে মায়ের আপত্তি।

মায়ের এই মনের ভাবটা দীপের ভালো লাগেনি। কলকাতায় তাদের ক্লাস টিমে, তাদের ক্লাব টিমে যারা খেলে, তাদের বাবা মা-রা কী কাজ করে, কেউ কি তাই নিয়ে মাথা ঘামায়? যে বাড়ির ছেলেই হোক, ভালো খেললেই তার খাতির। তা এখানে তাই নিয়ে মা-মাসির এত মাথাব্যথা কেন?

বাধ্য হয়ে দীপ একদিন গ্রামে বেড়াতে বেরুলো। একা একাই। দাদু রঘুদা বলে একজনকে সঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীপ রাজি হয়নি। ধুততেরি, আধবুড়ো রঘুদাকে নিয়ে কি বেড়িয়ে সুখ? খুটখুট করে চলে। গম্ভীর মুখ। আর দীপ কি ছেলেমানুষ যে এই ছোট্ট গ্রামে পথ হারাবে? না তাকে কেউ ধরে নিয়ে যাবে? কলকাতায় যে কত ভিড়ের বাসে চাপে। একাই চলে যায় কত দূর দূর।

একদিনেই কিন্তু দীপের গ্রামে ঘোরার শখ মিটে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গোটা গ্রাম দেখা শেষ। গাছে চড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে গাছে চড়ায় তেমন পোক্ত নয়। মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ গ্রামের ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখল। পা নিসপিস করছিল, দূর দূর, এরা ঠিকমতো শটই মারতে পারে না। এলোপাথাড়ি পিটছে বল। ওদের কয়েকটা পাসিংয়ের কায়দা আর কিকিং দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়া যেত। মনমরা হয়ে দীপ বাড়ি ফেরে।

নাঃ, একা একা গ্রামে ঘোরায় সুখ নেই। দীপ পরদিন থেকে চৌধুরীবাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরতে লাগল।

এটা বেশ রোমাঞ্চকর ঠেকল তার কাছে।

পাক খাওয়া সরু সরু সিঁড়ি দিয়ে কখনো ওঠে। কখনো নামে। নির্জন বারান্দা দিয়ে হাঁটে। এক উঠোন পেরিয়ে আর-এক উঠোনে যায়। কোনো অচেনা দরজা খোলা পেলেই সেখান দিয়ে এক নতুন জগতে যেন হাজির হয়। দোতলা তো বেবাক ফাঁকা। একতলায় কেউ কেউ সামনে পড়ে। তারা হেসে বলে— 'কীগো খোকাবাবু, বাড়ি দেখছ বুঝি?'

তবে সব রহস্য আবিষ্কারে ভরসা হয় না। এমন সব অন্ধকার সিঁড়ি রয়েছে যে তাতে উঠতে নামতে ভয় হয়। যদি পথ হারায়! অনেক ঘুপচি আধো অন্ধকার উঠোনে উঁকি মেরে পেছিয়ে আসা।

দ্বিতীয় দিন বিকেলে এমনি ঘুরতে ঘুরতে দীপ কানুর দেখা পেল।

একতলার ভেজানো একটা দরজা ফাঁক করে বাইরে তাকিয়ে দীপ দেখল যে ঠিক সামনে চারদিক ঘেরা ছোট্ট এক টুকরো জমি। তার ভিতর দীপেরই বয়সি একটি ছেলে এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কী জানি খেলছে। আর ছেলেটার কাছে থাবা গেড়ে বসে ইয়া তাগড়াই একটা মেটে রঙের দেশি কুকুর।

অচেনা ছেলেটি প্রথমে দীপকে দেখতে পায়নি। কিন্তু কুকুরটা টের পেল। সে দীপের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে গরগর করে উঠল। অমনি ছেলেটিও খেলা থামিয়ে তাকায় দীপের দিকে। দীপ বেরিয়ে এল দরজার বাইরে। ছেলেটি মৃদু স্বরে কী জানি বলতে কুকুরটা গরগরানি থামাল বটে, কিন্তু সন্দিগ্ধ চোখে নজর রাখল দীপের ওপর।

এ জায়গাটা বাড়ির একটা সীমানা। সামনে আর দুপাশে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হাত তিরিশেক লম্বা আর প্রায় পনেরো হাত চওড়া একটা জায়গা। দাদুর বাড়ির গা দিয়ে সরু এক চিলতে টানা রোয়াক চলে গেছে। সামনে পাঁচিলের মাথা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে একটা দোতলা বাড়ি। দীপ চিনল যে ওটা তার দাদুর ছোটো ভাইয়ের মহল। ছোটোদাদু বাতের জন্য দোতলায় ওঠেন না। তাই ও-বাড়িতে দোতলাটা বন্ধই থাকে। টানা রোয়াকটুকু ছাড় দিয়ে দুপাশের পাঁচিল জায়গাটাকে আড়াল করে রেখেছে। জায়গাটার এক কোণে একটা কুয়ো। কুয়োর মুখ দুটো বড়ো বড়ো তক্তা দিয়ে চাপা। বোধহয় এই কুয়োতে লোকে চান-টান করে বা করত কখনো। তাই জায়গাটা এভাবে আড়াল করা হয়েছে। ঘেরা জায়গাটার জমি বেশ সমান। তাতে ঘাস নেই, আগাছা নেই।

এক নজরে চারিপাশটা দেখে নেয় দীপ।

ছেলেটির রং কালো। মুখখানা মিষ্টি। ভাসা ভাসা বড়ো বড়ো চোখ। এক-মাথা রুক্ষ চুল। পাতলা গড়ন। পরনে ময়লা হাতকাটা গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট। খালি পা। সে দীপের দিকে চেয়ে লাজুক হাসল। দীপের ভারি ভালো লাগল ওর হাসিটি। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী খেলছিলে?'

—'এক্কাদোক্কা।' একটু থতমত খেয়ে মৃদু কোমল গলায় জবাব দেয় ছেলেটি।

—'ধুস। ও তো মেয়েদের খেলা। ক্রিকেট জানিস?' বলল দীপ।

—'না।' ছেলেটা মাথা নাড়ে।

—'ফুটবল?'

—'হুঁ।'

—'ফুটবল আছে?'

—'না।'

দীপ ভাবল, এখন ফুটবল জোগাড় করি কোত্থেকে? তাছাড়া এইটুকু জায়গায় ফুটবল কি জমবে? আর মাত্র দুজনে?

ছেলেটা টপ করে বুঝে ফেলে দীপ খেলতে চাইছে। সে বলে ওঠে, 'গুলি খেলবে?'

—'গুলি? আগে তো খেলতাম। ঠিক আছে তাই খেলব। কই গুলি?'

—'আনছি' বলে ছেলেটা খোলা দরজা দিয়ে সুড়ুৎ করে দাদুদের মহলের ভিতরে ঢুকে যায়। কুকুরটাও লাফ দিয়ে ছেলেটার পিছু নেয়।

দাদুর বাড়ির এইদিকে নিচুতলায় একসার ছোটো ছোটো ঘর। তাদের দরজা ভিতরের উঠোনের দিকে, জানলাগুলো এপাশে বাইরের দিকে। বোঝা মুশকিল ঘরগুলোয় লোক থাকে কিনা।

দীপরা আগে যে পাড়ায় ভাড়া থাকত সেখানে ছেলেরা ফুটপাতে আর একটা ছোটো মাঠে গুলি লাট্টু খেলত। ফুটবল ক্রিকেটও চলত। বছর দুই হল দীপরা অন্য পাড়ায় নিজেদের কেনা ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে। এখানে গুলি লাট্টু খেলার চল নেই। দীপ এখন কাছেই একটা ক্লাবে ভর্তি হয়েছে। সেখানে শুধু ফুটবল ক্রিকেট খেলা হয়। গুলির টিপ তার এখন কেমন আছে কে জানে?

একটু বাদেই পোষা কুকুর সমেত ফিরে আসে ছেলেটা। তার হাতে চারটে কাচের গুলি। গুলিগুলোর অবস্থা শোচনীয়। বেশ পুরনো। খেলে খেলে গা চটে গেছে। এর চাইতে ভালো গুলি বোধহয় নেই ছেলেটার। যাহোক এতেই খেলা যাক।

দীপ জিজ্ঞেস করে, 'তোর নাম কী রে?'

ছেলেটি বলল— 'কানু।'

—'আমার নাম দীপ। ভালো নাম দীপংকর।'

—'তুমি বুঝি বেড়াতে এসেছ?' জিজ্ঞাসা করে কানু।

—'হ্যাঁ, কলকাতা থেকে। এটা আমার দাদুর বাড়ি। মায়ের সঙ্গে এসেছি। কয়েকদিন থাকব। মাসি আর দিদিরাও এসেছে। বুঝলি, না খেলে সময় কাটছে না। বড্ড বোর লাগছে। তুই আমার সাথে খেলবি তো?'

—'হুঁ।' কানু খুশি হয়ে ঘাড় দোলায়।

দীপ সমবয়সি কানুকে দিব্যি তুইতোকারি চালালেও সে লক্ষ্য করে যে কানু 'তুমি'র নীচে নামে না। ও বোধহয় এ বাড়ির কোনো কর্মচারীর ছেলে। বাবুদের ছেলেকে তুই বলতে তাই সংকোচ।

যাহোক খেলা শুরু হয়ে যায়।

বাপরে, কানুর হাতের টিপ দেখে দীপ থ। একে তো তার অভ্যাস নেই অনেক দিন, তার ওপর ভাঙা গুলিগুলো আঁটে বসে না ঠিকমতো। সে স্রেফ গো-হারা হারে। তবে সহজে হার মানবার পাত্র সে নয়। খানিকক্ষণ খেলার পর দীপ কানুকে বলে, 'এখানে গুলি কিনতে পাওয়া যায়?'

কানু বলল, 'হ্যাঁ যায়। এগরা বাজারে।'

দীপ বলে, 'এখন চলি। কাল ফেরত খেলতে আসব। এখানে খেলবি তো?'

—'হ্যাঁ।' সায় দেয় কানু।

—'কখন খেলবি?'

—'মা কাজে চলে গেলে। বিকেলে চারটের পর।'

—'তোর মা কী করে?' জিজ্ঞেস করে দীপ।

কানু মুখ নামিয়ে সংকোচের সাথে বলে, 'এই ঘরের কাজ। ঘর পোঁছা। বাসন মাজা এইসব।'

—'তোর বাবা কী করে?'

—'বাবা নেই।' বিষণ্ণ ভাবে জানায় কানু।

—'তোর ভাইবোন আছে?'

—'আছে। ছোটো বোন।'

—'তুই কোথায় থাকিস?'

—'ওইখানে।' দাদুর বাড়ির এই পাশে নীচুতলার ছোটো ছোটো যে ঘরের সারি সেইদিকে আঙুল দেখায় কানু।

দীপু ভাবল, 'যাকগে, ওর মা কী করে তাতে আমার বয়ে গেছে। ছেলেটা কিন্তু ভারি ভদ্র। শহুরে অনেক চালিয়াত ছেলের চেয়ে ঢের ভালো। তবে মা-মাসিরা না জানতে পারে। তাহলে ঠিক বারণ করবে ওর সঙ্গে খেলতে। বরং এখানে লুকিয়ে খেলব।'

পরদিন সকালে দীপ দাদুর বাড়ির একজন কাজের লোককে পাঠাল মাইল পাঁচেক দূরে বাজারে গুলি কিনতে।

বিকেলে সেই পাঁচিল ঘেরা গোপন জায়গাটিতে দীপের চারটে ঝকঝকে লাল নীল নতুন কাচের গুলি দেখে কানুর চোখ চকচক করতে থাকে। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গুলিগুলো। বিড়বিড় করে, 'ইস কী সুন্দর!'

দীপ নতুন দুটো গুলি কানুকে দিয়ে, নিজে অন্য দুটো নিল। তারপর খেলা শুরু হল।

কিন্তু নতুন গুলিতেও দীপ কানুর সঙ্গে মোটেই এঁটে উঠতে পারল না। উঃ, ছেলেটার মারাত্মক টিপ।

শেষে হতাশ হয়ে দীপ খেলা থামিয়ে বলে ফেলল, 'নাঃ গুলিতে জুত হচ্ছে না। অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই কিনা। আর তোর যা টিপ। জমছে না খেলা।'

একটু লজ্জিত ভাবে কানু বলল, 'আমি কেবল এক্কাদোক্কা আর গুলি খেলি। তাই খেলে খেলে টিপ বেড়ে গেছে। কদিন খেললে তোমারও হয়ে যাবে।'

দীপ ভাবে, নাঃ সে গুড়ে বালি। অমন টিপ বানানো এটা কটা দিনেই অসম্ভব। গুলি চলবে না, অন্য খেলা ভাবতে হবে।

পরদিন বিকেলে দীপ তাদের খেলার জায়গায় একটা টেনিস বল নিয়ে হাজির হল। এখানে খেলার মতলবে একটা ক্রিকেট ব্যাট আর একটা টেনিস বল সঙ্গে এনেছিল। আসল ফুটবলে না হোক, টেনিস বলেই ফুটবল খেলা যাক।

কিন্তু মাত্র দুজনে কি ফুটবল জমে?

দীপ ভেবে বের করল— পেনাল্টি কম্পিটিশন হোক।

পাশে একদিকে দেয়ালের নীচে ইটের টুকরো রেখে দুই গোলপোস্টের মার্কা হল। উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে বল বসিয়ে শট মারা হবে। প্রত্যেকে এক-একবার পর পর পাঁচটা শট মারবে। তারপর অন্যজন পাঁচটা। দেখা যাক কে কেমন পেনাল্টি বাঁচায়।

এবার যে কানু পারবে না দীপ নিশ্চিত। ক্লাবে ফুটবল ক্রিকেট ব্যাডমিন্টনে দীপের কত নাম। এখানে এক পাড়াগেঁয়ে ছেলের কাছে গুলিতে বারবার হেরে দীপের বেশ মনে লেগেছে।

পেনাল্টি কম্পিটিশনের ব্যাপারটা কানুকে বুঝিয়ে দিল দীপ।

কানুকে গোলে দাঁড় করিয়ে শট মারার জন্য বল হাতে যাচ্ছে দীপ, এমন সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল। কেউ দাদুর বাড়ির গা ঘেঁষে রোয়াক দিয়ে এদিকে আসছে।

কে আসে? একবার কান পেতে তারপর পেছনে তাকিয়ে দীপ দেখে কানু নেই। শুধু তার কুকুরটা রয়েছে।

যে মাঝবয়সি লোকটি ঘেরা জায়গাটার মধ্যে হাজির হয় তাকে আগে দেখেছে দীপ। সে দাদুর যে চাষের জমি আছে তাতে কাজ করে। নাম—গোবিন্দ।

গোবিন্দ এই নিরালায় দীপককে দেখে অবাক হয়ে থমকে গিয়ে বলল, 'খোকাবাবু এখানে কী কোচ্চো?'

—'বল খেলছি।' গম্ভীরভাবে হাতের বলটা দেখিয়ে দীপ বলে, 'জায়গাটা বেশ ঘেরা। বল বাইরে যায় না।'

—'তা বটে। আরে বাঘাও দেখছি জুটেছে।' কানুর কুকুরটাকে দেখায় গোবিন্দ। তারপর বলে, 'কুয়োয় ঝুঁকো না যেন।'

—'না না।' দীপ ভরসা দেয়।

আর কথা না বাড়িয়ে গোবিন্দ হনহন করে সরু রোয়াকটা দিয়ে হেঁটে অপর প্রান্তের পাঁচিলের ধার দিয়ে অদৃশ্য হচ্ছিল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দীপ। কিন্তু কানু কোথায় গেল? ভাবতে ভাবতেই দেখে যে কুয়োপাড়ের আড়াল থেকে কানুর মাথা জাগছে। একগাল হেসে উঠে দাঁড়ায় কানু।

যাক, ছেলেটার বুদ্ধি আছে। ঠিক সময়ে লুকিয়েছে। এখানে বাসনমাজা ঝিয়ের ছেলের সঙ্গে দীপ খেলছে খবরটা যদি গোবিন্দ মারফত মা-মাসির কানে যায় তাহলে কানুর সঙ্গে দীপের খেলার বারোটা বেজে যাবে। অমনি নিষেধ আসবে। হয়তো বা কানুকেও বকুনি খেতে হবে। ব্যাপারটা আঁচ করে ছেলেটা গা ঢাকা দিয়ে খুব ভালো কাজ করেছে। এধার দিয়ে লোক চলাচল করে কদাচিৎ। তবু সাবধান থাকতে হবে।

পেনাল্টি প্রতিযোগিতায় সত্যি কানু দীপের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। বেচারি জানে না কেমন করে ঠিকমতো বল কিক করতে হয়। কেমন করেই বা গোল আটকাতে হয়, প্রথমদিকে সে গোলকিপার হয়ে দীপের একটাও শট রুখতে পারছিল না। আর তাঁর বেশির ভাগ শটই দীপ গোলকিপার হয়ে অনায়াসে আটকে দিচ্ছিল। কানুর অনেক শট আবার স্রেফ গোলপোস্টের বাইরে চলে যাচ্ছিল।

বারবার হেরে কানুর কিন্তু বিকার নেই। সে মহা উৎসাহে নতুন খেলায় মাতে। বরং গুলিতে হেরে মনমরা দীপ এখন বল খেলায় জিতে খুশিতে চনমনে দেখে কানুও ভারি খুশি।

এ খেলাটায় সবচাইতে খুশি হয় বাঘা।

বলটা দেয়ালে লেগে ছিটকে গেলেই সে দৌড়ে গিয়ে সেটা মুখে ধরে। খুব চালাক কুকুর। বারকয়েক বোঝাবার পরই সে আর বলটা মুখে নিয়ে চক্কর খায় না। বরং বল আলতো করে দাঁতে চেপে এনে যে শট মেরেছে তার পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে চকচকে চোখে ঘনঘন ল্যাজ নাড়ে।

বাঘার ফিল্ডিংয়ে দীপদের খাটুনি কমে যায়।

ঘণ্টাখানেক খেলার পর দীপকে দেখে দেখে কানু বল কিক করা আর গোলকিপিংয়ের কায়দা অনেকটা রপ্ত করে ফেলে। শেষের দিকে সে দীপের কাছে হারছিল বটে, তবে আগের মতন গোহারা নয়। ভালোই হল, তাতে খেলাটা জমছিল। নইলে একতরফা হয়ে যায়। তেমন খেলে সুখ নেই।

পরদিন কিন্তু খেলতে এসে দীপ খানিকক্ষণের মধ্যেই রীতিমতো হকচকিয়ে গেল। পেনাল্টি কম্পিটিশনে কানু সেদিন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চালিয়ে দেয় দীপের সঙ্গে। কখনো কানু জেতে, কখনো বা দীপ। দীপ বোঝে যে ছেলেটা জাত খেলোয়াড়, খেলা দারুণ জমে।

বাঘার ফুর্তি দেখে কে! সে পাঁই পাঁই করে দৌড়য় বলের পেছনে পেছনে।

একবার গোল করার আনন্দে দীপ চেঁচিয়ে উঠতেই কানু ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করে— চুপ!

ঠিক তো। খেয়াল হয় দীপের। তার উত্তেজিত গলা পেয়ে কেউ যদি হাজির হয় এখানে? ফলে খেলার উত্তেজনা গলায় প্রকাশ করা চলে না।

ক্রমে হাঁপিয়ে পড়ে দুজনে। খেলা থামায়। দীপ অল্পের জন্যে জিতে যায়। কুয়োপাড়ে বসে জিরোতে জিরোতে দীপ বলে কানুকে, 'তুই বড়ো মাঠে ফুটবল খেলতে যাস না কেন? প্র্যাকটিস করলে তুই দারুণ খেলবি।'

কানু চুপ করে থাকে।

—'কেন যাস না?' ফের জিজ্ঞেস করে দীপ।

—'ওরা নেয় না।' করুণ স্বরে জানায় কানু।

—'কেন?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্তত করে কানু বলল, 'ওখানে খেললে চাঁদা চায়।'

দীপ বোঝে। গরিব কানুর চাঁদা দেবার ক্ষমতা নেই। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলে, যাবার সময় কানুকে কয়েকটা টাকা দিয়ে যাবে, তার নিজের জমানো টাকা থেকে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতে সে প্রশ্ন করে কানুকে, 'হ্যারে, তুই ইস্কুলে যাস?'

—'না।' মাথা নাড়ে কানু।

—'কেন?'

কানু কাঁচুমাচু ভাবে শুধু বলে, 'আগে যেতাম।'

—'তা এখন যাস না কেন?'

কানু নতমুখে চুপ করে থাকে। জবাব দেয় না।

দীপ ভাবে, এর কারণও হয়তো পয়সার অভাব। বইখাতা কিনতে পারে না, তাই ও পড়া ছেড়েছে। কিংবা স্কুলের সময় অন্য কোনো কাজ ক'রে টাকা রোজগারের জন্যে। কৌতূহল হলেও এ নিয়ে সে আর কানুকে খোঁচায় না। বলে, 'কানু, তোকে আমি ক্রিকেট শিখিয়ে দেব। ব্যাট এনেছি, দেখবি কেমন ইন্টারেস্টিং খেলা।'

শুনে খুশিতে কানুর মুখ চকচকে করে ওঠে।

ঘরে ফিরে যেতে যেতে দীপ ভাবল, শুধু বিকেলে কেন? সকালেও তো খেলা যায়। দশটার পর। বলে দেখব কানুকে। ও কি সকালে কোনো কাজ-টাজ করে? কানুর মতো চমৎকার খেলার সাথী জুটে যাওয়ায় এখন আর দীপের মন দাদুর বাড়ি থেকে পালাই পালাই করছে না।

কিন্তু কানুকে ক্রিকেট শেখাবার সুযোগ আর মেলে না।

কারণ সেই রাতেই দীপ জ্বরে পড়ল।

দীপের মা রাগ করেন, 'দুপুরে অতক্ষণ ঝাঁপাই জুড়লি, পুকুরে, ঠা ঠা রোদে। বারণ করলাম, শুনলি না। এখন বোঝ ঠ্যালা। ওইজন্যেই জ্বর এসেছে।'

যাহোক, পরদিন ডাক্তার আসেন। ওষুধ পড়ে। সুখের বিষয় জ্বর তেমন

বাড়ে না। দুদিনেই ছেড়ে যায়। তবু আরও একটা দিন দীপ দোতলায় তার শোবার ঘর থেকে বেরুতে পায় না।

জ্বর হবার পরদিন সকালে দীপ দেখে বারান্দার দিকে জানলার কোণে কানুর মুখ। উদ্‌বিগ্ন চোখে সে দেখছে দীপকে। কেন খেলতে আসেনি? তাই বুঝি খোঁজ নিতে এসেছে লুকিয়ে।

ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। বিছানায় বসেই দীপ কানুকে বলল, 'একটু জ্বর হয়েছিল ভাই। ভয় নেই, কমে গেছে।'

কানু একটু হেসে সরে যায়।

জ্বর হবার চারদিন বাদে দীপ নীচে নামে দুপুরে খেতে। মায়ের ইচ্ছে ছিল ঘরেই খাবার দেওয়া হোক। দীপ জেদ ধরল যে নীচে যাবে। একখানা ঘরে বন্দী হয়ে তিনদিন কাটিয়ে তার অসহ্য লাগছে।

একতলার মস্ত খাবারঘর। কলকাতার বাড়ির মতো টেবিল চেয়ারে খাওয়ার ব্যবস্থা নয়। তকতকে মেঝেতে আসন পেতে বসে পাশাপাশি খায় সবাই।

দীপ পৌঁছে গেছে খাবার ঘরে। দিদিরা আর মা-মাসিমা আসছেন খেতে। ঘরের এককোণে ম্যানেজার মশাই বসেছিলেন তক্তপোশে। খাবার তদারকি করতে। দীপও ওই তক্তপোশে বসেছিল। একটি মাঝবয়সি বিধবা মেঝে মুছে আসন দিল।

একে দীপ আগেও দেখেছে কাজকম্ম করতে। তবে নামটা খেয়াল করেনি। আজ ম্যানেজারবাবু তাকে ডেকে বললেন, 'কানুর মা, ঠাকুরকে বলে দিয়ো খোকাবাবুকে কোনো ঝালমশলার রান্না না দিতে। দিদিমণি বলে দিয়েছেন।'

দীপের হঠাৎ খেয়াল হল নামটা।

সে ম্যানেজার মশাইকে জিজ্ঞেস করল, 'কাকাবাবু, ওর ছেলে বুঝি কানু?'

—'হ্যাঁ।' ম্যানেজার মশাই জবাব দেন।

দীপ ফট করে বলে বসল, 'আচ্ছা কানু কী করে?'

ম্যানেজার অবাক হয়ে বললেন, 'কী করে মানে?'

—'মানে কাজ-টাজ করে কিছু?'

ম্যানেজার হাঁ করে খানিক দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কী বলছ? কানু কাজ করবে কী? কানু যে মারা গেছে বছর দুই হল।'

শুনে দীপ হতভম্ব।

ইতিমধ্যে কানুর মা কী যেন কাজে ঘরে ঢুকেছিল।

ম্যানেজার মশায়ের কথাগুলো কানে যেতেই সে চোখে আঁচল দিল।

—'সত্যি?' কোনোমতে উচ্চারণ করে দীপ।

ম্যানেজার মশাই বেশ জোর দিয়ে বললেন, 'সত্যি নয়তো কী?'

কানুর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

মানেজার একটু ধমকে বললেন, 'কানুর মা, তুমি এখন যাও। সবাই খেতে আসছেন। আর কেঁদে কী করবে বলো? সবই নিয়তি।'

কানুর মা বেরিয়ে যায়।

খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থেকে দীপ জিজ্ঞেস করে ম্যানেজার মশাইকে, 'আচ্ছা কানুর একটা কুকুর ছিল? বাঘা?'

ম্যানেজার বললেন, 'হ্যাঁ, আছে তো বাঘা। ভারি ন্যাওটা ছিল কানুর। কানু মারা যেতে কেমন জানি হয়ে গেছে। দুবেলা শুধু খেতে আসে এখানে। আর কোথায় কোথায় যে ঘোরে? দেখতেই পাই না।'

দিদি মা-মাসিরা এসে পড়লেন।

কোনোরকমে দীপ দুটি মুখে দিয়ে উঠে পড়ে আনমনা ভাবে। মা-মাসিদের কথায় সে বুঝেছে যে তারা আসছে কালই কলকাতায় ফিরছে। পাছে দীপ ফের জ্বরে পড়ে সেই ভয়ে এখানে থাকতে আর ভরসা পাচ্ছে না তার মা।

মা দীপকে বারণ করলেন, 'বিকেলে আজ বাড়ির বাইরে যাবিনে। ছাদে থাকবি। সন্ধের আগে ঠিক ঘরে ঢুকবি। এ কদিন বড্ড বেশি টো টো করেছিস।'

দুপুরে মা আর মাসি দিদার ঘরে গল্প করতে গেছে। দিদিরা অন্য ঘরে ঘুম দিচ্ছে। এই সুযোগে দীপ পা টিপে টিপে বেরুলো বন্ধু কানুর দেখা পাবার আশায়। বিকেলে তো আজ নীচে যাবার উপায় নেই।

নিঝুম বাড়ি। শুধু পায়রার বকবকম আর পাখার ঝটপটানি কানে আসে।

নীচতলার সেই পাঁচিল ঘেরা জায়গাটাতে যাবার দরজার কাছে পৌঁছে দীপ দেখল যে ওখানে একটা ঘরের দরজা খোলা। ওই ঘরের ভিতর থেকে কানুর মায়ের গলা পাওয়া গেল। আর একটা কচি মেয়ের গলা। ও হয়তো কানুর বোন।

দরজা খুলে ঘেরা চত্বরে উঁকি দিয়ে দীপ দেখল যে কানু সেখানে নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়েও সে কানুর দেখা পেল না।

কানু বোধহয় এখানে আসে না যতক্ষণ না কানুর মা কাজে যায়। যতক্ষণ না জায়গাটা একেবারে নিরালা হয়ে যায়। সেই বিকেলে আসবে।

দীপ তাহলে খেলার জায়গাটিতে এগিয়ে যায় নিঃশব্দে। পকেট থেকে বের করে চারটে নতুন কেনা কাচের গুলি। সেগুলো রাখে মাটিতে, গুলি খেলার গাব্বুর ভিতর। তারপর একই জায়গায় গুলিগুলোর ওপরে রাখে টেনিস বলটা।

কানু বিকেলে এসে ঠিক পাবে বলটা আর গুলিগুলো। তখন ওর খুশিভরা অবাক মুখখানা সে মনে মনে কল্পনা করে। এগুলো সে যাবার আগে কানুকে দান করে যাবে ঠিকই করেছিল। তবে উপহারগুলো হাতে হাতে দিতে পারলে ভারি ভালো লাগত। বলটা শুধু কানুর খেলার জন্যে নয়। কানু-বাঘা দুজনেরই। ইস বাঘার দেখাও যদি একবার মিলত। ও এখন কানুর সঙ্গে কোথায় ঘুরছে কে জানে?

পরদিন সকালে দীপ, মা-মাসি-দিদিদের সঙ্গে মোটরে উঠেছিল। এখান থেকে যাবে স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই মা-মাসি-দিদিরা গাড়ি থেকে হাত নাড়তে লাগল দাদু-দিদা আর যারা বিদায় জানাতে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের উদ্দেশে।

দীপও হাত নাড়ছে। কিন্তু সে বিদায় জানাচ্ছে শুধু একজনকে লক্ষ্য করে—কানু।

দূরে সবার পেছনে সদর বাড়ির বারান্দায় মোটা একটা থামের আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া কানুর ম্লান মুখখানি সে দেখতে পেয়েছে ঠিক গাড়ি ছাড়ার আগে।

অন্যদের লুকিয়ে কানুও একবার হাত নেড়ে বিদায় জানাল দীপকে।

লছা

কেষ্ট বলল, 'লছার গল্প শুনবি? দারুণ ইন্টারেস্টিং।'— 'লছা! সে আবার কে?' খোকন ও নন্তু সমস্বরে জানতে চায়। কেষ্ট বলল, 'লছা ছিল আমার দাদুর পেয়ারের কাজের লোক। দাদুর ফাইফরমাশ খাটত। দিব্যি চেহারা, চোখমুখ ভালো, ফর্সা রং, দেখলে বাড়ির ছেলে বলেই মনে হত। ওই বাড়িতেই মানুষ। চালাক চতুর চটপটে; তবে একটি দোষ ছিল। হাতটান।

দাদু ছিলেন বড়ো জমিদার। প্রকাণ্ড বাড়ি। জমিদারি নেই, তবু বাড়িটা এখনও আছে। লোকে বলে গড়বাড়ি। বাড়ির চারধারে নাকি গড়খাই ছিল এক সময়।

বাড়ির কত জিনিস যে সরিয়েছিল লছা। সোনাদানা। টাকাকড়ি। ভালো মিষ্টির ওপরও তার লোভ ছিল। ধরাও পড়ত। মারও খেত। আবার দাদুর রাগ পড়লে সে নিজের কাজে বহাল হত।

দাদুর বয়স হয়েছে। রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙলে, কখনো কখনো তামাক খাবার শখ হয়। হাঁক দিয়ে বলেন, 'হরির মা, তামাক।'

ঘরের ঠিক বাইরে দাওয়ায় শুত হরির মা নামে এক দাসী। সে কানে খাটো। ডাক সহজে শোনে না। লছা শুত কাছেই। কখনো কখনো লছা টুক করে উঠে পড়ত। গায়ে একটা শাড়ি জড়িয়ে, দাদুর ঘরে ঢুকে, কোণ থেকে হুঁকো কল্কে নিয়ে, টিকে ধরিয়ে, তামাক সেজে দাদুর হাতে দিত। দাদু খাটে বসেই তামাক খেতেন। ঘরে পিদিমের আবছা আলো। দাদু চোখে কম দেখেন। হরির মা আবার বাবুর সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না। বড়ো জোর নিচু গলায়— 'আজ্ঞে।' দাদু ধরতে পারতেন না এই হরির মা-টি আসল না নকল।

যতক্ষণ না দাদুর তামাক খাওয়া শেষ হয় লছা ঘরের ভিতর ঘুরঘুর করত,

এটা সেটা করে, বিছানা বালিশ একটু ঠিক করে দেয়। আর এক ফাঁকে দাদুর বালিশের পাশ থেকে তবিল সরাত। 'তবিল কী জানিস?'

খোকন বলল, 'জানি। কাপড়ের থলি। আগেকার লোকে টাকাকড়ি রাখত।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছিস,' বলল কেষ্ট। 'দিনের আদায় করা খাজনা থাকত দাদুর তহবিলে। একটা আলগা কাগজে লেখা থাকত কে কত দিয়েছে। পরদিন পাকা খাতায় হিসেব লিখে টাকা সিন্দুকে তোলা হবে। লছা সেই তবিল থেকে কিছু মেরে দিয়ে ফের যথাস্থানে তবিল রেখে দিত।

মহা চালাক ছিল লছা, দু-চার টাকার বেশি সরাত না। পরদিন দাদু মোট আদায় যোগ করে যখন দেখতেন কিছু কম, ভাবতেন, গতদিন নিজেই ভুল করেছি গুনতে।

তবে লছা ধরে পড়ে গেল। এক রাতে হরির মা হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখে শাড়ি পরা কে একটা বাবুর ঘর থেকে বেরুচ্ছে।

—'কে?'

হরির মায়ের চিৎকার শুনে লছা মারল দৌড়। আর সঙ্গে সঙ্গে পায়ে কাপড় জড়িয়ে আছাড়। অন্য ঘর থেকে লোকজন ছুটে এল। ব্যাস, লছা 'কট'। দাদু আচ্ছা করে হুঁকো দিয়ে পিটলেন লছাকে। অবশ্য তাতেও তার শিক্ষা হয়নি।

একবার চুরি ধরা পড়ে লছা বেদম প্রহার খেল দাদুর কাছে। তারপর সে বাড়ি থেকে পালাল। এমনি সে আগেও বারকয়েক পালিয়েছে, তবে দু-চার দিনের জন্য। সেবার গোটা বছর কেটে গেল, লছার আর পাত্তা নেই। দাদু ভেবে মরেন, ছেলেটা গেল কোথা? অপঘাতে মরল নাকি?

ফের একদিন লছা হাজির। চেহারা আরও ফিরেছে। কোথায় ছিল? কী করেছে? জিজ্ঞেস করলে বলে, 'ঘুরে বেড়িয়েছি। দেশ দেখেছি। সে কত দেশ। সব কি মনে আছে!' যা হোক, দাদু শান্তি পেলেন। লছার কাজকর্ম ও চুরি যথারীতি চলল। দাদুর শাসনও।

কয়েক মাস বাদে দাদুর সম্পর্কে এক জামাই এল। ওদিকে এসেছিল কাজে, দেখা করে গেল। গড়বাড়িতে সেই তার প্রথম আসা।

সাধারণত বাড়িতে নতুন কুটুম কেউ এলেই লছা তার সঙ্গে জমিয়ে নিত। ফাইফরমাশ খেটে তাকে খুশি করে দিত। ফলে বিদায়ের সময় মোটা বকশিশ মিলত। কিন্তু এই জামাইটির কাছে সে মোটে ঘেঁষল না। বাড়ির লোক ভাবল, মাত্র দুদিন আগে লছা একখানা আস্ত পাটালি গুড় চুরি করে খেয়ে শাস্তি

পেয়েছে। পাছে সেই কথাটা উঠে পড়ে, তাই জামাইকে এড়িয়ে চলছে লজ্জায়।

তবু দুজনে মুখোমুখি হয়ে গেল। পুকুরে দাদু চান করছেন, ঘাটে দাঁড়িয়ে লছা, হাতে দাদুর শুকনো কাপড়। এমন সময় জামাই হাজির। লছাকে দেখেই বলল, 'এই যে চন্দ্রকান্ত, কেমন আছ? তুমি এখানে? আমি ভাবলাম বুঝি নেই।'

জলে দাঁড়িয়ে দাদু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে চন্দ্রকান্ত?'

—'কেন এই তো। আপনার ভাইপো।'

—'ও চন্দ্রকান্ত কেন হবে। ও তো লছা।'

—'অ্যাঁ। তবে যে ও বলল?' জামাই আমতা আমতা করে।

—'তুমি আগে দেখেছ ওকে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। বছরখানেক আগে শ্বশুরবাড়িতে। তখন পরিচয় হয়েছিল।'

দাদু জল থেকে উঠে এলেন। গম্ভীর গলায় লছাকে বললেন, 'কীরে, গিছলি ও বাড়ি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'কবে?'

—'সেই যখন দেশ বেড়াতে গেছলাম।'

—'তা চন্দ্রকান্ত হলি কেন?'

—'কী ব্যাপার?' জামাই জানতে চায়।

—'হতভাগা বাড়ি থেকে পালিয়ে তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠেছিল। নিজেকে চন্দ্রকান্ত বলে চালিয়েছে। আমার ভাইপো চন্দ্রকান্ত ওই সাঁতার কাটছে।'

ব্যাপার বুঝে জামাই হো হো করে হেসে উঠল।

দাদু বেজায় চটেছিলেন। তখুনি লছাকে দু-চার ঘা দেবার ইচ্ছে ছিল। নেহাত নিজে সপসপে ভিজে এবং নতুন জামাই কাণ্ডটা লঘু ভাবে নিয়েছে, তাই সামলে নিলেন।

লছার দেশভ্রমণের জের এখানেই মিটল না।

মাসখানেক পরে দাদুর সম্পর্কে বেয়াই জগবন্ধু ভুঁইয়ার এক চিঠি এল। নানা কথার পর লিখেছেন— আপনার নাতি লক্ষ্মীকান্ত আশা করি কুশলে আছে। বড়ো ভালো ছেলে। তার পুনরায় আমন্ত্রণ রইল।

সবাই অবাক। কেউ ভেবে পায় না কে এই লক্ষ্মীকান্ত। দাদুর এক নাতির নাম

লক্ষ্মীকান্ত বটে, কিন্তু সে ভুঁইয়া মশায়ের বাড়িতে জন্মে পা দেয়নি। লছার কীর্তি নাকি?

লছাকে চেপে ধরা হল। সে স্বীকার করল। জানা গেল, সে পালিয়ে এক বছর ধরে দাদুর কুটুমদের বাড়ি বাড়ি ঘুরছে। পরিচয় দিয়েছে কোথাও নাতি, কোথাও বা ভাইপো। এমন সব বাড়িতে গেছে যাদের সঙ্গে এই বাড়ির দেখাসাক্ষাৎ হয় খুব কম। গড়বাড়ির এতগুলো ছেলেপুলেদের চেনেই বা কে, কাজেই কেউ ধরতে পারেনি। তাছাড়া গড়বাড়ি এবং তাদের কুটুমদের সব খবর জানে লছা। সে সবার খবর দিয়েছে, খবর নিয়েছে। দিব্যি জমিয়ে থেকেছে।

একটা রক্ষে, কোনো কুটুমবাড়ি থেকে লছা কিছু চুরিটুরি করেনি।

বুঝলি, লছার এমন বদনাম হয়ে গেছল যে গড়বাড়িতে কিছু চুরি হলেই লছার ওপর সন্দেহ হত। সুযোগটা অন্যরাও বেশ নিত। লছার কথায় কেই বা বিশ্বাস করে।

চুরি ধরা পড়লেই লছার ডাক পড়ত। কখনো সে স্বীকার করত, বের করে দিত কিছু চোরাই মাল; কখনো স্বীকার করত না। লছা স্বীকার না করলেও ধরে নেওয়া হত এ লছারই কাজ। এত আস্পর্ধা আর কার হবে!

তারপর অনেক বছর কেটে গেল।

দাদুর বেয়াই সেই জগবন্ধু ভুঁইয়া হঠাৎ এক দিন গড়বাড়িতে হাজির। তাঁর নাতনির অন্নপ্রাশন। খুব ধুমধাম হবে, তাই স্বয়ং নেমন্তন্ন করতে এসেছেন। ভুঁইয়ামশাই পৌঁছলেন সন্ধ্যা লাগিয়ে। সঙ্গে কিছু লোকজন এবং এক গাদা জিনিসপত্র।

বাড়িতে হই হই পড়ে গেল। ভুঁইয়ামশাই হেসে বললেন, 'আরে এ-যে চিনতেই পারি না। বাড়ির সামনে নতুন দালান উঠেছে, ঢোকার রাস্তাটা পালটে গেছে। কুড়ি বছর বাদে এ বাড়িতে আসা। ভেবেই পাচ্ছিলাম না কোন দিক দিয়ে ঢুকি। ভাগ্যি লছা ছিল বাইরে। পথ দেখিয়ে দিল। সত্যি বড়ো ভালো ছেলে। সকলের খোঁজখবর নিল। মজা করে লক্ষ্মীকান্ত বলে ডাকতে ভারি লজ্জা পেল।'

এ কথা শুনে বাড়ির লোক সবাই এ ওর মুখের দিকে চাইল। কেউ কিছু বলল না। ভুঁইয়ামশাই বড়ো জমিদার। অনেকদিন পরে গড়বাড়ির কুটুম্বদের কাছে এসেছেন। সঙ্গে এনেছেন মেলা উপহার, কাপড়চোপড়, গয়নাগাটি, সন্দেশ।

শুধু মিষ্টিটা তখন বিলোনো হল। বাকি সব তোলা রইল একতলার একটা ঘরে। তারপর অতিথিদের আদর আপ্যায়ন নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। উপহারের গাঁটরি তখনই আর খোলা হল না।

পরদিন গাঁটরিগুলো খুলে দেখা গেল ভালো ভালো দামি জিনিস সব হাওয়া। খালি কম দামি নিরেস জিনিসগুলো পড়ে আছে। ভুঁইয়ামশাই হাঁ। বাড়ির লোকের চক্ষুস্থির।

হরি গোমস্তা বলল, 'এ ঠিক লছার কাজ। মরেও ব্যাটার স্বভাব যায়নি।'

ভুঁইয়ামশাই আঁৎকে উঠলেন, 'মরেও মানে? কাল সন্ধ্যায় তাকে জলজ্যান্ত দেখলাম। প্রণাম করল, কথা হল। কী ব্যাপার!'

হরি বলল, 'আজ্ঞে না, আপনি আর কাউকে দেখেছেন। লছা গত হয়েছে বছর দুই হল। সান্নিপাতিক জ্বরে। তবে বলে না, স্বভাব যায় না মলেও!'

ভুঁইয়ামশাই কেমন চুপসে গেলেন। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরই তড়িঘড়ি বিদায় নিলেন। অবশ্য বারবার নেমন্তন্ন জানাতে ভুললেন না।

অতিথিরা চলে যাওয়ার খানিক পরে হরি গোমস্তা উঁচু রোয়াক থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সটান পড়ল সান বাঁধানো উঠোনে। পড়েই, 'বাবারে মারে', বলে কী কাতরানি! আর উঠতেই পারে না।

ডাক্তার এল। পরীক্ষা করে বললেন, 'ঠ্যাং ভেঙেছে। পায়ের গোছ। কাঠ লাগিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে। কিছুদিন একদম হাঁটা চলবে না।'

হরি থাকত একটু দূরে, কাছারি বাড়ির একটা ঘরে। একা। ওর পরিবার থাকত দেশে। হরিকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে শোয়ানো হল সদরে একতলায় একটা ঘরে। ওখানে রাখলে দেখাশোনার সুবিধে। ডাক্তার ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেলেন। হরির বাড়িতে খবর পাঠানো হল।

কিন্তু তবু হরির কী ভয়! কেবলই বলে, 'আমায় একা ফেলে যেয়ো না। দোহাই। কেউ থাকো আমার কাছে। নইলে লছাকে বিশ্বাস নেই। যদি আরও কিছু করে!'

বড়োমামা বিরক্ত হয়ে হরিকে ধমকালেন, 'নিজে পা পিছলে পড়ে ও বেচারাকে দোষ দিচ্ছ কেন?'

হরি বলল, 'না বাবু, আমি নিজে নিজে পড়িনি। লছাই আমায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে, পষ্ট টের পেলেম। পিছনে খুকখুক কাশি শুনলাম যে! ঠিক লছা যেমন কাশত। তারপরেই এক ঠেলা।'

—'লছা তোমায় ফেলে দেবে কেন?'

—'আজ্ঞে, রেগে গিয়ে শোধ—' ঢোঁক গিলে হরি চুপ করে গেল।

বড়োমামা ভুরু কুঁচকে বেরিয়ে এসে সোজা গিয়ে ঢুকলেন কাছারিতে হরির ঘরে। কোণে একটা মস্ত কাঠের সিন্দুক। তার ডালা খুলে ওপরের লেপ কাঁথা সরিয়েই মামা থ। নীচে ঠাসা হরেক রকম দামি দামি জিনিস। ভুঁইয়ামশাইয়ের হারানো জিনিসের সঙ্গে বেমালুম মিলে যাচ্ছে। এ ছাড়া গড়বাড়িতে চুরি যাওয়া কয়েকখানা রুপোর বাসনও রয়েছে।

হরি গোমস্তার ভয়ের কারণটা অমনি বোঝা গেল। এর পরে চুরির জন্যে লছার ঘাড়ে আর দোষ পড়েনি। আর কারো ঠ্যাংও ভাঙেনি।

উদ্ভট শখ

অফিসে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা টেলিফোন কল পেল তপন দত্ত। টেলিফোনটা বড়োবাবুর টেবিলে। ডাক পেয়ে তপন উঠে গেল ফোন ধরতে। টেলিফোনে অন্যপ্রান্তের কথাগুলি শুনতে শুনতে তপনের হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। সেকেন্ড দশেক বাদে রিসিভার নামিয়ে রেখে সে উত্তেজিত সুরে বড়োবাবুকে বলল, 'মুখুজ্যেদা, আমায় একবার বেরতে হবে। আমার পিসিমা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ফোনে বলল ওঁর পাশের বাড়ি থেকে।'

তপনের উৎকণ্ঠিত ভাব দেখে বড়োবাবু বলেন, 'হ্যাঁ যান। কী হয়েছে?'

তপন বলল, 'খুব শ্বাসকষ্ট। বুকে ব্যথা। পিসিমার হার্ট তো ভালো নয়।'

বড়োবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার এসেছে?'

তপন জানায়, 'বলল তো এনেছে। পাড়ার ডাক্তার।'

বড়োবাবু বললেন, 'না না। ওঁকে স্পেশালিস্ট দিয়ে দেখান।'

তপন বিমর্ষ ভাবে বলে, 'অনেকবার তো বলেছি। পিসি রাজি হয় না। পুরনো কালের লোক। পাড়ার ডাক্তারেই বিশ্বাস। সাহেবি ডাক্তারে ভয় পায়। কী করি? বেশি জোর করা যায় না। বড্ড জেদী মানুষ। আমি তাহলে যাই?'

বড়োবাবু তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলেন, 'হ্যাঁ যান। আপনার হাতে কোনো জরুরি কাজ থাকলে ওই নিতাইকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। বলবেন, আমি বলেছি।'

পিসিমার বাড়ি যাবার পথে বাসের সিটে বসে তপন ছটফট করে। মনে মনে ডাকে— হে ভগবান!

পিসিমার বাড়ি ভবানীপুরে। হাজরা পার্কের কাছে নেমে বড়ো রাস্তা থেকে

পাশে ঢুকে যাওয়া একটা সরু রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেক হেঁটে পিসির বাড়ি পৌঁছয় তপন।

বাড়িটা পিসির নিজের। মাঝারি আকার। দোতলা। নীচতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। দোতলায় থাকেন নিস্তারিণীদেবী অর্থাৎ তপনের পিসিমা।

নিঝুম বাড়ি। থমথম করছে। কারো গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। কী ব্যাপার?

তপন সোজা দোতলায় উঠে গেল।

সিঁড়ির পাশের ঘরটায় বসে ছিলেন আশুবাবু এবং বাগচীমশাই। পাশাপাশি গম্ভীর মুখে। আশুবাবু পাশের বাড়িতে থাকেন। ওঁর ছেলেই টেলিফোন করেছিল তপনকে। বাগচীমশাই পিসির ভাড়াটে।

তপনকে দরজায় দেখে আশুবাবু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। তপন কাছে গিয়ে উদ্‌বিগ্ন চাপা সুরে জিজ্ঞেস করল— 'পিসি?'

আশুবাবু নীচু স্বরে জবাব দিলেন : 'ঘুমুচ্ছেন। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।'

'—কেমন অবস্থা?' প্রশ্ন করে তপন।

আশুবাবু ডান হাতটা বরাভয়ের ভঙ্গিতে তুলে বললেন, 'মনে হচ্ছে এ যাত্রা ফাঁড়া কাটল। তবে ডাক্তার বলেছে, আরও চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।'

কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র তপনের সব উদ্‌বেগ উত্তেজনায় যেন ঠান্ডা জল ঢেলে দেওয়া হল। গ্রীষ্মের দুপুরে ঘেমে নেয়ে ধড়ফড় করে ছুটে আসার ক্লান্তিটা টের পেল এতক্ষণে। পা দুটো থেকে যেন শুষে নিচ্ছে শক্তি। সে ওই ঘরেই একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল।

তপনের অবস্থা দেখে আশুবাবু ভরসা দিলেন 'আহা অত নার্ভাস হচ্ছ কেন? ডাক্তার চাটুজ্যে যখন বলেছেন মনে হচ্ছে এ যাত্রা টিকে যাবেন তখন নির্ঘাত টিকেই যাবেন। ওই 'মনে হচ্ছে'টুকু কথার কথা। 'ওটা' বাদ দিতে পার। অনেক দিন তো দেখছি আমাদের ডাক্তারবাবুকে। আশ্চর্য ক্ষমতা। তবে হ্যাঁ, দিন পনেরো কমপ্লিট রেস্ট নিতে বলেছেন। আর ঠিকঠাক খাওয়া চাই সময়মতো। তোমার পিসিমা কিছুদিন বড্ড অনিয়ম করেছেন। মোতির মা বলছিল।'

তপনের মাথায় আশুবাবুর শেষ কথাগুলো আর ঢোকে না। কেমন ফাঁকা লাগছে মগজটা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক থেকে। সে চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়।

এবার বাগচীমশাই কথা বললেন, 'যাও-না, পিসিকে একবার দেখে এসো।'

বাগচীমশায়ের কথায় তপনের চটক ভাঙে। সে সামলে নেয় নিজেকে। বলে— 'ও হ্যাঁ যাই।' সে পা টিপেটিপে যায় পিসির শোবার ঘরের দরজায়।

খাটে চিত হয়ে শুয়ে আছেন নিস্তারিণী দেবী। বুক অবধি চাদরে ঢাকা। চোখ বোজা। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে ধীর লয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস বইছে। খাটের পাশে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার। টেবিলে কিছু ওষুধপত্র। ফ্যানটা ঘুরছে জোরে। পায়ের কাছে চেয়ারে বসে প্রৌঢ়া মোতির মা। একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পিসিমার দিকে। সাদা থান পরা বিষণ্নতার প্রতিমূর্তি যেন। বাড়িতে যে ঝড় বয়ে গেছে তার ছাপ মোতির মায়ের চোখেমুখে।

তপন দরজায় আসতে মোতির মা এক ঝলক ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তপনকে। ফের তার চোখ ফিরে গেল পিসিমার ওপর।

তপন জানে, যতদিন না পিসিমা সুস্থ হয়ে খাট ছেড়ে নামবেন, মোতির মা কদাচিৎ তাঁকে চোখের আড়াল করবে। দিনে রাতে এই ঘরেই কাটাবে। পিসির সব কাজ করে দেবে। বাইরে থেকে নার্স ভাড়া করে আনা সত্ত্বেও মোতির মা থাকে। এর আগেও এই ব্যাপার ঘটেছে।

একটা বিপুল হতাশা আচ্ছন্ন করে তপনকে। ইস এবারেও হল না। গেল সুযোগটা।

তপন পিসির কাছে যায় না। মস্ত ঘরখানার এক কোণে অবসন্ন ভাবে একটা চেয়ারে বসে। মাথায় চিন্তার ঝড়।

ওঃ আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে ছোটেলালকে? বেচুকে? শুধু হতাশা নয়। প্রচণ্ড রাগ ও মরিয়া ভাব গুমরে ওঠে তার বুকের ভিতর। উঃ এভাবে আর কতদিন যে চলবে?

খানিকক্ষণ চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থেকে তপন পিসির ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ফের গিয়ে বসে আশুবাবু ও বাগচীমশায়ের কাছে। পিসির ঘর তার তখন অসহ্য ঠেকছিল।

—'কে ডাক্তার ডাকল?' জানতে চায় তপন।

আশুবাবু বললেন, 'মোতির মা। নিস্তারদির বুকে ব্যথা উঠতেই প্রথমে ছুটে যায় ডাক্তারবাবুর কাছে। তারপর আমাদের খবর দেয়। খুব বুদ্ধি ওর।'

—'হুঁ। কিছু আনতে হবে?' জিজ্ঞেস করে তপন।

আশুবাবু বললেন, 'আপাতত দরকার নেই। আমার ছেলে মিন্টু, ওষুধ

ইনজেকশন অক্সিজেন সব এনে দিয়েছে। তোমায় টেলিফোন করল তারপর। জানে, তুমি আসতে আসতে দেরি হয়ে যাবে। মিন্টু দুজন নার্স ঠিক করতে গেছে। দিনে রাতে ডিউটি দেবে দিন পনেরো।'

—'সত্যি মিন্টু খুব কাজের,' জানায় তপন, 'তবে আমি দেরি করতাম না। তেমন দরকারে ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসতাম। বড়ো জোর মিনিট পনেরো লাগত।'

আশুবাবু বললেন, 'কিছু বলা যায় না হে। যা পথঘাট, ট্রাফিক জ্যাম। ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।'

—'তা বটে।' সায় দেন বাগচীমশাই।

আশুবাবু এবং বাগচীমশাই এবার বিদায় নিলেন। মোতির মাকে বলে গেলেন, কিছু দরকার হলেই যেন খবর দেয় তাঁদের। তপন সেখানে আরও ঘণ্টাখানেক বসে রইল গুম মেরে। মধ্যে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট সামনে রেখে গেল পিসির ছোকরা কাজের লোক রাজু। অন্যদিন মোতির মা নিজে হাতে চা দেয়। আজ অবশ্য সে মা ঠাকরুনকে ছেড়ে নড়বে না। যতক্ষণ না নার্স আসে।

ঘণ্টাখানেক বাদে উঠে পড়ল তপন। মোতির মাকে বলে এল— 'দরকার হলেই আমায় খবর দিয়ো। অবশ্য আমি রোজই আসব কিছুদিন।'

তপন বেরিয়ে পড়ে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে।

তপন কেন ক্ষুব্ধ? কী চায় সে? কারণগুলো জানানো যাক।

তপন দত্ত তিরিশে পা দিয়েছে। কলকাতায় কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে থাকে ছোটো একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে। একাই থাকে। এখনও বিয়ে করেনি। বজবজে থাকেন তপনের বাবা মা। ছোটোখাটো সরকারি চাকরি করে তপন। ডালহৌসি পাড়ায় অফিস। নিস্তারিণী দেবী তার নিজের পিসিমা। বাবার একমাত্র ছোটো বোন।

তপনের বাবা স্কুলমাস্টার ছিলেন। কায়ক্লেশে সংসার চালিয়েছেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন যতটা সম্ভব। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তপন তাঁর একমাত্র ছেলে।

বি. এ. পাস করে তপন আর পড়েনি। পড়াশুনা তার বেশি ভালো লাগত না। খেলাধুলো আর আড্ডায় মনোযোগ ছিল বেশি। বছর তিনেক বেকার ছিল। তখন ট্যুইশনি সম্বল করে বাপের হোটেলে থেকে চুটিয়ে আড্ডা দিত। তারপর এই চাকরিটা জোটে।

তপনের বাবা ছেলের কাছে হাত পাতেন না।

এই পিসির সঙ্গে তপনের ঘনিষ্ঠতা হয় কলকাতায় চাকরি নিয়ে আসার পর। বাবা তপনকে বলে দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে বিধবা নিঃসঙ্গ পিসির খোঁজখবর নিতে। সেই সূত্রেই পরিচয় ঘন হয়।

তপনের এই পিসির বয়স প্রায় সত্তর। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে বিয়ের পর বিদেশে বাস করছে বহুকাল। মেয়ে দু-এক বছর অন্তর দেশে আসে মাকে দেখতে।

পিসি রীতিমতো ধনী। কলকাতা শহরে তাঁর দুটো বাড়ি। এ ছাড়া সোনাদানা, জমা টাকাও প্রচুর। পিসির মেয়ে বলে দিয়েছে যে মায়ের সম্পত্তি চাই না। কারণ সে বা তার স্বামী আর এদেশে ফিরবে না। তাদের কোনো অভাব নেই। সুতরাং মা তাঁর সম্পত্তি যাকে খুশি দান করতে পারেন।

তপন প্রথম প্রথম পিসির কাছে যেত দুটো ভালোমন্দ খাবার লোভে। এরপর পিসির টাকাকড়ির গন্ধ পেয়ে পিসিকে রীতিমতো তোয়াজ শুরু করে। নিঃসঙ্গ পিসিরও ক্রমে বেশ স্নেহ জন্মায় ভাইপোটির ওপর। তিনি কয়েক বছর আগে একদিন স্পষ্টই জানিয়েছিলেন যে তাঁর উইলে তপনের জন্য মোটা অর্থ বরাদ্দ করে রেখেছেন। মোতির মাও কিছু পাবে। আর বাকি সম্পত্তি পাবে এক অনাথ আশ্রম। যে-কোনো কারণেই হোক পিসির সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকদের কোনো সম্পর্ক নেই।

মোতির মায়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। বিধবা। তার আপনজন কেউ নেই। নিস্তারিণী দেবীর আশ্রয়ে এসেছে বছর দশেক। সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে মনিব ঠাকরুনটিকে।

প্রচুর পয়সা থাকলেও পিসির জীবনযাত্রা খুবই সাদাসিধে। তিনি তপনকে বলেছেন, 'তোর পিসেমশাই অনেক কষ্টে ব্যাবসা করে অবস্থা ফিরিয়েছিলেন। কিন্তু কখনো অযথা বড়োমানুষি করেননি। তাঁর রেখে যাওয়া বিষয়সম্পত্তি আমি সৎ কাজে দান করব। নষ্ট হতে দেব না। অবশ্য আমায় যারা ভালোবাসে, যত্ন করে, লোক ভালো, তাদেরও আমি বঞ্চিত করব না।'

পিসি অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং নীতিবাগীশ। তপনের বেজায় ভয়, পিসি তার আসল হালচাল টের পেলে হয়তো একটি পয়সাও জুটবে না তার বরাতে। তাই সে প্রাণপণে পিসির সামনে ভড়ং বজায় রেখে চলে।

ছোটো থেকে তপনের মনে প্রচুর সাধ। ভালো ভালো খাওয়া, পরা, জিনিস কেনা। কিন্তু টানাটানির সংসারে এবং কড়া বাপের শাসনে সেসব সাধ আহ্লাদ

মেটেনি। চাকরি পেয়ে শহরে এসে তার সুপ্ত বাসনাগুলো ডানা মেলে। কিছু খারাপ সঙ্গীও জুটেছে কলকাতায়। তাদের পাল্লায় পড়ে নানান বদখেয়াল কাঁধে ভর করেছে। রোজগার কম। এদিকে খরচের বহরটা বেশি। তাই বাজারে ধার জমেছে ঢের। সেসব ধারশোধের কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না তপন। অফিসের ফান্ড থেকেও কিছু ধার নিয়েছে মিথ্যে বলে— বাবার অসুখে চিকিৎসার নামে। ছোটেলাল এবং বেচু তার দুই প্রধান পাওনাদার।

কিছুটা ধার শোধ করা যায় শখের দামি জিনিসগুলো বিক্রি করে। এছাড়া অফিসের ফান্ড থেকে আরও ধার নিতে হবে। অবশ্য ধার শোধ করতে মাইনে আরও কম পাবে। খুব টেনে চালাতে হবে কয়েকবছর। সেটাও তার ইচ্ছে নয় মোটে। তবে এই আর্থিক সমস্যার সুরাহা হবে এবং আরও কয়েকদিন কাপ্তেনি চালিয়ে যাওয়া যাবে এমন একটি সহজ উপায় আছে— পিসিমা। অর্থাৎ পিসিমা যদি এখনই গত হন, তপনের হাতে তাহলে মোটা টাকা আসে এবং সে দুশ্চিন্তা-মুক্ত হয়।

কিন্তু সে আশাও যে কেবলই ফস্কে যাচ্ছে। মোতির মায়ের সেবাযত্ন এবং পাড়ার ডাক্তারবাবুর চিকিৎসার গুণ তার বাড়া ভাতে ছাই ঢালছে বারবার।

পিসিমা কিপ্টে নয়। পাড়ার লোককে দরকারে অনেক সাহায্য করেন কিন্তু পিসির থেকে আর ধার পাবার উপায় নেই। কারণ বছর পাঁচেক আগে তপন পিসির থেকে দশ হাজার টাকা ধার করেছিল কাপড়ের ব্যাবসা করবে বলে। সে টাকা শোধ হয়নি। সত্যি সত্যি ব্যাবসা দাঁড় করানোর মতো ধৈর্য বা খাটাখাটুনি করা তপনের ধাতে নেই। সহজে বড়োলোক হবার আশায় সেই টাকায় রেস খেলেছে। টাকা উড়ে গেছে কয়েক মাসে। টাকা শোধ দিতে না পারায় পিসি একটু চটেছিলেন। বলেছিলেন— 'তোর দ্বারা ব্যাবসা হবে না। তোকে আর টাকা দেব না ব্যাবসায় লাগাতে।' ভাগ্যিস পিসি জানতে পারেননি যে কীভাবে নষ্ট হয়েছে তাঁর টাকাগুলো।

মাসখানেকের মধ্যে তপনের পিসি আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আটটার ভিতর পিসির বাড়ি হাজির হলে খাসা জলখাবার জোটে। কখনো লুচি বেগুন ভাজা। কখনো-বা মোহনভোগ। পিসি অবিশ্যি নিজে খান মুড়ি-চিঁড়ে। তবে লোক খাওয়াতে ভালোবাসেন। যাকে-তাকে নয়। পছন্দের লোক হওয়া চাই।

তপন যখন লুচি খায় পিসি তখন খাবার টেবিলের অপর প্রান্তে চেয়ারে বসে

একটা বড়ো পাথরের গেলাসে লেবু চিনির শরবত খান। একটু একটু করে। কথাবার্তা বলেন আর মাঝে মাঝে চুমুক মারেন। কখনো-বা সংসারের কাজে উঠে যান গেলাস টেবিলে রেখে। ফের এসে চুমুক দেন।

একদিন সকালে এমনি খেতে খেতে তপনের মনে হঠাৎ খেলে যায়— পিসি এখন উঠে গেছে। অর্ধেক খালি গেলাসটা পড়ে আছে টেবিলে। কেউ নেই কাছে। এসময়টা মোতির মা রান্নাঘরে থাকে। ওই গেলাসের শরবতে যদি টুক করে ফেলে দেওয়া যায় কোনো তীব্র বিষ। ব্যস কাজ হাসিল।

তারপরেই মনে জাগে— এরপর কিন্তু লোকে ঠিক সন্দেহ করবে। পুলিশে খবর দেবে। মৃতদেহ পোস্টমর্টেম হবে। জানা যাবে বিষের অস্তিত্ব। তখন? সে ধরা পড়ে যাবে। ফলে ফাঁসি। কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

ভিতরে ভিতরে তপনের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে পিসিকে খুন করার চিন্তাও আটকাচ্ছে না তার বিবেকে।

কাল ছোটেলাল হুমকি দিয়েছে তপনকে। এই মাসে তপন ছোটেলালের ধারের সুদ গুনতে পারেনি। আসছে মাসে একসঙ্গে দুমাসের সুদ চাই। নইলে কীভাবে পাওনা আদায় করতে হয় ছোটেলাল জানে।

শুধু ছোটেলাল নয়, অন্য পাওনাদারদের তাগাদাও ক্রমে বাড়ছে। সমস্তটা নাহোক অন্তত কিছুটা ধার শোধ করা চাই।

মরিয়া তপনের মাথায় অনেক উদ্ভট চিন্তা খেলে। হয় পিসি নয় ছোটেলাল— দুজনের একজন অন্তত এখনই পটল তুললে সে আপাতত খানিক নিশ্চিন্ত হয়। ছোটেলালের কাছে কর্জের পরিমাণটা সবচেয়ে বেশি। লোকটা সাক্ষাৎ গুণ্ডা। ওকে একটি পয়সাও ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

কিন্তু ছোটেলালকে বাগে পাওয়া কঠিন। সুতরাং পিসিই ভরসা। পিসিকে এখুনি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার কত প্ল্যান যে তার মাথায় ঘোরে। কিন্তু তার ওপর বিন্দুমাত্র সন্দেহ পড়বে না এমন একটাও পথ দেখতে পায় না। অফিসে অনেকেই জানে যে বড়োলোক পিসির দৌলতে তপন বিলাসিতা করে। এত ধারের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে তার খুব প্রেস্টিজ যাবে।

তপন হঠাৎ একটা দিশে পেল। আচমকা!

টিফিনের সময় অফিসের ক্যান্টিনে আড্ডা দিচ্ছিল অনেকে। তপনের মন মেজাজ ভালো নেই। সে চুপচাপ বসে চা খাচ্ছিল। শুনে যাচ্ছিল অন্যদের কথা।

সেদিনকার দৈনিক সংবাদপত্রে একটা খবর বেরিয়েছিল। তাই নিয়ে জোর আলোচনা বেধেছে। খবরটা এই—

বড়োবাজারে এক ধনী ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তার শোবার ঘরে। মনে হচ্ছে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু। তবে খুন বা আত্মহত্যা বোঝা যায়নি। তিনতলায় একা থাকতেন বৃদ্ধ। সকালে তাঁকে মৃত দেখা যায়। বৃদ্ধ ইদানীং খুব ভুগছিলেন। পুলিশ বাড়ির লোকদের জেরা করছে। লাশ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

সবজান্তা সাধন মণ্ডল ওই সূত্র ধরে লম্বা এক লেকচার জুড়ে দেয়। কোন বিষের কী লক্ষণ তাই নিয়ে। কী কী লক্ষণ দেখে বোঝা যাবে কী বিষ খেয়েছে।

তার বক্তৃতা শেষ হতেই মদন বলল, 'ইস এমন বিষ কি নেই যা খাওয়ালে কেউ ধরতে পারবে না? পোস্টমর্টেমেও ধরা যাবে না?'

—'উহুঁ।' মাথা নাড়ে সাধন।

—'আমি শুনেছি, আছে।' মন্তব্যটা করে ইউনিয়ন লিডার জীবন হালদার। সে এই দলে বসেনি। ব্যস্ত হয়ে এসে টোস্ট আর চা খাচ্ছিল পাশের টেবিলে।

—'কোথায় শুনেছেন?' সাধন ভুরু কুঁচকে জীবনকে প্রশ্ন করে।

—'একজনের কাছে শুনেছিলাম।' নির্বিকার ভাবে জবাব দেয় জীবন।

—'ইমপসিবল। আমি কোথাও এমন বিষের কথা পড়িনি।' জোরালো কণ্ঠে জানায় সাধন।

জীবন হালদার একটুও দমে না। দৃঢ় স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'সায়ান্সের কোথায় কী এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে সব কি ছাপা হয়? একদিন হঠাৎ জানা যায়।'

যুক্তিটা অকাট্য। সাধনরা চুপ করে যায়। তবে সাধনের মুখ দেখে ঠাহর হয় যে সে মোটেই কথাটা মেনে নেয়নি। কিন্তু জীবনের সঙ্গে তর্ক করতে চায় না। জীবন প্রচণ্ড তার্কিক তো বটেই। তাছাড়া ইউনিয়ন লিডার। আপদে বিপদে ভরসা। তর্ক করে ওকে চটিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। লোকটা অতি ধূর্ত। ওকে ভয় পায় সকলে। চটে গেলে কী প্যাঁচে ফেলবে কে জানে?

জীবন পাশের টেবিলের হাবভাব ভ্রূক্ষেপই করল না। চা শেষ করে দ্রুত পায়ে উঠে গেল।

জীবন চলে যেতেই সাধন ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল— 'কে কী গুলতাপ্পি মেরেছে, ব্যাস, বিশ্বাস করতে হবে। আবদার?'

বাপি বলল, 'লিডার যে। যা খুশি গেলাতে ওস্তাদ।'

জীবনের মাতব্বরি একদম পছন্দ করে না তপন। একবার খটাখটিও লেগেছিল। তবু নিজের স্বার্থে সেদিনই অফিস ছুটির কিছু আগে তপন জীবনকে

পাকড়াও করল— 'আচ্ছা ওই যে ভাই ক্যান্টিনে একটা কথা বলছিলেন, কিছুতেই ধরা যাবে না। সত্যি?'

—'তাই শুনেছি।' গম্ভীর ভাবে জানায় জীবন।

—'আশ্চর্য আবিষ্কার। কার কাছে শুনেছেন? একটু কথা বলে জানতাম আরও।'

—'কেন, আপনার কি ওই বিষ দরকার?' জীবন বাঁকা সুরে বলে।

—'না না। আমি কী করব? একটু জানবার ইচ্ছে হল ডিটেলস-এ।'

জীবন ঝপ করে বলল, 'বেশ, যদি এই নিয়ে আরও জানতে চান, নাম ঠিকানা দিচ্ছি। এর কাছে চলে যান। দেখি একটা কাগজ?'

তপন একটা পুরোনো রসিদ বের করে জীবনের হাতে দেয়। জীবন তাতে খসখস করে লিখে সেটা ফেরত দিল তপনকে।

তপন পড়ল— কবিরাজ নন্দ সেন। নিবাস পানিহাটি। একটা রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে।

—'কবিরাজ!' অবাক হয় তপন।

—'হুঁ। কেন অসম্ভব কি? এসব প্রাচীন শাস্ত্রে নাকি অনেক গোপন বিদ্যা আছে। পানিহাটি চেনেন?'

—'চিনি। শ্যামবাজার থেকে বি. টি. রোড ধরে ঘণ্টাখানেক বাসে।'

—'তবে চলে যান। শুনেছি ওই রাস্তায় গিয়ে এঁর নাম বললেই লোকে বাড়ি দেখিয়ে দেবে। তবে হ্যাঁ, ইনি চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ে কথা বলতে গেলে নাকি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করেন না। নিজের নাম ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখবেন। উনি জানাবেন, কবে কখন যাবেন। চিঠিতে প্রয়োজন লিখবেন— কবিরাজি শাস্ত্র বিষয়ে ব্যক্তিগত আলোচনা।' কথা থামিয়ে জীবন হালদার হনহন করে চলে যায়।

পরদিনই কবিরাজ নন্দ সেনের নামে একটি পোস্টকার্ড ছাড়ল তপন।

দিন দশেক পরে কবিরাজ নন্দ সেনের উত্তর এল পোস্টকার্ডে। লাল কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। আগামী রবিবার দুপুর তিনটে থেকে চারটের মধ্যে যেতে লিখেছেন। অর্থাৎ তিন দিন বাদে।

পানিহাটিতে নন্দ কবিরাজের বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না তপনের। ওই রাস্তায় একজন দেখিয়ে দিল— 'আরও এগিয়ে যান। একটা বাঁক পাবেন। ঘুরেই

পথের পাশে একটা বকুল গাছ। বাঁদিকে। তার সামনের বাড়ি। দোতলা। সামনে সাইনবোর্ড আছে।'

অঞ্চলটা প্রাচীন। রাস্তার ধারে বেশির ভাগ বাড়ি পুরোনো। আবার কয়েকটা হাল আমলের নতুন বাড়িও রয়েছে। দুপুরে তখন পথে লোক খুব কম।

সাইনবোর্ডটা দেখতে পেল তপন। ময়লা রঙচটা। লেখা— কবিরাজ নন্দ সেন। তারপর কতগুলি উপাধি বা ডিগ্রি ছোটো ছোটো অক্ষরে।

কবিরাজের বাড়িটা প্রকাণ্ড। বহু পুরোনো। মেরামতের অভাবে জীর্ণ। পলেস্তরা খসা ইট বের হওয়া দেওয়াল। বিবর্ণ জানলাগুলো বেশির ভাগ বন্ধ। মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ি। পাঁচিল ভেঙে গেছে অনেক জায়গায়। গেটের জায়গাটা হাঁ হয়ে আছে। গেট নেই। বাড়ির পিছনে জমি রয়েছে খানিক। সেখানে কয়েকটা বড়ো বড়ো গাছ বাড়ির ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছে। নিস্তব্ধ বাড়িটায় কেউ বাস করে কিনা বোঝা দায়।

গেটের ফাঁক দিয়ে হাত কুড়ি সোজা পেরিয়ে মোটা মোটা দুই থামের পিছনে এক ফালি বারান্দা। সাইনবোর্ডটা ঝুলছে বারান্দার মাথায়। বারান্দার পিছনে একটা ঘর দেখা যাচ্ছে। তার দরজাটা খোলা।

তপন হাতঘড়িতে দেখল— তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট। রাস্তার দুধারে তাকাল। কেউ নেই। সে গেট পেরিয়ে বারান্দায় উঠে খোলা দরজায় উঁকি মারল।

ঘরের পেছনের দেয়াল ঘেঁষে একটা তক্তপোশ, তাতে সতরঞ্চি পাতা। তার ওপর একজন বসে, দরজার দিকে মুখ করে। কিছু পড়ছেন। সামনে কাঠের ডেস্কে বই রেখে। তপনের পায়ের শব্দে মুখ তুলে ভারী গলায় বললেন— 'কে?'

তপন ঘরে ঢোকে। জিজ্ঞেস করে, 'কবিরাজ নন্দ সেন আছেন?'

—'আমি। কী চাই?' ভদ্রলোক উত্তর দেন।

তপন নীরবে কবিরাজের জবাব লেখা পোস্টকার্ডখানা বাড়িয়ে দেয়। এক নজরে সেটিকে দেখে নিয়ে কবিরাজ বললেন, 'বসুন।'

তক্তপোশের সামনে কয়েকটা পুরোনো কাঠের চেয়ার, তারই একটায় বসল তপন।

ঘরের একধারে দুটো খোলা জানলা। তাই দিয়ে রোদ ঢুকছে ঘরে। ঘরখানায় চোখ বুলিয়ে নেয় তপন।

বেশ বড়ো ঘরখানা। একধারে কাচের পাল্লা দেওয়া বড়ো একটা আলমারি। তাতে অনেক শিশি বোতল। কবিরাজের পাশে তক্তপোশে রাখা এক গাদা বইখাতা। দেয়ালে একটা ছবি ঝুলছে এক বৃদ্ধের। ঘরের আর কিছুর দিকে নজর দেবার সময় পায় না তপন। সামনের লোকটি তার যাবতীয় মনোযোগ আকর্ষণ করে।

কবিরাজ নন্দ সেনের চেহারাখানা চোখে পড়ার মতো। বাবু হয়ে খাড়া বসে আছেন। মাঝারি লম্বা। রোগা পাকানো শরীর। ফর্সা রং। পরনে ঢোলা গেরুয়া পাঞ্জাবি এবং ধুতি। মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল। মাথায় ঘাড় অবধি ঢাকা ঘন চুল। লম্বাটে মুখ। চুল দাড়িতে কিছু পাকা চুলের রেখা। বয়স চল্লিশ থেকে ষাটের মধ্যে যা খুশি হতে পারে। চাপা ঠোঁট। টিয়াপাখির মতো বাঁকা লম্বা নাক। চোখে গোল ফ্রেমের চশমা। চশমার কাচের পেছনে দুটি জ্বলজ্বলে চোখের চাউনি স্থিরভাবে লক্ষ্য করছে তপনকে।

—'বলুন?' ধীর গম্ভীর কণ্ঠে যেন আদেশ হয়।

তপনের বেশ নার্ভাস লাগে। কোনোরকমে সাহস সঞ্চয় করে। কারো গলা শোনা যাচ্ছে না। মনে হয় আর কেউ নেই কাছাকাছি। সে ইতস্তত করে নীচু স্বরে বলে ফেলে, 'শুনলাম, আপনি এমন একটা বিষ জানেন যা কোনোমতেই ধরা যায় না?'

কবিরাজ কথা বলেন না। শুধু একবার মাথা নাড়েন সায় দিয়ে।

—'আমি এইজন্যেই'— তপন থতমত ভাবে বাকি কথা শেষ করে না।

—'আপনার চাই?' চাঁচাছোলা স্পষ্ট প্রশ্নটা যেন ধাক্কা মারে তপনকে। সে ঢোক গিলে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল— 'হ্যাঁ।'

—'হুম।' কবিরাজ তক্তপোশ ছেড়ে মাটিতে নামলেন। ধীরপায়ে গিয়ে বাইরের দরজাটা বন্ধ করলেন। তারপর ঘরের অন্য দরজা, যেটা অন্দরের দিকে সেটার কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি এই সময় এক কাপ চা খাই। আসুন ভিতরে। এক কাপ চা পান করবেন আমার সাথে।'

—'না না, চা কেন?' তপন আপত্তি জানায়।

—'কেন, চা খান না?'

—'তা খাই।'

—'তাহলে আসুন। চা একা খেলে জমে না।' লোকটির কণ্ঠে এমন কর্তৃত্ব যে ওঁর অনুরোধ এড়ানো কঠিন। তপন উঠে কবিরাজের পিছু নেয়। বাড়ির ভিতরে ঢোকে।

চৌকো ছোটো বাঁধানো নীচু চাতাল। তার চারপাশ ঘিরে উঁচু বারান্দা। মোটা মোটা গোল থাম। এক-একধারে দু-তিনটে ঘর। ঘরগুলোর দরজা বন্ধ। একতলা বা দোতলায় জনপ্রাণীর দেখা পাওয়া গেল না। মনে হল যে বাড়ির এই অংশে থাকে না কেউ। উঠোনে ময়লা। বারান্দা ঝুলে ভর্তি। এক গাদা পায়রা ঘুরছে কার্নিসে কড়িকাঠে। যেন পোড়োবাড়ি। একটা ঘরের ছিটখানি খুলে কবিরাজ তপনকে ডাকলেন— 'আসুন ভিতরে।'

মাঝারি ঘরখানা। একটি মাত্র খড়খড়ি-দেওয়া জানলা খোলা। যথেষ্ট আলো ঢুকছে না ঘরে। দুদিকের দেওয়ালে পাঁচ-ছয় হাত উঁচু অবধি কাঠের খোলা তাক। দুটো মস্ত মস্ত কাচের পাল্লা দেওয়া কাঠের আলমারি একধারে। তাকে ও আলমারিতে অজস্র নানা আকারের শিশি বোতল। নানারকম বাটি প্লেট ছুরি চামচ গোল কাগজের ঠোঙা ইত্যাদি। শিশি বোতলগুলো যে খালি নয় বোঝা যায়। দেয়াল ঘেঁষে একধারে একটা সরু কাঠের বেঞ্চি। বেঞ্চির ওপর দু-তিনটে শিশি এবং কিছু টুকরো গাছের শিকড় ডাল ও পাতা। কেমন অদ্ভুত গন্ধ ভাসছে ঘরে। তপনের মনে হল এই ঘরেই বোধহয় কবিরাজের ওষুধের স্টক থাকে। ওষুধ তৈরি হয়।

—'বসুন।' আঙুল দেখাল কবিরাজ।

ঘরের মাঝখানে ছোটো একটা টেবিল। তার দুপাশে দুটো চেয়ার। একটা চেয়ারে বসল তপন।

ঘরের কোণে একটা স্টোভ ছিল। সেটা জ্বাললেন কবিরাজ। তারপর কেটলিতে কুঁজো থেকে জল ভরে বসিয়ে দিলেন স্টোভে। তাক থেকে দুটো কাপ নামিয়ে ধুয়ে রাখলেন বেঞ্চিতে। দড়িতে ঝোলানো ঝাড়নে হাত মুছে এবার তিনি এসে বসলেন তপনের মুখোমুখি।

স্থির চোখে তাকিয়ে কবিরাজ তপনকে প্রশ্ন করলেন— 'এবার বলুন, ওই বিষ দিয়ে আপনি কাকে হত্যা করতে চান এবং কেন?'

এই আচমকা প্রশ্নে তপন একেবারে থ হয়ে গেল। তার মুখে খানিকক্ষণ কথা বেরোয় না। তারপর প্রবল প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে, 'না না, আমি সেজন্যে চাইনি।'

তপনের কথা হাত তুলে থামিয়ে দিলেন কবিরাজ। অবিচলিত ভাবে বললেন, 'অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। যা জানতে চাইছি উত্তর দিন।'

মানুষটির প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বে আচ্ছন্ন হয়ে তপন বুঝল যে এঁকে ধোঁকা দেওয়া

বৃথা। সে একটু ইতস্তত করে বলল, 'তার কি দরকার আছে? আমি কিন্তু এরজন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত।'

—'আছে।' কবিরাজ মশাই দৃঢ় স্বরে জানালেন— 'কারণ আগে আমি বুঝে নিই, এই বিষ যাকে দেব, তাকে এটা দেওয়া উচিত হবে কিনা? উচিত মনে করলে তবেই দিই। নইলে দিই না। যদি আপত্তি থাকে, বলবেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি নিরুপায়। আপনাকে এ বস্তু দেবার কথা তাহলে কোনোমতেই বিবেচনা করতে পারব না। ভেবে দেখুন, কী করবেন?' নিস্তব্ধ ঘর। শুধু শোঁ শোঁ স্টোভের আওয়াজ।

মরিয়া তপন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে বলছি। যাকে আমি মারতে চাই, তিনি হচ্ছেন আমার পিসিমা। আর মারতে চাইছি কারণ', তপন একটা লম্বা গল্প ফেঁদে বসে—

বৃদ্ধা পিসিমা দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী। তাঁকে চিকিৎসা করাতে করাতে তপন নিঃস্ব হতে বসেছে। ধারে ডুবে যাচ্ছে। চিকিৎসা না করলে বাবা মনে কষ্ট পাবেন তাই বাধ্য হয়ে... পঙ্গু পিসিমার কোনো দিন আর ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। শুধু শুধু এই বিরাট খরচ তাকে টানতে হচ্ছে। আরও কত দিন যে টানতে হবে কে জানে? রোগে ভুগে ভুগে পিসিমার মেজাজ ভীষণ খিটখিটে হয়ে গেছে। সর্বদা চিৎকার চেঁচামেচি করেন শুয়ে শুয়ে। এর জন্যে তপনের স্ত্রী নিতান্ত বিরক্ত। সে আর পিসিমার সেবা করতে চাইছে না। সংসারে ঘোর অশান্তি লেগে গেছে পিসিমাকে নিয়ে। পিসিমা গত হলে তপনের সংসারে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। শান্তি ফিরে আসে। পিসিও রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। পিসিকে কোথাও যে পাঠিয়ে দেবে তারও উপায় নেই— ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবিরাজমশাই তাকে থামিয়ে দিলেন— 'দাঁড়ান, চা-টা বানিয়ে নিই। জল ফুটে গেছে।'

কবিরাজ মেঝেতে উবু হয়ে বসে চা বানাতে থাকেন। এই ফুরসতে তপন ভেবে নেয়, অসুস্থ পঙ্গু পিসির কারণে তার জীবন যে কত দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে তাই নিয়ে আরও কী কী বলবে। যাতে নন্দ কবিরাজের সহানুভূতি জাগে। যাতে সে বোঝাতে পারে পিসিকে হত্যা করলে কোনো অপরাধ করা হবে না। পিসির জীবনের বিনিময়ে অনেকের অশেষ উপকার হয়।

কবিরাজমশাই দু কাপ চা বানিয়ে টেবিলে রাখলেন। সঙ্গে একটি প্লেটে দুটি

বিস্কুট। একখানা বিস্কুট নিজে তুলে নিয়ে এবং এক কাপ চা নিজে নিয়ে চুমুক দিয়ে ইশারা করলেন তপনকে— খান।

দুজনে চা বিস্কুট শেষ করে। কবিরাজ চা খেতে খেতে চুপচাপ শোনেন তপনের বাকি কাঁদুনি।

তপন কথা শেষ করে উৎসুক ভাবে তাকিয়ে রইল কবিরাজের দিকে।

কবিরাজমশাই এবার একবার মাথা ঝাঁকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'এই বিষ আমি মাঝে মাঝে লোককে দিয়েছি বটে। আগেই যা বলেছি আপনাকে, সেই পরিস্থিতিতে। যখন মনে করেছি যে সে এই বিষ পাবার যোগ্য, অর্থাৎ খুনটা অন্যায় নয়। এ বিষে মৃত্যু ঘটলে এটা যে বিষ প্রয়োগে মৃত্যু তা ধরা অসম্ভব। মনে হবে স্বাভাবিক মৃত্যু। সন্ন্যাস রোগে। বিষের কোনো অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে না ময়না তদন্তে। এই বিষ আমি কাউকে দেব মনস্থ করলে এমনিই দিই। এর জন্য মূল্য নিই না।'

—'বাঃ', তপন উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'অনুগ্রহ করে আমায় ওই বিষ দিন। বুঝছেন তো আমার অবস্থা?'

কবিরাজের দাড়ি গোঁফের ফাঁকে ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফোটে। গালে কপালে ভাঁজ দেখা যায়। চোখ দুটি ছোটো হয়ে ঝিকমিক করে। চাপা গম্ভীর গলায় তিনি কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন— 'এই বিষ আপনাকে আমি ইতিমধ্যেই দিয়েছি। আপনি তা গ্রহণ করেছেন ওই চায়ের মাধ্যমে। চা বানাতে বানাতেই আমি স্থির করে ফেলি যে এই বিষ আপনার প্রাপ্য। সুতরাং বিনি পয়সাতেই দিয়েছি। তবে এর প্রতিষেধকের জন্য আমি মূল্য নিই।'

তপন ব্যাপারটা বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে কিছু ঝুঁকি আন্দাজ করেই এসেছিল। হয়তো বাগে পেয়ে বিষের জন্য প্রচুর দর হাঁকবে। অথবা ভবিষ্যতে ব্ল্যাকমেল করতে পারে। কিংবা অন্য কোনো ফাঁদে ফেলতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনা সে ভাবতেই পারেনি।

তপন পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ছুরি বের করে স্প্রিং টিপল। আট ইঞ্চি লম্বা ধারালো ফলাটা ঝড়াং করে বেরিয়ে এল।

নন্দ কবিরাজ বিন্দুমাত্র না ঘাবড়ে খিকখিক করে হেসে বললেন, 'ওটা ব্যবহার না করাই ভালো। প্রতিষেধকটা তাহলে কিন্তু আর মিলবে না। দুনিয়ায় আমি ছাড়া আর কেউ এই বিষ এবং প্রতিষেধক জানে বলে তো শুনিনি।' ক্ষিপ্ত

তপন ছুরিটা মুঠোয় বাগিয়ে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নন্দ কবিরাজের দিকে। কী করবে ভেবে পায় না।

কবিরাজ নির্বিকার ভাবে বললেন, 'ঝাল মেটাতে আমায় খুন করতে পারেন কিন্তু আপনিও বাঁচবেন না। আড়াই থেকে তিনঘণ্টার মধ্যে অব্যর্থ বিষের ক্রিয়া শুরু হবে। মিনিট দশেকের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু।'

—'প্রতিষেধকটা বের করুন। নইলে'— ঘড়ঘড়ে গলায় গর্জন করে ওঠে তপন, ছুরি তাক করে।

কবিরাজ নির্বিকার ভাবে বললেন, 'প্রাণের মায়া তুচ্ছ করেই এ কাজ করি। জীবনে আমার কোনো আসক্তি নেই। কোনো বন্ধন নেই।'

—'প্রতিষেধকের জন্যে কত চান?' গরগর করে ওঠে তপন।

—'মাত্র এক হাজার টাকা,' বিনীত ভাবে জানালেন কবিরাজ, 'কী করি? বেঁচে থাকলে কিছু টাকার প্রয়োজন। কারো যদি শখ থাকে খুন করা আটকানো, তা সেই উদ্ভট শখ থেকে কিছু উপার্জন করা কি অপরাধ? কী বলেন?'

ছুরিটা নিজের চেয়ারে রেখে তপন বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে হাজার টাকা গুনে টেবিলের ওপর রাখল।

কবিরাজমশাই কিন্তু টাকাটা নেবার কোনো চেষ্টাই করলেন না। তিনি এবার কঠিন গলায় বললেন— 'আর একটা কাজ বাকি। আপনার পিসিমা এবং আমার নিজের নিরাপত্তার কারণে। আপনাকে একটি বিবৃতি লিখতে হবে। এখুনি। আপনার পিসিমাকে খুন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে এবং উদ্দেশ্যটা যে আমি দৈবাৎ জেনে ফেলেছি তাও লিখতে হবে। এই নিন কাগজ কলম। বয়ানটা বলে যাচ্ছি, লিখুন।'

কবিরাজমশাই বলে যান। বাধ্য হয়ে লেখে তপন। তপন মতলবটা ঠিক ধরতে পারে না। লেখার নীচে নাম সই করে তারিখ দিয়ে।

কবিরাজ বললেন, 'এবার আমি আপনার এই স্বীকৃতি খামে ভরে ডাকে দিয়ে আসব। ওটা যাবে আমার এক বন্ধুর কাছে। সে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বড়ো কাজ করে। তাকে এখুনি আমি জানিয়ে দিচ্ছি আলাদা একটা চিঠিতে— আমি বা আপনার পিসিমা নিস্তারিণী দেবীর হঠাৎ অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে সে যেন এই খামটা খুলে আপনার বিবৃতিটা পড়ে এবং অনুসন্ধান করে এ ব্যাপারে আপনার হাত আছে কি না। যদি আপনি আমাদের কাউকে সত্যি খুন করে বসেন, মনে রাখবেন যে আপনার ফাঁসির ব্যবস্থা তৈরি রইল। আপাতত আপনার

বিবৃতিটা খামে বন্ধ হয়ে গচ্ছিত থাকবে আমার পুলিশ বন্ধুর কাছে। হ্যাঁ, চিঠি দুটো ডাকে ফেলে দিয়ে এসে, আমি নিশ্চিন্তে আপনাকে প্রতিষেধকটা দেব।'

কবিরাজমশাই এবার উঠে, তাকে রাখা একটা খাতার ভিতর থেকে একটা খাম এবং একটা ইনল্যান্ড বের করলেন। খামে তপনের স্বীকৃতিটা ভরলেন। খামের মুখ আঠা দিয়ে বন্ধ করলেন। কোণের বেঞ্চিতে রেখে খামে ঠিকানা লিখলেন। ওইখানেই চটপট লিখলেন ইনল্যান্ডে। সেটাও আটকালেন। অতঃপর ধীরেসুস্থে এসে টেবিল থেকে হাজার টাকা তুলে নিজের পাঞ্জাবির পকেটে ভরে তপনকে বললেন— 'এইখানেই অপেক্ষা করুন। আমি আধঘণ্টার মধ্যে ফিরব।'

নন্দ কবিরাজ বেরিয়ে গেলেন। কাঠ হয়ে বসে থাকে তপন। ঘামতে থাকে। হাতঘড়িতে দেখল যে চা খাবার পর প্রায় এক ঘণ্টা দশমিনিট কেটেছে। ঠিক আধঘণ্টা বাদে ফিরে এলেন কবিরাজ। তপনকে ডাক দিলেন— 'আসুন।'

বাইরের দিকে যে ঘরে কবিরাজ প্রথমে বসেছিলেন সেখানে হাজির হয় দুজনে।

তপন লক্ষ করে যে বাইরের দরজাটা খোলা এবং তক্তপোশের ওপরে রাখা একটা কাচের গেলাস ভর্তি বুঝি কোনো শরবত।

কবিরাজ গেলাসটা দেখিয়ে তপনকে বললেন, 'ওই আপনার প্রতিষেধক। খেয়ে ফেলুন।'

তপন ঢকঢক করে এক নিশ্বাসে সমস্ত শরবতটুকু খেয়ে নিল। কেমন মিষ্টি ঝাঁঝালো স্বাদ। ঠক করে নামিয়ে রাখল গেলাসটা।

তপনের চোখমুখের ভাব লক্ষ্য করে কবিরাজ মশাই কড়া গলায় বললেন— 'উঁহু কোনো মারধর বা গুণ্ডামির চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন, পুলিশের এক বড়ো কর্তা আমার বন্ধু। আর এ পাড়ার লোক আমায় খুব মানে।'

দাঁত কিড়মিড় করে তপন বলল, 'আপনার এই চালাকি আমি রটিয়ে দেব। দেখি আপনার এই ব্যাবসা কেমন চলে।'

কবিরাজ মুচকি হেসে বললেন, 'তাহলে কিন্তু আমার কাছে আপনার আসার উদ্দেশ্যটাও ধরে ফেলবে লোকে।'

সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল তপন। সে চলে যাবার জন্য পিছু ফেরে।

—'শুনুন।' ডাকলেন কবিরাজ।

তপন ঘুরে দাঁড়ায়।

বাঁকা হেসে কবিরাজ মশাই বললেন, 'একটি অনুরোধ। ইচ্ছে হলে আমার

এই বিষের খবর অন্যদেরও জানাতে পারেন, কারণটা বুঝে। তবে একটু কৌশলে। যোগাযোগ করার কায়দাটাও বলে দেবেন। আমার কাছে এই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা আসে তাদের প্রত্যেককেই আমি এই অনুরোধ করে থাকি।'

একটু থেমে স্থির চোখে তপনের দিকে চেয়ে কবিরাজ বললেন— 'বলা তো যায় না, মনে মনে কে কার শত্রু! হয়তো বা আপনার থেকে খবর পেয়ে কেউ আমার কাছে আসতে পারে আপনাকেই সরাবার মতলবে। তখন আমার এই বেয়াড়া শখটাই আপনাকে রক্ষা করবে। আচ্ছা নমস্কার।'

কবিরাজ নন্দ সেনের বাড়ি থেকে তপন বেরিয়ে পড়ে। পিছনে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হয়।

সাঁকো ভূত রহস্য

ভবানী প্রেসের লাগোয়া ছোট্ট অফিসঘরে বসে এক সকালে কুঞ্জবিহারী সামনের টেবিলে দুম করে এক কিল বসিয়ে বলে উঠলেন, বুঝলে দীপক, স্পেশাল টাইপ নিউজ চাই। এসব একঘেয়ে খবরে আর পোষাচ্ছে না। সেই বাজার দর, ট্রেন লেট, লোডশেডিং, রাজনৈতিক লড়াই— সব কাগজেই তো প্রায় একই জিনিস। লোকে আমার কাগজ বিশেষ করে পড়বে কেন? নতুন ধরনের খবর চাই। তবে তো পাঠক টানবে—

বোলপুর শহরে ভবানী প্রেসের মালিক কুঞ্জবিহারী মাইতি 'বঙ্গবার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এটা তাঁর শখ। কারণ কাগজ চালিয়ে লাভের বদলে বরং লোকসানই হয়। তবে কুঞ্জবাবু দমেন না। ভবানী প্রেস থেকেই ছাপা হয় বঙ্গবার্তা। কুঞ্জবাবুই তার সম্পাদক। কুঞ্জবাবু নিজে যথাসম্ভব ঘুরে ঘুরে খবর জোগাড় করেন। এছাড়া তাঁর দু-তিনটি রিপোর্টার আছে। রিপোর্টাররাও শখের। এই কাজের জন্য বেতন মেলে না। বঙ্গবার্তা দেবেই বা কোত্থেকে? রিপোর্টাররা গ্যাঁটের পয়সা খরচ করেই সাংবাদিকতা করে। বড়োজোর মাঝে মাঝে বাস ভাড়া জাতীয় কিছু খরচ পায় কাগজের রোজগার বুঝে। দীপক রায় বঙ্গবার্তার এমনি এক রিপোর্টার।

কুঞ্জবাবুর বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ। বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোট্টা, শ্যামবর্ণ। একটু ছটফটে মানুষ। দীপকের বয়স বছর পঁচিশ। রং ফর্সা। সুশ্রী লম্বা দোহারা গড়ন। চালাক চতুর এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়।

দীপক গ্র্যাজুয়েট। লোহা-লক্কড়ের কারবার আছে তার বাবার। বাবা এবং দাদাই যা ব্যাবসাপত্তর দেখে। দীপক বড়ো একটা ওদিকে ঘেঁষে না। নিজের

নানান শখ নিয়ে থাকে। বঙ্গবার্তার পিছনে অনেকখানি সময় দেয়। তার মনে একটা গোপন আশা, ভবিষ্যতে নামকরা রিপোর্টার হবে। সে পকেটে পরিচয়পত্র রাখে। সেই কার্ডে ছাপা— দীপক রায়। সাংবাদিক।

—'কী, ভাবলে কিছু?' কুঞ্জবিহারী সামনে বসা দীপককে প্রশ্ন করলেন।

—'আজ্ঞে।' দীপক মাথা চুলকোয়, 'কই তেমন কিছু—'

—'যাও-না একবার নসিপুরে', বললেন কুঞ্জবিহারী, 'খোঁজ করে এসো ভব সরকারের জামাই-এর গল্পটা সত্যি কি না?'

—'কী গল্প?'

—'সাঁকো ভূতের।'

—'অ্যাঁ, ভূত!'

—'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভূত। ভূত কি কিছু খারাপ সাবজেক্ট? হতে পারে এটা বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু ভূতের দর কি কিছু কমেছে? মনে তো হয় না। তা নইলে ভূত বা অলৌকিক বিষয় নিয়ে আজও এত লেখালেখি হয় কেন?' কুঞ্জবাবু তেতে উঠলেন।

—'আজ্ঞে ব্যাপারটা কী?' জানতে চাইল দীপক।

ব্যাপারটা হল, নসিপুর গ্রামের একদিকের সীমানায় একটা খাল আছে। খালের ওপরে আছে একটা সাঁকো। কিছুদিন যাবৎ কোনো লোক রাতে ওই সাঁকো পেরোতে গেলেই ভূত-টুত জাতীয় কেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছে সাঁকো থেকে। যে ধাক্কা মারছে কেউ তাকে দেখতে পায়নি। ভব সরকারের জামাই-এর মাসির বাড়ি ওই গাঁয়ে। সে বেচারা জানত না ব্যাপার। মাসির কাছে গিছল একটা কাজে। গাঁয়ে পৌঁছতে রাত হয়ে গিছল। ওই সাঁকো পেরিয়ে ঢুকছিল গাঁয়ে। হঠাৎ এক ধাক্কা খেয়ে পড়ে নীচে। ভাগ্যিস অল্প জল আর কাদা ছিল খালে। তাই লাগে-টাগেনি। তবে মেন্টাল শকটা খুব লেগেছিল। ভয়ে নসিপুরের লোক রাতে আর ওই সাঁকো পেরোচ্ছে না। ব্যস, এর বেশি আমি আর জানি না কিছু। ভবর জামাই গতকাল এসেছিল ভবর বাড়িতে। সাঁকো ভূতের গল্প করে গেছে। আমার গিন্নি শুনেছে নিজের কানে। তুমি চলে যাও নসিপুর। ব্যাপারটা যাচাই করে এসে রিপোর্ট দাও। জব্বর স্টোরি হবে।'

কাগজের লোকেরা খবরকে যে কেন স্টোরি বলে? ভাবল দীপক। সে জিজ্ঞেস করল, 'নসিপুর কোথায়?'

—'নানুরের একটু আগে। বাস রাস্তা থেকে মাইল দুই যেতে হয় ভিতরে

মেঠো পথে। ওই গ্রামে আমার একজন চেনা আছে। দরকার হলে রাত কাটাতে পারবে তার বাড়িতে।'

—'কিন্তু ভূত-প্রেতের ব্যাপারে নাক গলানো কি উচিত হবে?' মাথা নেড়ে বললেন, বৃদ্ধ কম্পোজিটর দুলালবাবু। এতক্ষণ তিনি কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন সব কথাবার্তা।

—'আপনি থামুন তো, ধমকে দিলেন কুঞ্জবিহারী, রিপোর্টারের কাজ অত সোজা নয়। কত রিস্ক নিতে হয় জানেন? দরকার হলে জঙ্গলে ঢুকতে হয়, পাহাড়ে চড়তে হয়, সমুদ্রে নামতে হয়, গোলাগুলির মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি কাল যাব নসিপুর।' কুঞ্জবাবুর বক্তৃতায় উৎসাহিত দীপক সম্মতি জানিয়ে উঠে পড়ল।

—'আমি তাহলে এ হপ্তায় দু-লাইন ছেপে দিচ্ছি বার্তায়', চেঁচিয়ে বললেন কুঞ্জবাবু, 'নসিপুরের ভূতুড়ে সাঁকো— মানে যেটুকু শোনা গেছে। ফিল্ড তৈরি করে রাখি। পরে বেরুবে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ। একটা বিশেষ সংখ্যায়।'

ভূত আছে কি নেই? তাই নিয়ে দীপক এ যাবৎ তেমন মাথা ঘামায়নি। ভূতের ভয়ে সে কাবু হয়নি কখনো। আবার ভূত নেই প্রমাণ করতে শ্মশানে মশানে যাবার দুঃসাহসও দেখায়নি।

বাড়িতে দীপকের দু-টি ভক্ত আছে। একটি ভাইপো এবং একটি ভাইঝি— বড়দার ছেলে-মেয়ে। পনেরো বছরের ছোটন এবং বারো বছরের ঝুমা। দীপক তাদের কাছে একবার সমস্যাটা তুলল— 'কীরে ভূত আছে, না নেই?'

—'ফুঃ!' উড়িয়ে দিল ছোটন।

ঝুমা বলল, 'ভূত আছে বৈকি কাকু। কত লোক বলেছে। বেশি চালাকি করলে দাদাটা বুঝবে একদিন ঠেলা।'

দীপক কোনো মন্তব্য করল না।

সকাল দশটা নাগাদ নসিপুরে পৌঁছল দীপক। কুঞ্জবাবুর পরিচিত কেষ্ট ঘোষের সঙ্গে দেখা করে দিল কুঞ্জবাবুর চিঠি এবং নিজের কার্ড।

—'অ্যাঁ, সাংবাদিক!' কেষ্ট ঘোষের চোখে মুখে সম্ভ্রম ফোটে, 'কী উদ্দেশ্যে আগমন? কী খবর চান?'

দীপকের যাওয়ার আসল উদ্দেশ্যটা লেখেননি কুঞ্জবাবু। তাতে অযথা ঝঞ্ঝাট

বাড়বে। সবাই প্রাণ ভরে দীপকের কানে ভূতুড়ে গুজব ঢালবে। দীপককে কৌশলে যাচাই করতে হবে সাঁকো ভূতের কাহিনি। চিঠিতে ছিল— কিছু খবর নিতে যাচ্ছে দীপক। তাই দীপক বলল, 'আপনাদের গ্রামে যে কয়েকটা পানীয় জলের নলকূপ বসানোর কথা ছিল সেগুলো কদ্দূর এগোল খোঁজ নিতে এসেছি।'

দেখতে দেখতে দীপককে ঘিরে ভিড় জমে গেল। পানীয় জল, চাষবাস এবং আরও অনেক গ্রামের সমস্যার কথা শুনতে হল দীপককে।

কেষ্ট ঘোষ মানুষটি ভালো। আগে কখনো কোনো জ্যান্ত রিপোর্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি, তাই দীপককে পেয়ে বেজায় খুশি। ভিড় একটু পাতলা হতে দীপক বলল, 'ধারে কাছে দেখবার মতো কী কী আছে?'

কেষ্টবাবু বললেন, 'আছে বৈকি। ডাকাতে কালীমন্দির। মহাবট। ওঃ, সে কী গাছ! অন্তত দেড়শো বছরের পুরোনো। চার-পাঁচ বিঘা জমির ওপর দাঁড়িয়ে। এসেছেন যখন, দেখে যান। সাইকেল চালাতে পারেন তো? যাব দুজনে।'

এমনি সুযোগ খুঁজছিল দীপক। তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল। ঠিক হল দুপুরে কেষ্টবাবুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে বেরুনো যাবে। কেষ্টবাবুকে একটু একলা পেতেই দীপক জিজ্ঞেস করল— 'আচ্ছা, আপনাদের গ্রামে নাকি ভূতুড়ে উপদ্রব হচ্ছে? কোন একটা সাঁকোর ওপর?'

—'হুঁ, কে বলল?' জবাব দিলেন কেষ্ট ঘোষ।

—'কুঞ্জবাবুর প্রতিবেশী ভবনাথ সরকারের জামাই। তার এই গাঁয়ে মাসির বাড়ি। সে নাকি স্বয়ং পড়েছিল ভূতের খপ্পরে। আমি অবশ্য নিজে শুনিনি, কানে এসেছে। কুঞ্জবাবুও শুনেছেন, এ ধরনের গুজব অবশ্য খুব ছোটে। তিল থেকে তাল হয়। সত্যি বলতে কি, এইসব ভূত-ফুতে আমার বিশ্বাস হয় না মশাই।'

কেষ্ট ঘোষ বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সত্যি মিথ্যে জানি না, তবে ব্যাপার যা ঘটছে মোটেই উড়িয়ে দেওয়া চলে না।'

—'কী ব্যাপার বলুন তো?' দীপক খুব আগ্রহ দেখাল।

কেষ্টবাবু যা বললেন তা মোটামুটি কুঞ্জ মাইতির বর্ণনার সঙ্গে মিলে গেল। অতিরিক্ত যা জানা গেল তা হচ্ছে— ধাক্কা নয়, ভূতে নাকি থাপ্পড় মেরে সাঁকো থেকে ফেলে দিয়েছে দুজন গ্রামের লোককে এবং ভব সরকারের জামাই মথুরাকে। গ্রামের যে দুটি লোক সাঁকো ভূতের চড় খেয়েছে তাদের একজনের নাম হারু দাম, অন্যজন নিতাই দত্ত। লোক দুটির বাড়ির হদিস জেনে নিল

দীপক। তারপর কেষ্ট ঘোষকে বলল, 'চলুন-না, সাঁকোটা একবার দেখে যাই। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।'

নসিপুরের পুব পাড়ার সীমানা ছাড়িয়ে চোখে পড়ল একটা খাল। প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া, ছ ফুট গভীর খালটা গ্রামের পুব দিক ঘেঁষে সোজা চলে গেছে মাঠ ভেদ করে। কেষ্ট ঘোষ বললেন, 'এদিকটায় ঢালু, তাই গাঁয়ের ভিতরকার জল গড়িয়ে এসে পড়ে এই খালে। ফলে ভরা বর্ষায় খালে দু-তিন হাতের মতো জল থাকে। এখন ভাদ্র মাস। বৃষ্টি কম। তাই খালে জল প্রায় নেই।'

খালের ধারে ধারে খানিক হেঁটে গিয়ে কেষ্ট ঘোষ দেখালেন— 'ওই যে সেই সাঁকো।'

সাঁকো বলতে লম্বা দুটি খেজুর গাছের গুঁড়ি গায়ে গায়ে ফেলা, ব্যস। ধরবার রেলিংটেলিং-এর বালাই নেই। গুঁড়িগুলোর ওপর দিকটা চাঁচা। যাতে পায়ে না লাগে।

কেষ্ট ঘোষ জানালেন, পুব পাড়ার মানুষ বাস থেকে নেমে খানিক আলে আলে এসে এই সাঁকো দিয়ে গাঁয়ে ঢুকলে শর্টকাট হয়। লোকে পুব দিকের মাঠে কাজ করতেও যাওয়া-আসা করে এই সাঁকো পেরিয়ে। নইলে গোরুর গাড়ির পথে গাঁয়ে ঢুকতে একটু ঘুর হয়। তা এখন সবাই সন্ধ্যার পর ঘুরেই আসছে। নেহাত কাদায় পড়ায় কারও তেমন লাগেনি বটে কিন্তু বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ?

সাঁকো থেকে হাত পঁচিশ তফাতে গ্রামের দিকে খালপাড়ে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। গাছটার দিকে চেয়ে দীপক ভাবল, এই গাছটাতেই ভূতের আস্তানা হওয়া বিচিত্র নয়। সে কেষ্ট ঘোষকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এই উৎপাতের কারণটা কী? মানে কার ভূত? আন্দাজ করেছেন কিছু?'

কেষ্ট ঘোষ ভীত দৃষ্টিতে একবার পিছনে তাকিয়ে বললেন, 'মনে হয় এ খোঁচা মিত্তিরের প্রেতাত্মা।'

—'খোঁচা মিত্তির!'

—'হুঁ, ওই যে ভিটে', শখানেক হাত দূরে বড়ো বড়ো গাছ ও ঝোপঝাড়ে ভরা একটা ছোটো মাটির বাড়ি দেখালেন কেষ্ট ঘোষ, মাস ছয়েক আগে বুড়ো অক্কা পেয়েছে। এমন হাড়কঞ্জুস আর ঝগড়াটে লোক দেখা যায় না। গাঁয়ে কারো সঙ্গে ওর সদ্ভাব ছিল না। একটি মাত্র ছেলে, সেও পৃথক হয়ে অন্য জায়গায় বাস করছে। কখন কী ভাবে ও মারা গেছে কেউ জানে না। দুদিন ঘর থেকে

বেরুচ্ছে না দেখে লোকে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে বিছানায় মরে পড়ে আছে। ডাক্তার বলেছে, সন্ন্যাস রোগ। ওই ভিটেতে এখন কেউ থাকে না। ওর ছেলেকে বলেছি, বাপের নামে গয়ায় পিণ্ডি চড়াতে। ছেলের গরজ নেই। দেখি তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

—'তা এই সাঁকোয় চড়লে খোঁচা মিত্তিরের ভূতের চটবার কারণ কী?' জানতে চাইল দীপক।

—'আছে, আছে, কারণ আছে', বললেন কেষ্টবাবু, 'এই সাঁকোর সামনে খালপাড়ের খানিকটা জমি ও দখল করার তালে ছিল। গাঁয়ের লোক বাধা দেওয়ায় আর পারেনি। হয়তো সেই রাগে—'

দীপক সাঁকোটার ওপর দিয়ে হেঁটে একবার ওপারে গিয়ে তখুনি আবার ফিরে এল। কেষ্ট ঘোষ বললেন, 'দিনে নয়, ভয় রাত্তিরে।'

দুপুরে মহাবট ও ডাকাতে কালী দেখতে যাওয়ার সময় দীপক খুঁতখুঁত শুরু করল, 'ফিরতে যদি দেরি হয়ে যায়, বোলপুরের বাস পাব তো?'

কেষ্ট ঘোষ বললেন, 'দেরি হলে না হয় এই গরিবের বাড়িতেই কাটাবেন রাতটা। আমাদের ঘরে ইলেকট্রিক লাইট বা ফ্যান নেই, তবে দেখবেন মাটির বাড়ির দোতলা কেমন ঠান্ডা আর বাতাসও খুব।

দীপক তাই চাইছিল। খুশি হয়ে বলল, 'বেশ, তবে আজ রাতটা আপনার আশ্রয়েই কাটাব। তাহলে আর ফেরার জন্য তাড়াহুড়ো করতে হবে না। ধীরে সুস্থে দেখা যাবে।'

মহাবট ও ডাকাতে কালী দেখে নসিপুরে ফিরে চা জলখাবার খেয়ে, সন্ধ্যার মুখে দীপক কেষ্টবাবুকে বলল, 'আমি একবার গাঁয়ের মধ্যে বেড়িয়ে আসি। দু-চারজনের সঙ্গে কথা বলব। না না, আপনাকে যেতে হবে না সঙ্গে। আপনার এই পুত্রটিকে নিয়ে যাচ্ছি। দু-একটা বাড়ি দেখিয়ে দিয়েই চলে আসবে।' সে কেষ্ট ঘোষের দশ বছরের ছেলে বুবাইকে কাছে টেনে নিল। কেষ্টবাবু ক্লান্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে যেতে তাই আর জোরাজুরি করলেন না।

হারু দামের বাড়ি চিনে নিয়েই দীপক বুবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

সাঁকো ভূতের কথা তুলতেই প্রৌঢ় ভালো মানুষ হারু যেন কেঁপে উঠল। সেই ভূতুড়ে চড়ের বর্ণনা দেওয়া তার সাধ্যে কুলাল না। বারবার শুধু বলতে লাগল, 'উঃ, খুব বেঁচে গেছি। খোঁচা মিত্তিরের রাগ ছিল আমার ওপর। ফের ওর পাল্লায় পড়লে হয়তো প্রাণটাই খোয়াব।'

এরপর দীপক গেল নিতাই দত্তর কাছে।

যুবক নিতাইয়ের ধারণা, খোঁচা মিত্তির নয়, এ আসলে ব্যাচারামের ভূত। ব্যাচারাম ছেলেটা ভারি দুরন্ত ছিল। গত বছর তাল পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মারা যায়। পিণ্ডিটা ওর নামেই দেওয়া উচিত। কারণ থাপ্পড়টা হালকা হাতের, যেন ছোটো ছেলের চড়। তেমন জোর নেই। তবে গা শিউরনো বটে।

—'সাঁকো ভূতের হাতে প্রাণের ভয় আছে কি?' জিজ্ঞেস করল দীপক।

—'নাঃ।' নিতাই ঘাড় নাড়ল, তবে সাঁকোর তলায় খালের ভিতর ঝোপে বিষাক্ত সাপ থাকতে পারে। বেটাল হয়ে তাদের ঘাড়ে পড়লেই খতম।

নিতাই দত্তর ইন্টারভিউ সাঙ্গ করে দীপক ধীরে ধীরে পুব পাড়ার দিকে হাঁটা দিল। তার বুকটা দুরদুর করছে। এবার হাতে-কলমে পরীক্ষা।

খোঁচা মিত্তিরের পোড়ো বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দীপকের রীতিমতো গা ছমছম করতে লাগল। ওইটাই এদিককার শেষ বাড়ি। সন্ধ্যার পর এ-ধারটা যে এত নির্জন হয়ে যায়, সে ভাবতে পারেনি। আকাশ মেঘলা। তাই হালকা চাঁদের আলোটুকুও ফোটেনি। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে সে এগোয়। তীক্ষ্ণ অদ্ভুত স্বরে কী জানি দুবার ডেকে উঠল কাছেই। দীপক কাঠ। টর্চ ঘুরিয়ে দেখল পাশের ঝোপগুলোয়। সে মোটেই ভীতু নয়। কিন্তু এই জনহীন নিস্তব্ধ জমাট অন্ধকার— এই অস্বস্তিকর পরিবেশ তার মনে রীতিমতো ছাপ ফেলে।

সাঁকোর মুখে গিয়ে দীপক চারধারে একবার টর্চের আলো ফেলল। বিশেষত তেঁতুল গাছটার গায়ে। হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানিতে গাছে গাছে, ঝোপেঝাড়ে খসখস খুটখাট। আলো নিভতেই আঁধারে আরও চেপে ধরে। সাঁকোর ওপর চড়তে দীপকের আর পা সরে না। শেষে মনে জোর এনে সে উঠে পড়ল সাঁকোয়।

সাঁকোর ওপর আলো ফেলে পা টিপে টিপে এগোয় দীপক। সাঁকোর গুঁড়ি দুটো মিলে বড়োজোর হাতদেড়েক চওড়া। বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় একটু পিছল। দিনের বেলা অবশ্য এটার ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দীপকের কোনো অসুবিধে হয়নি। এখন কিন্তু বেশ ভয় ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে পা ফসকালেই পড়বে কোন অতল খাদে।

দীপক সাঁকো পেরিয়ে গেল। কই ঘটল না তো কিছু? সে একইভাবে ফিরতে শুরু করল।

প্রায় শেষাশেষি এসে গেছে, হঠাৎ শুনল পিছনে মৃদু সোঁ সোঁ আওয়াজ এবং

পরক্ষণেই তার বাঁ কানের ওপর পড়ল একটা সজোর চাপড়। মারটা এত জোরালো নয় যে তার ধাক্কায় দীপক মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকলে পড়ে যেত— কিন্তু সেই অপার্থিব স্পর্শ তাকে এমন চমকে দিল যে একটা চাপা আর্তনাদ করে সে টলে গেল। প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেও পারল না। সাঁকো থেকে পড়ল নীচে।

কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে বসে থেকে দীপক উঠে দাঁড়াল। কোমর অবধি জলকাদায় মাখামাখি। নাঃ, ব্যথা বেশি লাগেনি। শুধু ডান কনুইটা একটু ছড়ে গেছে। টর্চটা কিছু দূরে পড়ে জ্বলছে তখনো। টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে আগাছা সরিয়ে সে সাবধানে উঠে এল পাড়ে। মগজটা একটু সাফ হতে ভাবতে চেষ্টা করল— ঠিক কী কী ঘটেছে? আবছা মনে পড়ল, ঠিক পড়ে যাওয়ার আগে কী যেন একটা চোখে পড়েছিল! এক টুকরো গাঢ় কালো ছায়ার মতন কী যেন মাথার ওপর দিয়ে ভেসে মিলিয়ে গেল অন্ধকার ফুঁড়ে। কী ওটা! ওই কি সাঁকো ভূত?

কেষ্ট ঘোষ দীপককে দেখে আঁতকে উঠলেন, 'কী ব্যাপার মশাই?'

দীপক লাজুক হেসে জানাল, 'পথে এক জায়গায় কাদা ছিল, পা হড়কে পড়ে গেছি।'

কেষ্টবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন। হাত-পা ধুয়ে ফেলুন। ধুতি দিচ্ছি, প্যান্টটা ছেড়ে ফেলুন। ওটা ধুয়ে দিতে বলি।'

পরদিন দীপককে দেখে সম্পাদক কুঞ্জবিহারী প্রশ্ন করলেন, 'নসিপুরে গিছলে?'

—'হুঁ, গিয়েছিলাম', জবাব দিল দীপক।

—'কী খবর?'

—'ইনভেস্টিগেশন চলছে।' গম্ভীর ভাবে জানাল দীপক।

কুঞ্জবাবু আর তাকে ঘাঁটালেন না।

দুদিন বাদে দীপক ছোটনকে নিয়ে দুপুরবেলা ফের নসিপুরে হাজির হল। কেষ্টবাবুর সঙ্গে দেখা করল। বলল, 'ইটি আমার ভাইপো। ওকে মহাবট, ডাকাতে কালী এইসব দেখাতে নিয়ে এলাম। আমার কাছে গল্প শুনে অবধি খুব ধরেছিল নিয়ে যেতে।... না-না, আপনাদের কারো সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। আমি তো পথ চিনে গেছি। সাইকেলে নয়, হেঁটে যাব। আমাদের পক্ষে এবড়োখেবড়ো মেঠো পথে সাইকেল চালানো মুশকিল। ও আপনাদের অভ্যেস

আছে। কী এমন পথ? মাইল দু-তিন বড়োজোর। ফিরতে দেরি হলে আপনার বাড়িতে বরং আজ রাতটা অতিথি হব।'

—'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, এ তো আমার সৌভাগ্য।' জানালেন কেষ্ট ঘোষ।

—'আমার এই ভাইপোটির গুণ আছে', বলল দীপক, 'নানা জীবজন্তুর ডাকের নকল করতে পারে। শোনাবেখন আজ রাতে। ফিরতে সন্ধে হলে চিন্তা করবেন না। টর্চ আছে আমাদের। একটা শক্তপোক্ত লাঠি যদি দেন— তাহলেই ব্যস।

দীপক সত্যিসত্যি মহাবট ও ডাকাতে কালী দেখাবার লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছে ছোটনকে। কিন্তু সাঁকো ভূতের কথা ঘুণাক্ষরেও জানায়নি।

মহাবট ডাকাতে কালী ইত্যাদি দেখে নসিপুরে ফিরতে দীপক ইচ্ছে করেই দেরি করল। সেই অভিশপ্ত সাঁকোর কাছে যখন পৌঁছল তখন রাত নেমে গেছে। তবে আকাশে এক ফালি চাঁদ থাকায় অন্ধকার একটু ফিকে।

দীপক সাঁকোর গায়ে আলো ফেলে ছোটনকে বলল, 'এর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারবি?'

ছোটন বলল, 'কেন?'

—'গাঁয়ে ঢুকতে শর্টকাট হবে।'

ছোটন সন্দিগ্ধ ভাবে সাঁকোটাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

—'ভয় নেই, পড়লে হাড়গোড় ভাঙবে না।' উৎসাহ দিল দীপক, 'দেখি তোর ব্যালান্স কেমন?'

—'দিনের বেলা অনায়াসে'— বিড়বিড় করে ছোটন।

—'আরে দিনে তো যে-কেউ পারে। এ গাঁয়ের লোক নাকি এটা সাইকেলে পেরিয়ে যায় দিনে। রাতে পেরোনোই তো শক্ত। অবশ্য ভয় করলে থাক। আমি কিন্তু পেরোতে পারি এখন।'

—'অলরাইট—' আঁতে ঘা লাগাতে ছোটন বীরদর্পে সাঁকোর ওপর পা দিল। তবে দু পা গিয়েই সে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ল। সাবধানে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল টর্চের আলো ফেলে।

দীপক একটু পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে উবু হয়ে বসল। তার স্নায়ু টানটান। উত্তেজনায় নিজের হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি কানে বাজছে।

সাঁকোর মাঝামাঝি পৌঁছেছে ছোটন— হঠাৎ সপাৎ সপাৎ করে একটা আওয়াজ। অমনি 'বাপরে' বলে আর্তনাদ করে ছোটন টলে পড়ল সাঁকো থেকে।

মুহূর্তে দীপকের হাতের টর্চ জ্বলে উঠল। তীব্র আলোর ঝলক সার্চ লাইটের মতো অন্ধকার ভেদ করে বারকয়েক ঘোরাফেরা করল।

—'কাকু, ও কাকু।' ছোটন কয়েকবার কাতর স্বরে ডাকার পর সাড়া দিল দীপক, 'কীরে, লাগেনি তো?'

—'না। কিন্তু টর্চটা যে কোথায় পড়েছে—'

ওপর থেকে আলো ফেলল দীপক। দেখা গেল ছোটনের পায়ের কাছেই পড়ে আছে তার টর্চ।

পাড়ে উঠে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল ছোটন। হাঁপাচ্ছে সে। ভীত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী কাকু, আমায় মারল ঘাড়ে?'

দীপক গম্ভীর গলায় জবাব দিল, 'সাঁকো ভূত।'

—'অ্যাঁ ভূত!' চমকাল ছোটন, 'তুমি জানলে কী করে?'

—'জানি। আমিও ওর চড় খেয়েছি যে।'

—'অ্যাঁ কাকু, তুমি জেনেশুনে আমায় সাঁকোয় তুললে!' ছোটন কাঁদো-কাঁদো।

—'কেন, সেদিন যে খুব বড়াই করছিলি, ভূত মানি না?'

ছোটন শিউরে উঠে নিজের মনে বলল, উঃ, তাই কী বিশ্রী ঠাণ্ডা হাত!

দীপক বলল, 'ছোটন, তুই বা আমি যে সাঁকো ভূতের চড় খেয়েছি এ কথা খবরদার এখন বলবিনে কাউকে। ওখানে একটা টিউবওয়েল আছে, যতটা পারিস ধুয়ে মুছে সাফসুফ হয়ে নে। তাও যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তোর গায়ে কাদা লাগল কী করে? বলবি, ধানক্ষেতে পড়ে গিছলি পা পিছলে।'

—'কেন? বলব না কেন?'

—'কারণ আছে। কাল বুঝবি।'

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ দীপক ও ছোটনকে দেখা গেল নসিপুরের ভূতুড়ে সাঁকোর কাছে তেঁতুল গাছটার তলায়। তাদের সঙ্গে একটি বছর বারো-তেরোর ছেলে। ছেলেটা কুচকুচে কালো। রোগা টিঙটিঙে। পরনে কেবল একটি হাফপ্যান্ট। ওর নাম কেলো। গাছে চড়তে ভারি ওস্তাদ। এই গ্রামেই বাড়ি। কেষ্টবাবুর ছেলে বুবাই জুটিয়ে দিয়েছে কেলোকে। ছোটন তার কাকুর মতলব কিছু আঁচ করতে পারছিল না। কেন এখানে? কী উদ্দেশ্যে? এ বিষয়ে দু-চারটে প্রশ্ন করেও সে উত্তর পায়নি কাকুর কাছে।

দীপক কেলোকে তেঁতুল গাছটা দেখিয়ে বলল, 'ওঠ গাছে। যা বলেছি খুঁজে দেখবি ভালো করে। দু টাকা বকশিশ পাবি।'

কেলো শুকনো মুখে তাকাল ওপরে। তার ভয়ের কারণটা স্বাভাবিক। সাঁকো ভূতের কথা গাঁয়ের কে না জানে? হয়তো এই গাছেই তার ডেরা। তবু গরিবের ছেলে দুটো নগদ টাকার লোভ ছাড়তে পারল না। বুঝি প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই কেলো তেঁতুল গাছটার গুঁড়ি বেয়ে চড়তে শুরু করল। ক্রমে চলে যায় ডালপালার আড়ালে।

দীপক ও ছোটন চুপ। তারা ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে থাকে। কেলোকে একটু আধটু চোখে পড়ছে কখনো। খুব রাগ হচ্ছিল ছোটনের। গরিবের ছেলেটাকে এইভাবে লোভ দেখিয়ে গাছে চড়ানো কি উচিত হল কাকুর! যদি কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যায়? হঠাৎ ওপর থেকে সরু গলায় চিৎকার শোনা গেল, 'পেয়েছি বাবু।'

—'বাসায় ছানা আছে কি?' দীপক চেঁচাল।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ', উত্তর এল।

দীপক বলল, 'ঠিক আছে, নেমে আয়। কাছে যাসনি, বিপদ হতে পারে।'

খানিকবাদেই কেলো সড়সড় করে নেমে এসে মাটিতে দাঁড়াল। তারপর একগাল হেসে দুহাত ছড়িয়ে দেখিয়ে বলল, 'এই এত বড়ো হুতুম।'

—'কী কাকু?' ছোটন উত্তেজিত হয়ে জানতে চায়।

—'হুতুম প্যাঁচা ওরফে সাঁকো ভূত।' দীপকের জবাব।

—'মানে!' ছোটন থই পায় না।

দীপক বলল, 'মানে এই গাছের কোটরে প্যাঁচাটা বাচ্চা ফুটিয়েছে। এই সময় প্যাঁচা মায়ের মেজাজ ভীষণ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। কেউ তার বাসার কাছে গেলেই আক্রমণ করে। এও তাই সাঁকো দিয়ে কাউকে আসতে দেখলেই তেড়ে যেত। পাখার ঝাপটা মারত পিছন থেকে। লোকে ভাবত ভূতুড়ে চড়। প্যাঁচা কেবল রাতে বেরোয়। তাই আক্রমণটা হত রাত্তিরে। সেদিন ভূতুড়ে চড় খেয়েই আমার সন্দেহটা জাগে। মনে পড়ে যায়, এমনি ঘটনা আমি শুনেছি আগে।

'কাল প্যাঁচাটা তোকে ঝাপটা মারা মাত্র টর্চ ফেলে দেখলাম— হুঁ, যা ভেবেছি ঠিক। এবং দেখলাম, ও সোজা উড়ে গিয়ে ঢুকল তেঁতুল গাছটার ভিতরে।

'বুঝলি, এই হচ্ছে সাঁকো ভূত রহস্য।'

চিকন

'উরি ব্বাস।'

ঘ্যাঁচ। চাপা আর্তনাদটা গলা ঠেলে বেরুতে-না-বেরুতেই দু হাতে ব্রেক চাপল মুকুন্দ। প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে সাইকেলের গতি মুহূর্তে রুদ্ধ হল। টলে গিয়ে মুকুন্দ নেমে পড়ল এবং পরক্ষণেই তড়িৎবেগে দ্বিচক্রযানটির মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে চেপে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্যাডেল মেরে সে উধাও হল।

বাগানের বাইরে গিয়ে মুকুন্দ হাঁপ ছাড়ে। ভুল হয়েছে বইকী। সন্ধের ঝোঁকে হালদার বাড়ির বাগানের ভিতর দিয়ে যাওয়া। বাগান বলা উচিত নয়। জঙ্গল। বিরাট বিরাট গাছের তলায় ঝোপঝাড় আগাছায় ভরা। তারই ভিতর দিয়ে গেছে কটা সুঁড়ি পথ। আগে নাকি হালদার বাগান সত্যি দেখার মতন ছিল। সুরম্য অট্টালিকা ঘিরে বিশাল সাজানো বাগান। আম জাম কাঁঠাল নারকেল ইত্যাদি ফলের গাছের সঙ্গে নানান বাহারি ফুল পাতার সৌখিন গাছ। অবাঞ্ছিত আগাছাহীন তকতকে। বাগানে বাঁধানো ঘাটওলা মস্ত পুকুর।

হালদারকুঠি বা তার বাগানের গৌরবের দিনগুলি স্বচক্ষে দেখেনি মুকুন্দ। এসব শোনা কথা, বাপ-পিতামহের মুখে। তার পঁচিশ বছরের জীবনের শুরু থেকেই দেখছে হালদারদের হতশ্রী অবস্থা। দিন দিন ওই বাড়ি বাগান আরও দীনহীন হয়ে পড়ছে। পুকুর মজে গেছে প্রায়।

এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এখানকার গাঁয়ের লোক দিনের বেলাতেই পথ চলে না বিশেষ। গেলেও সতর্ক হয়ে চলে। মুকুন্দ আনমনা ছিল। হালদারবাড়ির পিছন দিকে খানিক দূরে মাঠে একটা ইটভাটা হয়েছে সম্প্রতি। যাচ্ছিল সেখানে। বেশ জোরেই চালাচ্ছিল সাইকেল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে আট-দশ হাত তফাতে সরু

পথটা পেরোচ্ছে প্রকাণ্ড একটা সাপ। মালুম হল খরিস গোখরো। খাঁটি জাত-সাপ।

নেহাতই বরাত জোর তাই খুব সময়ে ব্রেক কষতে পেরেছে। নইলে সোজা গিয়ে পড়ত ওর ওপর। এবং তাহলে? ভেবে সে শিউরে ওঠে। এই জঙ্গুলে বাগান যে বিষাক্ত সাপখোপের আড্ডা কে না জানে। বুকের ধড়ফড়ানি কমতে তার সময় লাগে।

সাপটাও কম চমকায়নি।

বাঁক খেয়ে ফিরে ঝোপের আড়ালে আড়ালে সরসর করে অনেকখানি ছুটে গিয়ে তারপর ফিরে তাকিয়ে সাপটা নিশ্চিন্ত হল। মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে না। যদি ও সত্যি ঘাড়ে পড়ত? আঘাত পেলে অবশ্যই রুখে দাঁড়াত সে। লোকটা ইচ্ছে করে বা অনিচ্ছাবশে অসাবধানে তার ঘাড়ে পড়েছে এত বিচার করার ধৈর্য থাকত না। ফলে দুজনের মধ্যে কেউ একজন প্রাণ হারাত। কিন্তু তা তো চায় না সাপটা। অবশ্য যদি সেই লোকটা হত ছেড়ে দিত না সে। পথ থেকে সরে গিয়েই সে এক ঝলকে দেখে নিয়েছিল মানুষটাকে।

বুড়ো ঠাকুর্দা বলত যে অকারণে হিংসা করবি না। শুধু খাদ্য আর আত্মরক্ষার প্রয়োজনে জীবকে আক্রমণ। আমাদের হাতিয়ার আছে। অতি মারাত্মক অস্ত্র। ভয়ানক বিষ। সে অস্ত্র অকাজে লাগাবি না। তবে হ্যাঁ, মনে রাখিস, মানুষ বড়ো ফিচেল জাত। তাদের ন্যায় অন্যায় বোধ কম। অকারণে অন্যের ক্ষতি করে। উত্যক্ত করে। ওদের এড়িয়ে চলবি। নয়তো ভয় দেখিয়ে তাড়াবি দরকারে। হালদারবাড়ির মানুষরা ভালো। আমাদের আত্মীয়ের মতন। বহু পুরুষ ধরে এই ভিটেতে এক সাথে বাস। তবে অন্য মানুষদের থেকে সাবধান।

হালদার বাড়ির এক তলায় একটি অন্ধকার কুঠুরির মেঝের নীচে গর্তে থাকে সাপটা। বহুকাল ধরে তাদের বংশের কেউ-না-কেউ, কখনো একা, কখনো-বা জোড়ায় এই বাড়িতে বাসা বেঁধেছে। হালদাররা তাদের বলে বাস্তু সাপ। জাতে খরিস গোখরো হলেও হালদাররা নাম দিয়েছিল গোলাপনাগ। ফণা মেললে চ্যাটালো ফণায় ঘট চিহ্নের মাঝে থাকে একটুখানি গোলাপি ছোপ। এটাই হালদার ভিটের বাস্তু সাপদের বৈশিষ্ট্য।

যে সাপটা সাইকেল চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল তার একটা নাম আছে। চিকন। তার বুড়ো ঠাকুর্দার দেওয়া নাম। যখন সে প্রথম এই বাড়িতে পাকাপাকি বাস করতে আসে বুড়ো ঠাকুর্দা আদর করে ওই নামে ডাকত তাকে। এখন

অবিশ্যি তার শরীর আর তেমন সরু চিকন নেই। ভরা যৌবনে তিন হাত লম্বা সুপুষ্ট তরতাজা গতিময় দেহ। শীতলপাটির মতন চকচকে গা ধূসর রঙা। তার আগে হালদারভিটেতে গোলাপনাগ বংশের একজনই বাস করত— বুড়ো ঠাকুর্দা। অতবড়ো গোখরো সাপ সচরাচর দেখা যায় না। অমন ভয় জাগানো চেহারা হলে হবে কি, ঠাকুর্দার মেজাজটি ছিল ভারি ঠান্ডা। সাত্ত্বিক প্রকৃতির।

বুড়ো ঠাকুর্দাই চিকনকে পরামর্শ দিয়েছিল, এই বাড়িতে আস্তানা গাড়তে। ঠাকুর্দার পর চিকনই হল হালদারভিটের বাস্তু সাপ। ঠাকুর্দার বয়স হয়েছে। ঠাকুর্দা গত হলে গোলাপনাগ বংশের কেউ বাস করবে না হালদারদের ভিটেতে, তা কি হয়?

বুড়ো ঠাকুর্দার মুখে চিকন শুনেছিল হালদারবাড়ির অনেক গল্প। এক সময় গমগম করত এই বাড়ি। এ বাড়ির বাসিন্দারা আর বাস্তু সাপরা মানিয়ে চলত পরস্পরকে। কেউ কারোকে বিরক্ত করত না, আঘাত করত না। এই ধারাই চলেছে বংশানুক্রমে। হালদার বাড়ির পুরোনো দিনের কথাও এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে জেনেছে মানুষে এবং সাপে, যারা এই ভিটেতে বাস করে আসছে। যেমন বুড়ো ঠাকুর্দা জেনেছিল তার আগের পুরুষের কাছে। আর চিকন শুনেছে বুড়ো ঠাকুর্দার মুখে।

বুড়ো ঠাকুর্দা বুদ্ধি দিতেন চিকনকে, 'বুঝলি, হালদার বাড়িতে আমরা নিশ্চিন্ত। তবে বাইরের মানুষরা সবাই ভালো নয়। তাই বাস্তু সাপরা বাগানের চৌহদ্দির বাইরে যায় না পারতপক্ষে। আমিও যাই না। তুইও যাসনে।'

বিধিটি যথাসম্ভব মেনে চলে চিকন।

হালদার বংশের সঙ্গে গোলাপনাগ বংশের সম্পর্কটা আজও অটুট। এ যে দুই বংশেরই ভিটে। বিশাল হালদারকুঠির প্রায় গোটা অংশই আজ নিঝুম পুরী। জরাজীর্ণ। পরিত্যক্ত। শুধু একধারে কয়েকখানা মাত্র ঘর নিয়ে বাস করেন হালদার বংশের কয়েকটি প্রাণী। মাঝবয়সি কর্তা গিন্নি। তাদের বিধবা পুত্রবধূ এবং আট-দশ বছরের দুটি নাতি নাতনি।

ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ে দুটি ঝোপঝাড় ভরা বাগানে ঘোরে। খেলে বেড়ায়। আতা কুল পেয়ারা খোঁজে। ফুল তোলে। ওরা কাছে এলে চিকন সন্তর্পণে সরে যায়। পাছে ভয় পায় ওকে দেখে। অবশ্য ভয় ওরা পাবে না। চিকনকে চেনে। দাদু চিনিয়ে দিয়েছে 'ও হল বাস্তু সাপ। আমাদেরই মতন এই বাড়িতে বহুকাল আছে। ওকে ঢিলটিল মেরো না। তা হলে কিচ্ছুটি বলবে না।'

ওদের ছোড়া ঢিল অবশ্য মাঝে মাঝে চিকনের গায়ের কাছে পড়েছে। একটু চমকে উঠে চিকন স্থির চোখে তাকিয়ে দেখে বুঝেছে যে লক্ষ্যটা সে নয়। ফলটল পাড়তে গিয়ে ছোটো ছোটো হাতের ঢিল ওদের অজান্তে এসে পড়েছে তার কাছে। দিনের বেলা চিকন বাইরে বেরয় খুব কম। তাই হালদার বাড়ির মানুষগুলির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় কদাচিৎ।

একবার চিকন বেশ রেগে গিয়েছিল হালদার মশায়ের বাগাল ছেলেটার ওপর। বিকেলে নির্জন পুকুর পাড়ে খাবারের খোঁজে ঘুরছিল চিকন। বছর পনেরোর দুষ্টু ছেলেটা তাকে দেখে তাক করে ছুড়ছিল বড়ো একটা ঢিল। ভাগ্যিস লাগেনি গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে চিকন খাড়া হয়ে ফোঁস করে গর্জে উঠতেই 'বাবাগো' বলে বাগালটা মেরেছিল ছুট। ওকে আর তাড়া করেনি চিকন। ভয় দেখিয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে চেয়েছিল মাত্র।

হালদারকর্তা ব্যাপার শুনে বকেছিলেন ছেলেটাকে 'নিশ্চয় তুই ঢিলটিল মেরেছিলি সাপটাকে। গোলাপনাগ গোখরো। ও তো কাউকে নিজে থেকে কামড়াতে যায় না। খবরদার ওকে ঘাঁটাবিনে। ও আমাদের বাস্তু সাপ। ভিটের লক্ষ্মী।'

কাউকে নিজে থেকে কামড়ায় না বটে চিকন। সেই শিক্ষাই দিয়েছে তাকে বুড়ো ঠাকুর্দা কিন্তু একটা মানুষকে বাগে পেলে সে ছাড়বে কক্ষনো? চরম শাস্তি পাওনা আছে মানুষটার। যে লোকটা ধরে নিয়ে গিয়েছিল বুড়ো ঠাকুর্দাকে।

হালদারবাড়ির গৌরবের দিন গত। দিনে দিনে জীর্ণ হচ্ছে অট্টালিকা। বাগান ঘেরা পাঁচিল ধসে পড়েছে অনেক জায়গায়। পাল্লাহীন ফটক সর্বদাই হাট করে খোলা। যে-সে লোক যাতায়াত করে বাগানের ভিতর দিয়ে। ফলপাকুড়, শুকনো কাঠকুটোর লোভে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘোরে বাইরের লোক। হালদারকর্তার সাধ্য কী সবাইকে ঠেকান। কত আর নজর রাখবেন বাড়ি ও বাগানের সীমানার ভেতর বাইরের লোকের প্রবেশ আটকাতে। নেহাতই ভালো মানুষ তিনি। কায়ক্লেশে সংসার চালান। এসব নিয়ে নিত্য ঝগড়া বিবাদ মন চায় না।

এমনি এক উটকো লোক এক আশ্বিনের বিকেলে হালদার বাগানে কীসের সন্ধানে তীক্ষ্ণ চোখে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখে ফেলে বুড়ো ঠাকুর্দাকে। তৎক্ষণাৎ লোকটা তেড়ে যায় সাপটাকে।

গোলাপনাগ বংশীয় মহাসর্প সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠেছিল বিশাল ফণা তুলে। কিন্তু লোকটা আশ্চর্য কায়দায় শক্ত মুঠিতে ধরে ফেলেছিল বুড়ো ঠাকুর্দার

ঘাড়টা। ঝাঁকুনি মেরে অবশ করে ফেলেছিল সাপটাকে। তারপর ওর বিষ-দাঁত ভেঙে একটা ঝাঁপিতে পুরে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

চিকন দূর থেকে দেখেছিল ঘটনাটা। বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাই তেড়ে গিয়ে ঠাকুর্দাকে রক্ষা করতে ভরসা পায়নি। তখন সে বয়সে নেহাতই কাঁচা। হালদারবাড়িতে বাসা বাঁধার কয়েক মাসের মধ্যেই এই ঘটনা। লোকটাকে মনে আছে চিকনের। রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল মাথায়। রং কালো। পাকানো হিংস্র চেহারা।

মাস ছয়েক বাদে ওই বাগানেই ফের বুড়ো ঠাকুর্দার দেখা পায় চিকন। অতি রুগ্‌ণ অবস্থায়। ঠাকুর্দার কাছে শোনে যে ওই মানুষটা নাকি সাপুড়ে। সাপ ধরে খেলা দেখায়। খেতে দিত বটে নিয়মিত কিন্তু সর্বক্ষণ বন্দী করে রাখত ঝাঁপিতে। নড়াচড়া করা যেত না মোটে। শুধু মাঝে মাঝে দর্শকদের সামনে ঝাঁপি খুলে খোঁচা মেরে তাকে ফণা তুলতে বাধ্য করত একটুক্ষণের জন্য। এইভাবে থাকতে থাকতে একেবারে ভগ্ন স্বাস্থ্য অথর্ব হয়ে পড়ায় সাপুড়েটা ঠাকুর্দাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে। বুড়ো ঠাকুর্দা সখেদে বলত, 'কেন মানুষগুলো এত নিষ্ঠুর হয়? উঃ এ যে মৃত্যুর চেয়েও বেশি যন্ত্রণা। মানুষকে যদি, এমনি বন্দী করে রাখা হয় ছোট্ট খাঁচায়, কেমন লাগবে?'

বুড়ো ঠাকুর্দা আর বাঁচেনি বেশিদিন। সেই থেকে সাপুড়েদের সম্বন্ধে চিকনের দারুণ রাগ ও ভয়। তবে কে সাপুড়ে আর সাপুড়ে নয় তা সে বুঝতে পারে না। অবিশ্যি সেই লোকটাকে চিকন চিনে রেখেছে। মনে পুষে রেখেছে প্রতিহিংসার আগুন।

হালদার বাগানে অচেনা মানুষের উৎপাত বড্ড বেড়ে গেছে ইদানীং। কাছ দিয়ে একটা পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে বছর দুই। সে পথ দিয়ে গাড়ি চলে, বাস চলে হরদম। বাস স্টপেজ হয়েছে কাছেই। ফলে ওই রাস্তার কাছাকাছি গজিয়ে উঠছে দোকানপাট। ছোটোখাটো কারখানা। তৈরি হচ্ছে পাকা বাড়ি। পাড়া গাঁ মফস্‌সল শহরের রূপ নিচ্ছে। মানুষের বসতি বাড়ছে হালদার বাড়ির চারপাশে। বুনো জীবজন্তুরা এখন আর নিশ্চিন্তে হালদার বাগানে বিচরণ করতে পারে না। সদা সতর্ক শঙ্কিত থাকে মানুষের চোখ এড়াতে। চিকন এখন অন্ধকার না নামলে বেরয় না বাইরে পারতপক্ষে।

চিকনের উপদেশ না মেনে বেশি দুঃসাহসী হতে গিয়ে বেঘোরে মারা পড়েছে জোয়ান কেলেটা। মস্ত এক কালি গোখরো। যখন-তখন দিনের বেলাতেও

বেরুত সে। এমনকী বাগানের সীমানা পেরিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল ছেড়ে সে ঘোরাঘুরি করত। ইটভাটার কাছে দিনের বেলায় খাবার খুঁজতে গিয়ে কেলে নজরে পড়ে যায় কয়েকজন মানুষের। রে রে করে লাঠি হাতে তেড়ে আসে লোকগুলো। ফলে কেলের প্রাণটা যায়।

কয়েক বছর যাবৎ হালদার বাড়িতে এক নিভৃত গর্তে বাসা বেঁধেছিল একজোড়া কালো গোখরো। যখন মানুষজনে ভরা ছিল এই বাড়ি তখন এমনটি হবার উপায় ছিল না। গোলাপনাগ গোখরো ছাড়া অন্য সাপের অধিকার ছিল না হালদার বাড়িতে বাস করার। তাহলে তাদের প্রাণের আশঙ্কা। কিন্তু এখন এই বিশাল পোড়ো বাড়ির নানা অংশে অনেক সাপখোপেরই আস্তানা। মেনে নিতে হয়েছে চিকনকে, উপায় কী?

কেলেরা বাস্তু সাপ নয় কোনোকালে। মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলার অভ্যাস নেই ওদের। বোঝে না মানুষের হালচাল। চিকনের ভয় ছিল নিরীহ হালদার বংশের কাউকে না ছোবল মেরে বসে বদমেজাজি দুর্দান্ত স্বভাব কেলেরা। সাবধান করে দিয়েছিল ওদের 'খবরদার এমন কম্ম কদাপি নয়। তাহলে কিন্তু তোমাদের ভাগ্যে বিপদ আছে আমার হাতে।'

চিকনকে ডরাত কেলেরা। সমঝে চলত ওর হুকুম।

কেলে প্রাণ হারাবার পর কেলের বউ ভয় পেয়ে পালিয়েছিল এই বাড়ি ছেড়ে। অনেক দূরে ফাঁকা মাঠের মাঝে বটগাছের শিকড়ের নীচে গর্তে গিয়ে বাসা করেছিল। যাবার সময় চিকনকে সে বারবার বলেছিল— 'তুমিও পালাও এ ভিটে ছেড়ে। নইলে মারা পড়বে ঠিক।'

চিকন কান দেয়নি তার কথায়।

এই অট্টালিকার আনাচ-কানাচ, চারপাশের ঝোপঝাড়, সুপ্রাচীন তরু-সকল, এখানকার দৃশ্য, এখানকার মাটি জল-বায়ুর স্পর্শ গন্ধ স্মৃতির মায়া ছিন্ন করে অন্য কোথাও যাবার চিন্তা চিকন সইতে পারে না। হ্যাঁ, যদি কোনোদিন হালদার মশাইও এখান থেকে চলে যান সপরিবারে তখন না হয় সে বিষয়ে ভাবা যাবে। তাই-বা কেন? চিকন ভাবে। এ যে তারও পূর্বপুরুষের বাস্তু। ভিটের মানুষরা চলে গেলেও সে কেন যাবে? এইখানেই কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন।

তবে কেলের মৃত্যুর পর চিকন আরও সাবধানে ঘোরাফেরা করে।

টানা দুটো দিন দুটো রাত চিকন তার গর্ত থেকে বেরুতে সাহস পেল না। মাটির কাঁপনে বোঝে যে কিছু একটা ভয়ানক তাণ্ডব চলছে বাইরে মাথার

ওপরে। বিকেলের পরে হুল্লোড় কিছুটা কমে। তবু টের পায় অনেক লোকের চলাফেরা গভীর রাত অবধি। কখনো কখনো বাতাসে ভেসে আসে আগুনের আঁচ। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় চিকন গর্তের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরতে বাধ্য হল খিদের জ্বালায়। বাড়ির ভিতরে কোনো খাবার জোগাড় করতে না পেরে সে বাইরের দিকে গেল সন্তর্পণে। ব্যাপারটা কী ঘটছে জানতে তার কৌতূহলও হচ্ছিল।

চিকন উঁকি মেরে দেখল যে বৈঠকখানা ঘরটা সাফসুফ করা হয়েছে। মেঝেতে পাতা রয়েছে কয়েকটা চাটাই। রাতে বোধহয় কারা শোয় এখানে।

বাড়ির লাগোয়া চাতালে কয়েকজন লোক বসে গল্পগুজব করছে। তাদের সামনে উনুনের আগুনে রান্না চড়েছে। এই পোড়ো বাড়িতে কারা থাকতে এল? ওই বিদঘুটে আওয়াজগুলোই বা কীসের?

ধীরে ধীরে বাগানে হাজির হয়ে চিকন হতভম্ব। যেন একটা প্রলয় ঘটে গেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ সটান মাটিতে শুয়ে। প্রবল ঝড় হয়ে গেছে নাকি? কিন্তু ঝড়জলের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে সে তো টের পায় গর্তে থেকেই। তেমন তো কই অনুভব করেনি!

খানিক নজর করে চিকন বোঝে যে এ কীর্তি মানুষের। গাছগুলো গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। মাটিতে শোওয়া অনেক গাছের ডাল ও গুঁড়ি খণ্ড খণ্ড করে কাটা। প্রাচীন মহাবৃক্ষগুলির এই দুর্দশা দেখে বড়ো কষ্ট হল চিকনের। ডালপালা পাতায় ঢাকা এতকালের আড়াল আবডাল আচ্ছাদন নির্মম হাতে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে যেন। বাগানের অনেকখানি অংশ বেআব্রু নেড়া। কী ব্যাপার?

জানে না চিকন কারণটা। হালদাররা অভাবের দায়ে বাগানের অনেক গাছ বেচে দিয়েছেন শহরের এক কাঠ গুদামের মালিককে। ব্যাপারির লোকজন গাছ কাটছে। এরপর লরি বোঝাই হয়ে চালান যাবে কাঠ। হালদার বাড়িও হয়তো বিক্রি হয়ে যাবে শিগগিরি। জমি সমেত বাড়ি। কিনতে চেয়েছে একজন। সে পুরোনো অট্টালিকাখানা ভেঙে ফেলে এখানে কারখানা বানাবে। হালদার বংশের শরিকদের মধ্যে এই নিয়ে কথাবার্তা চলছে। এই পোড়ো বাড়ি আর জংলা বাগান রেখে লাভ কী? এই বাড়ির বাসিন্দা হালদারমশাই তাঁর ভাগের টাকা নিয়ে চলে যাবেন অন্য কোথাও।

একটা ব্যাঙের গন্ধ অনুসরণ করে চিকন। হঠাৎ দেখে পুকুরের দিক থেকে

এগিয়ে আসছে একটা উজ্জ্বল আলো এবং মানুষের পায়ের শব্দ টের পায়। আড়ালে আত্মগোপন করার সুযোগ মেলে না। তার আগেই টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ে চিকনের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভীত কণ্ঠে চিৎকার শোনা যায় ‘সাপ সাপ!’

অমনি হালদার বাড়ির দিক থেকে দৌড়ে আসে আলো এবং লাঠি সোটা হাতে কয়েকজন লোক। লোকগুলো ঘিরে ফেলতে থাকে সাপটাকে।

চিকন নজর করল, বাঁ পাশে একটা ঝোপ। ওই ঝোপের তলা দিয়ে পালানো যায়। কিন্তু তার আঁতে ঘা লাগল এভাবে পালাতে। এ যে কাপুরুষের কাজ।

হালদার বাড়ির বাস্তু সাপ সে। অকারণে হিংসা করা তার বারণ। তবে সে গোলাপনাগ গোখরো। দুনিয়ায় ভয় করে না কাউকে। কেউ সাধ করে তেড়ে মারতে এলে পিছু হটে লুকিয়ে পালায় না। রুখে দাঁড়ায়।

পলকে হাত দেড়েক খাড়া হয়ে ফণা মেলে দুলতে দুলতে তীব্র রাগ ও ক্ষোভে হিসহিসিয়ে গর্জে ওঠে চিকন। বলতে থাকে তার ভাষায় ‘আমায় যেতে দাও। পথ ছাড়ো। আমি তো মানুষের কিছু ক্ষতি করি না। তোমরা অযথা আমার পেছনে লেগেছ কেন?’

কিন্তু ঝগড়াটে নিষ্ঠুর মানুষগুলো চিকনের অনুরোধে কান দিল কই? সহসা এক টুকরো বড়ো ইঁট উড়ে এসে সাপটার গা ঘেঁষে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল সজোরে। লোকগুলোর কেউ ছুড়েছে ইটটা। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

চিকন বুঝল যে বৃথা চেষ্টা। এরা ভালো কথার লোক নয়। সে এবার ভয়ংকর ফুঁসে উঠে ধেয়ে গেল সামনে পথ আগলে থাকা মানুষটার দিকে। যে তাকে প্রথম দেখেছিল।

সাপের ওই রুদ্র মূর্তি দেখে লোকটা ‘বাপরে’ বলে এক লাফে ছিটকে পড়ল সাত হাত দূরে। পথ খোলা পেয়ে মুহূর্তে চিকন মাথা নামিয়ে এঁকেবেঁকে তীর বেগে ছুটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

হালদার বাড়িতে চিকন আর ফিরল না। চিরকালের মতো বিদায় নিল।

খুনে বৈজ্ঞানিক অন্তর্ধান রহস্য

খুনে বৈজ্ঞানিক অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের আগে এই রহস্য সমাধানের নায়ক বাবলু ও সিরাজ কীভাবে গোয়েন্দাগিরিতে এল তা জানানো দরকার।

বাবলু ক্লাস নাইনে পড়ে। সে ছিল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির ভক্ত। খেলাধুলায় চৌকস আর বেজায় ডানপিটে। গল্পের বই পড়ার ঝোঁক থাকলেও সময় বেশি পেত না পড়ার। ক্লাসের পড়াও যে রয়েছে! অন্তত মোটামুটি ভাবে পাস করা চাই। ডিটেকটিভ বই কিছু পড়লেও তাই নিয়ে আগে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু তার পরমবন্ধু ও সহপাঠী সিরাজের কল্যাণে বাবলু পুজোর ছুটির সময় বেশ কিছু রহস্যময় গোয়েন্দা গল্প পড়ে ফেলে চমৎকৃত হয়। মনে ধরে যায় গোয়েন্দাদের ব্যাপার-স্যাপার। এরপর ক্লাসের বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে যেতে বাবলু চুটিয়ে গোয়েন্দা গল্প পড়ে, গ্রামের লাইব্রেরি থেকে এবং এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে। মগজে গজগজ করতে থাকে গল্পের বইয়ের নানা গোয়েন্দাদের কীর্তিকলাপ। বিচিত্র সব অপরাধের বৃত্তান্ত এবং সেইসব কুকীর্তি ধরে ফেলার রকমারি কৌশল। শুধু বাঙালি গোয়েন্দাদের কথা নয়, অনুবাদের মাধ্যমে সে পড়ে ফেলে অনেক বিদেশি গোয়েন্দাকাহিনিও।

পড়তে পড়তে বাবলুর শখ চাপল যে শুধুমাত্র ছাপার অক্ষরে অন্য গোয়েন্দাদের বাহাদুরি জেনে কী লাভ? হাতে-কলমে নিজেও কাজে নামব। থিওরি থেকে প্র্যাকটিস। মনের এই প্রবল বাসনা সে জানাতে চলল বন্ধু সিরাজের কাছে।

সিরাজ লেখাপড়ায় দারুণ। ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। তবে সে গোবেচারি ভালোমানুষ নয় মোটেই। সে প্রচুর গল্পের বই পড়ে। ক্ষুরধার বুদ্ধি তার।

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে বাবলু-সিরাজদের গ্রাম পারুলডাঙা। সিরাজকে তার বাড়ি থেকে ডেকে এনে গ্রামে এক অশথ গাছতলায় বেদিতে নিরালায় বসে বাবলু ঘোষণা করল, 'আমি ডিটেকটিভ হব। ঠিক করে ফেলেছি।'

—'অ্যাঁ ডিটেকটিভ! তুই?' সিরাজ চমকায়।

—'কেন, আমি পারব না?' বাবলু ক্ষুব্ধ।

—'না না, তা বলছি না। মানে তোর তো অন্য অ্যাম্বিশন ছিল। হয় নামকরা ফুটবল প্লেয়ার হবি, নয়তো জাহাজের নাবিক। হঠাৎ মত বদলালি যে?'

—'এই লাইনটাই আমার বেশি পছন্দ হচ্ছে।' বাবলু দৃঢ় স্বরে জানায়।

—'কার কোথায় প্রতিভা লুকিয়ে থাকে সবসময় কি আগে থেকে তা টের পাওয়া যায়? বুঝলি সুযোগ আর চেষ্টায় কত মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়...'

গত বার্ষিক পরীক্ষার রচনার জন্য মুখস্থ করা কটা লাইন তাক বুঝে ঝেড়ে দেয় বাবলু।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ তা তো বটেই।' সায় দেয় সিরাজ।

বাবলু বলে চলে, 'এই যেমন ধর জগন্নাথপুরের ভোম্বল যে কোনোদিন মিলিটারি হয়ে ইউনিফর্ম পরে, বুট মশমশিয়ে গাঁয়ে ঢুকবে, ভেবেছিল কেউ? ওর চেহারাটা লম্বা চওড়া ছিল বটে, কিন্তু নেহাতই গোবেচারি ক্যাবলা। গাঁয়ের লিকলিকে ছোঁড়াগুলো অবধি ওর পেছনে লাগত, ওর ওপর মাতব্বরি ফলাত। সৎ মায়ের গঞ্জনায় বেচারা বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে আর্মিতে ঢোকে। কোনোমতে টিকেও যায়। আর এখন? গাঁয়ে ওর কী খাতির। ও নিজে ডেকে দুটো কথা বললে ওর সমবয়সিরা গদগদ হয়ে যায়। ছুটিতে বাড়ি এলে কতজন আসে ওর খোঁজখবর নিতে। ভোম্বলের এখন তলোয়ারের মতন মোচ। আর কী স্মার্ট চালচলন। বাংলা হিন্দি ইংরিজিতে বুলি ছোটায়। সত্যি সত্যি একটা যুদ্ধও নাকি লড়েছে। ভোম্বলের সৎ মা এখন একদম টাইট। ও বাড়ি এলে যেন কৃতার্থ। চা চাইলেই বানিয়ে দেয়।'

সিরাজ মনে মনে ভাবে, 'ইস গাদাগাদা গোয়েন্দা গল্প গিলে বাবলুর মাথাটি বিগড়েছে।' বাইরে অবশ্য সে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে, 'তা কোনো ট্রেনিং নিবি নাকি এ লাইনে?'

—'কিস্‌সু দরকার নেই।' বাবলু উড়িয়ে দেয় প্রস্তাব। বলে, 'দেশি বিদেশি সব ডিটেকটিভ একটি মোদ্দা বাণী দিয়েছেন— চোখ কান খোলা রাখো।

মগজের বুদ্ধিকে খেলাও। ব্যাস, তাহলেই বেশির ভাগ রহস্যের সমাধান মিলবে। আমি এই উপদেশই ফলো করব।'

সিরাজ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'বেশ তবে কাজে নেমে পড়। আপিস কোথায় করবি? কলকাতায়?'

—'না। এখুনি কলকাতায় যাওয়া অসুবিধে, থতমত খায় বাবলু, ভাবছি আপাতত এখানেই।'

—'রাইট।' সিরাজ উৎসাহে দেয়, 'এখানেই হাতেখড়ি হোক। পাড়াগাঁ বলে অবহেলা করিস না। আমাদের পারুলডাঙায় আর আশেপাশের গ্রামে কি রহস্যের অভাব? কত অপরাধ ঘটছে এখানে তার সব কি কিনারা হয়? বড়ো শহরে কিছু ঘটলেই খবরের কাগজে বেরোয়। তাই লোকে জানতে পারে। গ্রামদেশের বেশির ভাগ খবরই কাগজে ছাপে না। গ্রামের বহু রহস্যজনক ঘটনা রীতিমতো জটিল। অপরাধবিদ্যায় এখানকার লোকের এলেম কিছু কম? ট্রেনিং পিরিয়ডে সে সব রহস্যের কিছু সমাধান করতে পারলে তোর ভিত খুব মজবুত হবে।'

—'ঠিক বলেছিস।' বাবলু ভারি খুশি।

সিরাজ বলল, 'তা অ্যাসিস্ট্যান্ট কাকে নিচ্ছিস?'

—'অ্যাসিস্ট্যান্ট!'

—'হ্যাঁ। একজন সহকারী না থাকলে কি গোয়েন্দাকে মানায়? বইয়ে দেখিসনি, দেশি বিদেশি প্রায় সব বাঘা বাঘা ডিটেকটিভের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে। নইলে যে গোয়েন্দার দর কমে যায়।'

—'তা বটে। কিন্তু আমি সহকারী পাব কোথায়?' একটু দমে যায় বাবলু।

—'আমাকে দিয়ে চলবে?' যেন দ্বিধাভরে জিজ্ঞেস করে সিরাজ।

—'যা, ঠাট্টা করছিস?'

—'ঠাট্টা নয় রে। সিরিয়াসলি বলছি।'

—'তুই আমার সহকারী হবি? খেপেছিস? তোর যা বুদ্ধি, আর এ লাইনে পড়াশোনা, বরং আমার সহযোগী হতে পারিস। মানে আমরা হব জোড়া ডিটেকটিভ। পার্টনার।'

—'না ভাই, আমার সহকারী হওয়াই ভালো। পার্টনার হয়ে কাজ নেই। তোর নাম হলে আমার নামটাও জানবে লোকে। দরকার হলে আমি সাধ্যমতো বুদ্ধি জোগাব, হেল্প করব।'

বাবলু মনে মনে হাঁপ ছাড়ে। কারণ সিরাজ পার্টনার হলে সে কি আর পাত্তা

পেত? সিরাজ নামে সহকারী, আর কাজে সহযোগী হলেই তার সবচেয়ে সুবিধে।

বাবলু বিপুল উৎসাহে রহস্য সন্ধানে নেমে পড়ে গোয়েন্দাগিরিতে হাত পাকাতে।

দিন কয়েক বাদে, এক ছুটির দিন সকালে বাবলু হাজির হল সিরাজের কাছে। তার চোখ মুখ থমথম করছে। সিরাজ বোঝে যে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। কারণটা জানতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। বাবলু উত্তেজিত গলায় বলে, 'জানিস গত পরশু আমাদের গ্রামের লাইব্রেরি থেকে একটা গল্পের বই হারিয়েছে। খুব সম্ভব চুরি হয়েছে। কেসটা আমি তদন্ত করব ঠিক করেছি। উদ্ধার করব বইটা।'

—'কী বই?' জিজ্ঞেস করে সিরাজ।

—'নাম: খুনে বৈজ্ঞানিক। লেখক : মেঘনাদ। পড়েছিস বইটা?'

—'না।'

—'উঃ দারুণ বই। ছোটোদের রহস্য উপন্যাস। পড়তে পড়তে যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। গা শিউরে ওঠে। মাত্র তিন মাস আগে কেনা হয়েছে বইটা। গ্রাহকদের মধ্যে, মানে আমাদের মতো ছেলেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে গেছে বইটা নিয়ে। যে নিচ্ছে বইটা সে নিজে তো পড়ছেই কয়েকবার, তার বাড়ির অন্য সব ছোটোরাও পড়ছে। মায় সে-বাড়ির বেশির ভাগ বড়োরা অবধি বইটা না পড়ে ছাড়ছে না। ভজা তো আবার লুকিয়ে ভাড়া খাটিয়েছে বইখানা।'

—'ভাড়া? কী রকম?' সিরাজ অবাক।

—'ভজা নিজে পড়ে, তার বাড়ির লোকদের পড়া হয়ে গেলে লুকিয়ে ওর পাড়ার কেষ্টকে বইটা পড়তে দিয়েছিল। শর্ত, বইটা মাত্র একবেলা রাখতে পারবে পড়তে। আর তার বদলে ভজাকে দুটো বেগুনি খাওয়াতে হবে, বদ্যির দোকানে গরম ভাজা। আর এ কথা কাউকে বলা চলবে না। বেচারি কেষ্ট তাড়াতাড়ি 'খুনে বৈজ্ঞানিক' পড়ার লোভে সেই শর্ত মেনে বেগুনি খাইয়েছে ভজাকে। লাইব্রেরি থেকে বইখানা পেতে তার তখনও ঢের দেরি। ওই বই নিয়ে লাইব্রেরির সামনে একদিন তুমুল ঝগড়া লাগে। তখনই কেষ্ট ফাঁস করে দেয় ভজার কীর্তি।

লাইব্রেরিয়ান গোপালবাবু তাই নিয়ম করেছেন যে অন্য বই সাত দিন রাখতে পেলেও তিনদিনের বেশি রাখতে পারবে না ওই বইটা। নেহাত আমার সঙ্গে

গোপালবাবুর একটু বেশি জানাশোনা আছে তাই লাকিলি বইখানা আসা মাত্র পড়তে পেয়েছিলাম। ফের পড়ব বলে ডিমান্ড দিয়ে রাখি চার দিন আগে। ভেবেছিলাম এবার পেলে তোকেও পড়াব।'

—'কী ভাবে হারাল বইটা?' প্রশ্ন করে সিরাজ।

—'গতকাল একজন বইটা ফেরত দেয়। সেইদিনই বিজয়ের নেবার পালা। লাইব্রেরিয়ান ওঁর টেবিলের একপাশে রেখে দেন বইটা। ঘণ্টাখানেক বাদে বিজয় এসে চাইলে দেখা যায় যে নেই। উধাও। অনেক খুঁজেও আর বইটা পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে গোপালবাবু ওঁর খাতায় বইটার নামের পাশে লিখে দিয়েছেন— লস্ট। বললেন, অনেক বই-ই এমনি হারায়। বিশেষ করে যেগুলোর চাহিদা বেশি। কখন যে কে টুক করে তুলে নিয়ে যায়! আমি একা আর কত নজর রাখব? যা হোক আমি কিন্তু ছাড়ছি না।'

—'কীভাবে এগুবি ভেবেছিস?' সিরাজের কৌতূহল।

—'শুধু ভাবিনি। কাজেও এগিয়েছি খানিকটা। গোপালবাবুর থেকে 'খুনে বৈজ্ঞানিকে'র ডিমান্ড লিস্টটা চেয়ে নিয়েছি। ওটা দেখলেই বোঝা যাবে কার কার এই বইটা পড়তে বিশেষ আগ্রহ। খুব সম্ভব তাদেরই কেউ সরিয়েছে। এদের পেছনেই আমি তদন্ত করব। মানে ইনভেস্টিগেশন।'

—'কজন বইটা চেয়ে নাম লিখিয়েছে?'

—'গত পরশু অবধি তেরোজন ছিল ডিমান্ড লিস্টে। এর মধ্যে দুজনকে বাদ দিচ্ছি। বিজয় আর আমি। বাকি এগারোজন যে কেউ অপরাধী হতে পারে।'

—'কীভাবে ইনভেস্টিগেশন করবি?'

—'উপায় একটা ভেবেছি।' বাবলুর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফোটে কিন্তু আর মুখ খোলে না। বোঝা গেল যে সে তার তদন্ত পদ্ধতি আপাতত গোপন রাখতে চায়।

সিরাজও এই নিয়ে আর জোরাজুরি করে না। শুধু বলে, 'বইটা ফেরত দেবার ঘণ্টাখানেক বাদে আবিষ্কার হয় যে বই উধাও। তাই তো?'

—'হুঁ।'

—'তাহলে ওই সময়ের মধ্যে যারা বই নিয়েছে তাদের মধ্যে একবার খোঁজ করে দেখতে পারিস। যদি কেউ ভুল করে বইটা নিয়ে গিয়ে থাকে।'

বাবলু বলল, 'ভুল করলে নিশ্চয়ই দু-একদিনের মধ্যেই ভুলটা ধরা পড়বে। তখন বইটা ফেরত দিয়ে যাবে।'

—'অত তাড়াতাড়ি ভুল ধরা নাও পড়তে পারে', সিরাজের সংশয়, 'অনেকে লাইব্রেরি থেকে বই এনে অনেক দিন স্রেফ ফেলে রাখে না-উল্টিয়ে।'

—'বেশ তাদের কাছে খোঁজ করব।' বাবলু সায় দেয়।

এরপর দুই বন্ধুতে কয়েকদিন আর এ বিষয়ে কথা হয় না। বাবলুর সদাই কেমন ব্যস্তসমস্ত ভাব। সিরাজ জানে ও ঠিক নিজেই বলবে তদন্তের ফলাফল।

পাঁচদিন বাদে স্কুল ছুটির পর বাবলু সিরাজের সঙ্গ ধরল। খানিক পাশাপাশি হাঁটে দুজন।

—'খোঁজ পেলি বইটার?' সিরাজ নিজেই জানতে চায়।

—'নাঃ। বই চেয়ে যারা নাম লিখিয়েছিল তাদের এগারো জনকে বাজিয়ে দেখেছি। কিন্তু তেমনি কোনো ক্লু পাইনি। অবশ্য একটা কেস বাদে।'

—'কীভাবে বাজালি? সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলি নাকি?'

—'খেপেছিস। আমি কি অতই বুদ্ধু। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে কি চোর স্বীকার করবে? আমি অন্য কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওই বইটার কথা তুলেছি। বইয়ের গল্পটা ওরা জানে কিনা পরখ করেছি। যে বইটা পড়েনি তার পক্ষে গল্পটা না জানাই স্বাভাবিক। তাই না?'

—'বটেই তো। তারপর?'

—'কারো সঙ্গে খেজুরে আলাপ করতে করতে ফট করে বলেছি, আচ্ছা ডক্টর মুস্তাফির কোন চোখটা জানি কাচের ছিল?'

—'ডক্টর মুস্তাফি কে?'

—'রতনগড়ের মালিক। আধা উন্মাদ নিষ্ঠুর অতি প্রতিভাবান এক সায়েনটিস্ট। ওই তো খুনে বৈজ্ঞানিক। যে মানুষ জাতটাকে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন দেখে। একটার পর একটা মানুষকে সে রতনগড়ে নিয়ে যায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে গোপনে। তাদের ওপর অদ্ভুত সব এক্সপেরিমেন্ট চালায়। তার ফলে বন্দি মানুষগুলোর প্রাণ বলি দিতেও তার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। আবার কাউকে জিজ্ঞেস করেছি, আচ্ছা ডক্টর মুস্তাফির সেই ভয়ংকর শিকারি কুকুরটার কী নাম যেন? এমনি সব ছোটোখাটো কিন্তু অব্যর্থ ফাঁদ-পাতা প্রশ্ন। গল্পটা ভালো করে না জানলে যার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।'

—'বাঃ দিব্যি কৌশল করেছিলি। তা কী রকম উত্তর পেলি?'

—'দশজন আমার প্রশ্নের জবাবই দিতে পারেনি। তাদের ভেতর সাত জন বলেছে তারা গল্পটার কিছুই জানে না। তবে শুনেছে অন্যের মুখ থেকে। এখন

নিজে পড়তে চায়। ডিমান্ড দিয়ে রেখেছে। কিন্তু লম্বু খোকা ঠিক উত্তর দিয়ে দিল।

'অমনি ওকে চেপে ধরলাম। কী করে জানলি তুই? বইটা তো এখনও লাইব্রেরি থেকে পাসনি। তখন বলে কিনা, বইটা ও পড়ে ফেলেছে ছোটনের বাড়িতে বসে। খুব তাড়াহুড়ো করে লুকিয়ে। ও নাকি ছোটনের বাড়ি গিয়েছিল। দুজনে একসঙ্গে ট্যুইশনি পড়তে যাবে, তাই। ছোটন তখন চান করছে। তারপর ভাত খেল। ছোটনের খাটের ওপর বইখানা ছিল। দেখেই লম্বু খোকা বইটা পড়তে শুরু করে। গোগ্রাসে গিলে শেষ করে। কিন্তু নিজের বাড়িতে আনতে পারেনি বইটা। দেয়নি ছোটন। আর একবার ধীরেসুস্থে পড়ার তার ভারি ইচ্ছে। খোকা বলল, ও শুনেছে যে বইটা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। লাইব্রেরি থেকে হারিয়েছে। খুব আপসোস করল তাই। আমার কিন্তু ধারণা ওটা ওর ভান। ওই কালপ্রিট। নইলে অত নার্ভাস হল কেন? ওই চুরি করেছে বইখানা। আমার প্রশ্নের জবাবটা বেফাঁস বেরিয়ে যেতে ওই সব বানিয়ে বানিয়ে বলল। আবার বলে কিনা লাইব্রেরিয়ানকে বলিস না আমি বইটা একবার পড়ে ফেলেছি। তাহলে বই খুঁজে পেলে আমায় আর দিতে চাইবে না। যারা মোটে পড়েনি তাদের আগে দেবেন।'

সিরাজ ভেবে বললে, 'খোকার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ছোটন তো নিয়েছিল বইটা। ওই ঘরেই তখন ছিল কি বইটা? ছোটনকে জিজ্ঞেস করিস। তুইও তো একবার পড়েছিস কিন্তু সাধ মেটেনি। তাই ফের পড়তে চাইছিস।'

বাবলু জোর দিয়ে বলে, 'উঁহু, খোকাটা মিটমিটে শয়তান। ও একবার জগনের স্ট্যাম্পের অ্যালবাম দেখতে দেখতে দুটো স্ট্যাম্প সরিয়েছিল। পরে ধরা পড়ে যায়। চুরিবিদ্যেয় বেটা পোক্ত। আমি ওকে নজরে রাখছি। সুযোগ পেলেই ওর ঘরে গিয়ে ওর বইটই সার্চ করে দেখব গোপনে। জানিস সেদিন বই হারানোর সময় ও লাইব্রেরিতে ছিল কিছুক্ষণ।'

—'তাই নাকি?' এবার সিরাজও সন্দিগ্ধ। সে বলে, 'আচ্ছা যারা ওই দিন, ওই সময়ে বই ইস্যু করেছিল তাদের কাছে খোঁজ নিয়েছিলি? মানে যদি কেউ ভুল করে নিয়ে গিয়ে থাকে?'

—'হ্যাঁ নিয়েছি। মোট দশজনের কাছে। লাভ হয়নি। উল্টে বিমানস্যারের কাছে আচ্ছা ধ্যাতানি খেলাম এই নিয়ে।'

—'বিমানস্যার? মানে আমাদের বাংলায় টিচার বিমানবিহারী বসু?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ। আর কটা বিমানস্যার আছে পারুলডাঙায়।

—'কেন কী বলেছিলি?'

—'কী আবার। সবাইকে যা বলেছি— একটু দেখবেন স্যার খুঁজে, লাইব্রেরির একটা গল্পের বই, নাম 'খুনে বৈজ্ঞানিক', আপনার বইয়ের সঙ্গে মিশে কি চলে এসেছে ভুলে? ব্যাস শুনেই উনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। এমনিই তো রাগি মানুষ। কড়া গলায় বললেন, আমি সেদিন ভুল করে কোনো বেশি বই আনিনি। বরং ভুল করে আমার একটা ইস্যু করা বই সেদিন ফেলে এসেছিলাম লাইব্রেরিতে। পরে গিয়ে নিয়ে আসি বইটা। বাংলা প্রবন্ধের বই। তোমায় কে পাঠিয়েছে? লাইব্রেরিয়ান? ওর তো যত সন্দেহ আমার ওপর। যত্ত সব—'

—'বাপরে। আমি তো পালিয়ে বাঁচি। কী মেজাজ!'

—'উনি বুঝি বই ফেলে এসেছিলেন ভুলে?'

—'হ্যাঁ। লাইব্রেরিয়ান গোপালবাবু বললেন, বিমানস্যার প্রায়ই বই ইস্যু করে লাইব্রেরিয়ানের টেবিলে রাখেন। তারপর পত্রিকা-টত্রিকা পড়ে বই ভুলে ফেলে রেখে চলে যান। উনি তো দুটো বই পান একসঙ্গে। কখনো একটা, কখনো বা দুটো বই-ই ফেলে রেখে গেছেন। পরে খেয়াল হলে এসে নিয়ে যান। এই নিয়ে গোপালবাবু একবার অনুযোগও করেছেন বই হারিয়ে যাবার ভয়ে। তাই বিমানস্যার গোপালবাবুর ওপর চটে ছিলেন। সুযোগ পেয়ে আমার ওপর ঝাল ঝাড়লেন। যাকগে, লম্বু খোকাকে আমি ওয়াচ করব। আর ভেবেছি, যেসব ছেলে সেদিন লাইব্রেরিতে ছিল তাদের মধ্যে কারো চুরিটুরি করার রেকর্ড থাকলে তাদের ওপরেও নজর রাখব। মোট কথা 'খুনে বৈজ্ঞানিক' অন্তর্ধান রহস্য আমি সল্‌ভ করবই।' দৃঢ়স্বরে নিজের সংকল্প জানিয়ে বাবলু বিদায় নিল।

কয়েক দিন বাদে। সন্ধের পর গ্রাম নিঝুম হয়ে গেছে। সিরাজ পড়ছিল নিজের ঘরে বসে জানলার কাছে। বাবলুর ডাক শুনে বেরিয়ে এল। আজ স্কুলে বাবলুর সঙ্গে তার বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। এমন অসময়ে হঠাৎ? সিরাজের ঘরে ঢোকে দুজনে। ফাঁকা ঘরে একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বাবলু বলে ওঠে, 'জানিস ''খুনে বৈজ্ঞানিক'' পাওয়া গেছে।' কিন্তু এমন একটা দারুণ খবর ঘোষণা করার সময়েও তার চোখে-মুখে ফোটে না কোনো উচ্ছ্বাস বা আনন্দ।

—'কী করে?' সিরাজ উত্তেজিত।

নিস্পৃহ বাবলুর জবাব, 'বিমানস্যার নাকি নিয়ে গিয়েছিলেন ভুল করে। আজ বিকেলে লাইব্রেরিতে এসে ফেরত দিয়ে গেলেন।'

—'ভুল করে! কিন্তু তোকে যে বলেছিলেন...'

—'হ্যাঁ, সেদিন নিজের ইস্যু করা একটা বই ভুল করে লাইব্রেরিতে ফেলে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু গতকাল রাতে নিজের ঘরে টেবিলে বইপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে আবিষ্কার করেন 'খুনে বৈজ্ঞানিক'। কী করে যে বইটা ওখানে এল উনি নাকি বুঝেই উঠতে পারছেন না। তবে মনে করছেন ওঁরই ভুল। কারণ যে বইটা ফেলে এসেছিলেন সেটা আর 'খুনে বৈজ্ঞানিক'-এর সাইজ আর বাঁধাইয়ে ভীষণ মিল। দুটোর মলাটের রং-ও এক। হলদে।'

—' ''খুনে বৈজ্ঞানিক'' বাঁধানো বই?'

—'হুঁ। মাস দুয়েকের ভেতর অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বইটার মলাট ছিঁড়ে যায়, বাঁধাই আলগা হয়ে যায়। তখন বাঁধাতে হয়। মলাটের ওপর অবশ্য বড়ো বড়ো করে বইয়ের নাম লেখা আছে।'

—'কীভাবে হল ভুলটা?'

—'বিমানস্যার বলছেন যে লাইব্রেরির বইয়ের সঙ্গে আরও কয়েকটা বইখাতা নিজের বাড়ি ফিরে পড়ার টেবিলে নামিয়ে রেখেই উনি একবার মুদির দোকানে যান দেশলাই কিনতে। বাড়িতে বলে দিয়েছিল দেশলাই কিনে আনতে, ভুলে গিয়েছিলেন আগে কিনতে। বাড়ি ফিরেই মনে পড়ে। দোকান থেকে এসে লাইব্রেরির বই দুটো আলাদা করতে গিয়ে দেখেন দুটোর মধ্যে একটা বই রয়েছে। অন্য বইটার জন্যে তেমন খোঁজাখুঁজি না করে তক্ষুনি ছোটেন লাইব্রেরিতে। আগেও এমন কাণ্ড হয়েছে। বইটা পেয়েও যান লাইব্রেরিয়ানের টেবিলে। এখানে অবশ্য স্যারের মনে হচ্ছে, প্রথমবার বাংলা প্রবন্ধর বদলে 'খুনে বৈজ্ঞানিক'ই এনেছিলেন। আর তাড়াহুড়ো করে রাখার সময় বাড়িতে টেবিলে 'খুনে বৈজ্ঞানিক' সরে গিয়ে অন্য বইয়ের ভিতর মিশে যায়। জানিস বিমানস্যার কৌতূহলী হয়ে কাল রাতে 'খুনে বৈজ্ঞানিক' পড়ে ফেলেছেন। আজ ফেরত দেবার সময়, এমন উদ্ভট যাচ্ছেতাই বাল্যশিক্ষার অনুপযুক্ত বই লাইব্রেরিতে রাখা উচিত নয়, এইসব উপদেশ ঝেড়ে গেলেন লাইব্রেরিয়ানকে। তবে বইখানা ভুল করে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে কিঞ্চিৎ লজ্জাও প্রকাশ করেছেন। তখন আমি লাইব্রেরিতে ছিলাম, তাই শুনলাম সব।'

সিরাজ ভুরু কুঁচকে বলল, 'বিমানস্যার প্রথমবারে ভুলে 'খুনে বৈজ্ঞানিক'

নিয়ে গিয়েছিলেন হতে পারে। তাড়াতাড়ি রেখে বেরুনোর কারণে বইটা পাশে সরে গিয়েছিল, তাও সম্ভব। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে বইখানা স্যারের নজরে পড়ল না? যখন ওটা ওঁর টেবিলেই ছিল। এটা কেমন জানি অদ্ভুত ঠেকছে। উঁহু, মনে হচ্ছে ব্যাপার অন্য কিছু।'

—'আচ্ছা বিমানস্যারের ছেলে নন্তু কি ''খুনে বৈজ্ঞানিক''-এর জন্যে ডিমান্ড দিয়ে রেখেছে?'

—'হ্যাঁ। ওর নম্বর ছিল সাত।' জানায় বাবলু।

—'তুই ওর কাছে বইটার কথা পেড়েছিলি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কী বলেছিল নন্তু?'

—'ও বলেছিল বইখানা ও দেখেছে, কিন্তু হাতে পায়নি। পড়াও হয়নি। গল্পটা ও জানে না। তবে শুনেছে দারুণ গল্প।'

সিরাজ বলল, 'বলছিস ''খুনে বৈজ্ঞানিক''-এর মলাটের ওপর নাম লেখা আছে। দুদিকেই?'

—'না, শুধু সামনের দিকে মলাটের ওপর।'

সিরাজ বলে, 'দ্যাখ, বাবলু, আমার মনে হচ্ছে নন্তু বইটা সরিয়েছিল স্যারের টেবিল থেকে। লাইব্রেরিয়ানের টেবিলে 'খুনে বৈজ্ঞানিক' নিশ্চয়ই উলটিয়ে রাখা ছিল। স্রেফ বইটার সাইজ আর মলাটের রং দেখে স্যার ওটা প্রবন্ধের বই ভেবে ভুলে নিয়ে আসেন। নামটা আর পড়েননি। লাইব্রেরিতে নির্ঘাত স্যারের বইখাতার গায়েই ছিল 'খুনে বৈজ্ঞানিক'। বিমানস্যার বাড়ি এসে বইটই নামিয়ে রেখে দোকানে যেতেই নন্তু ঠিক ওই ঘরে ঢুকেছিল। নন্তু 'খুনে বৈজ্ঞানিক'-এর চেহারা আগে দেখেছিল, মানে বাঁধাইয়ের পরে। তাতেই সন্দেহ হয় মলাট দেখে। স্যার ধপ করে বইটই নামাবার ফলে হয়তো 'খুনে বৈজ্ঞানিক' পাশে উলটিয়ে পড়ে। অর্থাৎ এবার সামনের দিকটা ওপরে। যেদিকে নাম লেখা আছে বইয়ের। যেভাবেই হোক 'খুনে বৈজ্ঞানিক' দেখে চিনে ফ্যালে নন্তু। বোঝে বাবা ভুল করে এনেছে। এমন ভুল তো হরদম হয় স্যারের। সঙ্গে সঙ্গে নন্তু বইখানা সরায়। নিয়ে কেটে পড়ে ঘর থেকে। তাই বিমানস্যার দোকান থেকে ফিরে আর বইটা দেখেননি। ভাবেন, আর একখানা বই ফেলে এসেছেন ভুলে। পড়া শেষ হয়ে গেলে কদিন বাদে নন্তু 'খুনে বৈজ্ঞানিক' ফের বাবার টেবিলে রেখে দেয়। তারপর স্যারের নজরে পড়ে বইটা।'

সিরাজ বলে, 'শোন বাবলু তুই নন্তুকে চেপে ধর। দ্যাখ ও অপরাধ স্বীকার করে কিনা? করবে না হয়তো। তখন দরকার হলে ভয় দেখাবি। বলবি, নন্দপুরের সাধুবাবা গুণে বলেছিলেন যে একটা ছেলে 'খুনে বৈজ্ঞানিক' বইটা চুরি করেছে। বলবি, তুই সাধুবাবার কাছে গিয়েছিলি বইটা হারাবার পর হদিস জানতে। বইটা আর একবার পড়ার জন্যে খুব আশা করেছিলি কিনা। হারিয়ে যেতে মন ভারি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই সাধুবাবার কাছে গিয়েছিলি যদি চোরকে ধরে বইখানা উদ্ধার করা যায়, সেই মতলবে। সাধুবাবার এমনি অলৌকিক ক্ষমতা আছে শুনেছিলি। সাধুবাবা এই চোরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে নন্তুর চেহারা বয়স অবিকল মিলে যাচ্ছে। আর কাউকে অবশ্য এখনও বলিসনি কথাটা। দ্যাখ, ও কী বলে?

'আর এই অস্ত্রে যদি কাজ না হয়, ওকে বলবি, বিমানস্যারকে বলে দেব তুই "খুনে বৈজ্ঞানিক" পড়ার জন্য নাম লিখিয়ে রেখেছিস। সব্বাই জানে বিমানস্যার রহস্য ডিটেকটিভ গল্পের ওপর কী ভীষণ খাপ্পা। আর নন্তু ওর বাবাকে যমের মতন ভয় করে।'

পরদিন বিকেলে নদীর ধারে বসে আছে সিরাজ। দেখল যে বাবলু হনহন করে আসছে। বাবলু সিরাজের কাছে এসেই উৎফুল্ল স্বরে জানাল, 'তুই ঠিক ধরেছিস। তোর প্রথম অস্ত্রেই কেল্লা ফতে। নন্তুই হাতিয়েছিল বইখানা। বিমানস্যার বই রেখে দোকানে গেছেন, সেই ফাঁকে। নন্তু তখন ঢুকেছিল স্যারের পড়ার ঘরে। বইটার চেহারা দেখেই ওর সন্দেহ হয়। বইটা উলটে দ্যাখে স্বয়ং 'খুনে বৈজ্ঞানিক'। ব্যাস তক্ষুনি বইটা নিয়ে সরে পড়ে। বোঝে, বাবা এটা ভুল করে এনেছে অন্য বই ভেবে। নন্তু দু-দুবার পড়ে ফেলেছে বইটা।

—'আমি যখন ইনভেস্টিগেশনে গিয়ে ওর কাছে 'খুনে বৈজ্ঞানিক' হারানো মানে চুরি যাবার কথা তুলি, নন্তু নার্ভাস হয়ে সেদিনই বইটা রেখে দেয় ওর বাবার টেবিলে অন্য বইয়ের ভেতর গুঁজে। তবে বিমানস্যার 'খুনে বৈজ্ঞানিক' আবিষ্কার করেন আরো তিনদিন বাদে।'

—'স্কুলে নন্তুকে জিজ্ঞেস করলি বুঝি?' জানতে চায় সিরাজ।

—'হ্যাঁ টিফিনের সময় ধরেছিলাম ওকে। নন্দপুরের সাধুবাবার কথা বলতেই ঘাবড়ে গিয়ে সব কবুল করে ফেলল। জানিস, নন্তু কাল আমায় বদ্যির দোকানের ভেজিটেবল চপ খাওয়াবে বলেছে। মানে ঘুষ আর কি? আমার মুখ বন্ধ করতে। যাতে ওর বাবাকে না বলে দিই বা আর কাউকে।'

—'অ্যাঁ, ভেজিটেবল চপ! শুধু তোকে? আর অ্যাসিস্ট্যান্ট বাদ?'

—'আরে না না। তোকেও খাওয়াতে হবে বলে রেখেছি। বলেছি, আমি ছাড়া কেবলমাত্র তুই জানিস ব্যাপারটা। তোর মুখও বন্ধ করা দরকার।'

—'যাক এবার তোর গোয়েন্দাগিরি সাকসেসফুল।' উৎসাহ দেয় সিরাজ।

—'ধুৎ।' বাবলুর আপসোস, 'আমি আর ধরতে পারলাম কই? বিমানস্যার ভুল করলেন। আবার নিজেই নিজের ভুল বুঝে বই ফেরত দিয়ে গেলেন। আমার ক্রেডিট কোথায়?'

সিরাজ বলল, 'তোর ক্রেডিট আছে বইকী। তুই তদন্তে নেমে নন্তুকে ওই বইটার কথা জিজ্ঞেস না করলে ও ঠিক গাপ মেরে দিত 'খুনে বৈজ্ঞানিক'। মোটেই বাবার টেবিলে আর ফেরত রেখে আসত না।'

—'তা হতে পারে।' বাবলু কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হয়।

সিরাজ বাবলুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'আর কেস করে তোর ফিজও মিলল।'

—'ফিজ? ফিজ আবার কী পেলাম?' বাবলু ভুরু কোঁচকায়।

—'কেন ভেজিটেবল চপ। ওটা অবশ্য লাইব্রেরি কমিটিরও খাওয়ানো উচিত ছিল তোকে। যাকগে এবার ছেড়ে দে। পরে রেট বাড়াস।'

—'ঠিক বলেছিস।' বাবলু একগাল হাসে।

ছোটকার পাহারা

'কেন? মেয়েরা যাবে না কেন?' ছোটকা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। রামুকাকা বললেন, 'মানে প্রসেশনের সময় যা ভিড় ধাক্কাধাক্কি হয়, মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ঠিক সেফ নয়।'

ছোটকা বাঁকা হেসে বললেন, 'হোপলেস। দেখ রামুদা, সেই আগের যুগ আর নেই। মেয়েরা এখন ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কী-না করছে? কোথায়-না যাচ্ছে? চৌধুরীবাড়ির মেয়েরা এখন সবাই প্রায় মডার্ন। এরা এখন শহরে থাকে। ট্রামে বাসে চলাফেরা করে। সিনেমা থিয়েটার যায়, মার্কেটিং করে। আর গাঁয়ের ভিড়ে সামান্য ঘেঁষাঘেঁষিতে এরা কি মুচ্ছো যাবে? যত ভুয়ো প্রেস্টিজ। বরং শহরের চাইতে গাঁয়ের লোক মহিলাদের অনেক বেশি সম্মান দেয়। এই প্রসেশনে হৈ চৈ করে যেতে ওদের কি সাধ হয় না? যাদের ইচ্ছে আছে চলুক-না আমাদের সঙ্গে।'

এখন উপলক্ষটা বলি।

চৌধুরীবাড়িতে রাসপূর্ণিমায় প্রতি বছর ঘটা করে পুজো হয়। সেইসঙ্গে চৌধুরীবাড়ির সামনের মাঠে ছোটোখাটো মেলা বসে। চৌধুরীরা একদা এই অঞ্চলের জমিদার ছিল। অতি প্রাচীন বিশাল চৌধুরীবাড়ি। তাদের রাসপূর্ণিমার উৎসব আর মেলার বয়সও শখানেক বছর হল। এখন আর চৌধুরীদের জমিদারি নেই। তবে এখনও নামডাক আছে যথেষ্ট। দেশের বাড়িতে থাকেন কেবল কয়েকজন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তবে বছরে একবার রাস উৎসবে এই দেশের বাড়িতে জমায়েত হয় চৌধুরীবংশের অনেকে।

তিন দিনের উৎসব। রোজই একবার চৌধুরীবাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে মন্দির

থেকে বিগ্রহদের মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির বাইরে মাঠে শ দুই গজ দূরে রাসমঞ্চে। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ পুজোটুজোর পর ফের শোভাযাত্রা করে ঠাকুররা ফেরেন তাঁদের আগের দেবালয়ে।

আজ পুজোর প্রথম দিন। রাত নেমে গেছে। বাড়ির মন্দিরে আরতি চলছে। একটু বাদেই ঠাকুর নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোবে। মন্দির থেকে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। মন্দিরের সামনে পাঁচিল ঘেরা শান বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্বরে লোক গিসগিস করছে। চৌধুরীবাড়ির নানা বয়সি পুরুষদের বেশির ভাগই এই শোভাযাত্রার সঙ্গে যায়। ঠাকুর রাসমঞ্চে পৌঁছে গেলে তারা ফিরে আসে। বাড়ির মেয়েরা চত্বরের ধারে উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা বেরিয়ে যাওয়া দেখে। সঙ্গে যায় না।

ছোটকা অর্থাৎ খুদু বুধু মণি টিয়াদের ছোটোকাকা দূর দেশে থাকেন। এক নামি কোম্পানির জাঁদরেল অফিসার। অনেক বছর বাদে এসেছেন রাসে। শোভাযাত্রার ঠিক আগে ফেউ তুলেছেন— বাড়ির মেয়েদেরও শোভাযাত্রায় যেতে বাধা কীসের?

কমবয়সি বউ-ঝিদের মুখ দেখে বোঝা গেল যে, শোভাযাত্রার সঙ্গে যেতে তারা উৎসুক।

রামুকাকা কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন সুরে বললেন, ‘উঁহু, রিস্কি। মেলায় কতরকম লোক আসে’—

তাঁর কথায় থাবড়া দিয়ে ছোটকা তর্জন করলেন, ‘অলরাইট। আমরা ছেলেরা মেয়েদের গার্ড দিয়ে নিয়ে যাব। আমরা দুপাশে, মেয়েরা মাঝখানে হাঁটবে। নজর রাখব যাতে ভিড় মেয়েদের ঘাড়ে না পড়ে।’

এই বলতেই খুদু বুধু বুলু ভুলু ইত্যাদি কমবয়সি ছেলেরা কাঁউমাউ করে আপত্তি জানাল— ‘আমি পারব না। আমায় একদম সামনে থাকতে হবে ভলেন্টিয়ার নিয়ে। নইলে প্রসেশন এগোবে না।’

—‘আমার বাজি পোড়ানোর ডিউটি আছে,’ জানাল খুদু।

—‘আমারও তাই’, ভুলু সুর মেলায়।

অর্থাৎ বোঝা গেল যে ছোকরারা কেউ এ দায়িত্ব পালনে রাজি নয়।

এতক্ষণে জ্যাঠামশাই মুখ খুললেন। মন্দিরের সামনে বারান্দায় এই আলোচনা হচ্ছিল। রাশভারী জ্যাঠামশাই একখানা চেয়ারে বসে গড়গড়ার নলে টান দিতে দিতে সব শুনছিলেন। এবার বললেন, ‘মেয়েরা প্রসেশনে যেতে চায়

যাক। তবে বাপু অত দামি দামি গয়না পরে যাওয়া চলবে না। মণিমুক্তো বসানো গলায় সোনার হার, কানে সোনার দুল, খোঁপায় রুপোর কাঁটা— এসব খুলে রেখে তারপর যায় যাক।'

—'কেন?' ছোটকা অবাক।

রামুকাকা জ্যাঠার কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, 'আরে এই ব্যাপারটাই তো বলতে চাইছিলুম। তা না রেন্টুটা চেঁচামেচি করে থামিয়ে দিল। শোন, রেন্টু, আজকাল আর সেদিন নেই। মেলায় বেশি চুরি ছিনতাই হচ্ছে। গতবারই এই গাঁয়ের এক বউয়ের হার নিয়ে নিচ্ছিল ভিড়ের মধ্যে। ভাগ্যিস লোকটা ধরা পড়ে। আচ্ছা করে পিটুনির পর তাকে পুলিশে দেয় পাবলিক। এছাড়াও দুটো পকেটমার কেস হয়েছে। তারা কিন্তু ধরা পড়েনি। সেইজন্যেই তো বলছি, এই ভিড়ে মেয়েদের যাওয়া রিস্কি। মানে এত গয়নাগাঁটি পরে।'

'আরে দূর দূর,' ছোটকা রামুকাকার ভাবনা স্রেফ নস্যাৎ করে দিলেন— 'এই ধ্যাড়ধ্যাড়েপুরে গেঁয়ো মেলায় আসে তো বড়োজোর কিছু লোকাল পাতি চোরছ্যাঁচোড়। দারোয়ান ভীম সিং তো প্রসেশনের সঙ্গে যায়। ও চলুক মেয়েদের পাশে পাশে গার্ড দিয়ে। ওর বন্দুক আর গোঁফ দেখলেই এসব বদলোক কেউ ধারেকাছে আসবে না। আর আমরা যে যার নিজেদের ফ্যামিলির ওপর নজর রাখব, তাহলেই হবে।'

—'ওঃ ভীম সিং!' কচিমামা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'ওর কী হাল হয়েছে দেখেছ? বয়সের ভারে ঝুঁকে গেছে। ওই পেল্লাই গোঁফটুকুই যা সম্বল। বন্দুকটা কাঁধে তুলে রাসমঞ্চ অবধি যেতেই ওর দম বেরিয়ে যায়। ও দেবে গার্ড! আজকাল চোখেও ভালো দেখে না। নার্ভাস হয়ে গুলি চালালে চোর-ডাকাতের বদলে ভালো লোককেই না মেরে দেয়। ওর বন্দুকে তাই এখন গুলি ভরা থাকে না। পকেটে দুটো টোটা রাখে।'

রামুকাকা ফোড়ন কাটলেন, 'নেহাত পুরোনো লোক, নইলে কবে ছুটি দিয়ে দিতাম। ভয় হয় ভিড়ে। কোনো দুষ্টুলোক ওর হাত থেকে বন্দুকটাই না ছেনতাই করে। ভাবছি, সামনের বছর থেকে প্রসেশনের সময় ওকে একটা নকল বন্দুক দেব।'

—'ও!' ছোটকা একটু থমকে গিয়ে বললেন, 'তা বড়দা যেমন বলছে, মেয়েরা যদি কিছু গয়না কমিয়ে যায় মন্দ কি?' তিনি বাড়ির বউ-ঝিদের মুখে একবার চোখ বোলালেন।

কিন্তু মেয়েদের হাবেভাবে গয়নার ভার লাঘব করে শোভাযাত্রায় যাবার বাসনা মোটেই ফুটল না। এ কটা দিন তারা একটু ভালোমতন সাজগোজ করে। লোকজনকে দেখায়।

মেয়েদের মনের গতি বুঝে ছোটকা দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'ঠিক হ্যায়, আমি নিজে নিয়ে যাব গার্ড দিয়ে। গয়না খোলার দরকার নেই। ওয়েট। আসছি এক্ষুনি।' ছোটকা গটগট করে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। একটু বাদেই ফিরলেন। তাঁর ডান হাতের মুঠোয় খোলা রিভলবার। গর্বিত হেসে রিভলবার উঁচিয়ে বললেন, 'লুক হিয়ার। এইটে দেখলে এখানকার কোনো ব্যাটা চোরছ্যাঁচোড় দশ হাতের ভেতরে ঘেঁষবে না। চলো'—

কিন্তু মেয়েদের তবু নড়বার লক্ষণ নেই। বড়োকর্তার হুকুম ভাঙার সাহস হচ্ছে না তাদের। জ্যাঠামশাই গম্ভীর বদনে ভুড়ুক ভুড়ুক করে গড়গড়া টেনে যাচ্ছেন।

ছোটকা এবার চটে গেলেন— 'হোপলেস। যতসব ভিতুর দল। ঠিক আছে, মিনতি তুমি চলো। বড়দা, মিনতিকে নিয়ে গেলে তোমার আপত্তি আছে? মানে গয়না-টয়না না খুলে।' জ্যাঠামশাই নিস্পৃহভাবে জানালেন, 'নো। এটা তোমার পার্সোনাল রিস্ক।'

ছোটকার স্ত্রী মিনতি ওরফে মিনুকাকিমা কাঁচুমাচু ভাবে হাসছেন। ঠিক ভরসা হচ্ছে না যেতে। আবার অমন দাপুটে স্বামীর কথাও ঠেলতে পারছেন না।

—'পিস্তলটা কি লোডেড?' কচিমামা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেন।

'আলবাৎ লোডেড। একি তোমাদের ভীম সিং পেয়েচ?' সদর্পে জবাব দেন ছোটকা, 'কারো বেচাল দেখলেই ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।'

এই সময় তুমুল হট্টগোলের মধ্যে পূজারিরা বেরিয়ে পড়ল মন্দির থেকে বিগ্রহ নিয়ে। ঢাকঢোল কাঁসি ঝাঁঝর শিঙা ইত্যাদি বাজনা-বাদ্যির বীর বিক্রমে কানে তালা লাগার জোগাড় হল। চৌধুরীবাড়ির পুরুষরা তড়িঘড়ি বারান্দা থেকে চত্বরে নেমে গেল শোভাযাত্রায় যোগ দিতে। 'এসো এসো'— ছোটকাও মিনুকাকিমাকে তাড়া দিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গ ধরলেন। যাবার সময় অন্যদের শুনিয়েই স্ত্রীকে বললেন, 'আরও দুটো গয়না চাপিয়ে এলে পারতে। দেখোই-না সেভ করতে পারি কিনা?'

শোভাযাত্রায় প্রথমে কিছু বাজনা-বাদ্যি হ্যাজাকবাতি, তারপর পুরোহিতদের

কোলে চেপে দামি দামি বসন-ভূষণে সজ্জিত কয়েকটি বিগ্রহ, তার পিছনে আবার একদল বাজনদার, এরপর চৌধুরীবাড়ির লোকেরা, তার পিছনে গ্রামের কিছু গণমান্য লোক।

বাজনা বাজতে বাজতে শোভাযাত্রা ফটক দিয়ে বেরোতেই বাইরে জমা মেলার বিশাল ভিড়টা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের ওপর।

পা পা করে শোভাযাত্রা এগোয় অতি ধীরে। দুমদাম পটকা ফাটছে অজস্র। তুবড়ি আর রংমশালের রোশনাই মাঝে মাঝে ঝকমকিয়ে উঠছে। হুস হুস করে আকাশ ভেদ করে ছুটে যাচ্ছে জ্বলন্ত হাউই। আর হাজার হাজার লোকের কী বিপুল কলরব। মূল শোভাযাত্রার গায়ে গায়ে দুপাশে হাঁটছে অগুনতি মানুষ।

ছোটকা মিনু কাকিমাকে নিয়ে চলেছেন— বাঁ হাতে স্ত্রীকে কাঁধের কাছে বেড় দিয়ে ধরে আছেন, আর তাঁর ডান হাতে রিভলবার। দুপাশের ভিড় মাঝে মাঝেই ধাক্কা মারছে শোভাযাত্রাকে। ভলান্টিয়াররা সামলাচ্ছে বটে, তবে ঠেলা খেলেই ছোটকা রিভলবার শূন্যে উঁচিয়ে হুংকার ছাড়ছেন— 'অ্যাই খবরদার। হটো হটো'— সঙ্গে সঙ্গে চালাচ্ছেন ডান হাতের কনুয়ের গুঁতো। চৌধুরীবাবুর হাতে সেই ভয়ংকর অস্ত্র দেখে, তাঁর গায়ে হামলে পড়া মানুষগুলো সভয়ে সরে যাচ্ছে তফাতে। ছোটকার তীক্ষ্ণ নজর পাহারা দিচ্ছে স্ত্রীর গয়নাগুলি।

ঘণ্টাখানেক বাদে চৌধুরীবাড়ির লোকেরা ফিরল ঘর্মাক্ত কলেবরে। অবশ্য কমবয়সি ছেলেগুলো বেশির ভাগই ফেরেনি। মেলার হুজুগ ছেড়ে তারা কি সহজে বাড়ি ঢোকে? ছোটকাও ফিরেছেন কাকিমাসহ।

বৈঠকখানায় সবার মাঝে স্ত্রীকে নিয়ে পা দিয়েই ছোটকা নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন, 'ওয়েল, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, অনুগ্রহ করে মিলিয়ে নিন কিছু খোয়াটোয়া গেছে কিনা?'

সবার চোখ পলকে মিনুকাকিমার গায়ের গয়নাগুলো জরিপ করে নেয়। নাঃ, সবই ঠিক আছে।

ছোটকা বিজয়ীর হাসি দিয়ে বললেন, 'দেখলে? এই তো দিব্যি ঘুরে এলাম। হলটা কী? যত বাজে ভয় তোমাদের।'

ছোটকা এবার বুঝি একখানা জব্বর লেকচার ঝাড়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন, এমন সময় তেরো বছরের ভাইঝি উমা ফস করে বলে ওঠে, 'ও ছোটোকাকা, তোমার ঘড়ি কই?'

অ্যাঁ, তাই তো! ঘরের সবাই দেখল যে তখনো রিভলবার ধরা ছোটকার পুরুষ্টু ফর্সা ডান হাতের কবজিতে শুধু একটা ঘড়ির মাপের গোল দাগ। কিন্তু সোনার ব্যান্ড লাগানো দামি বিদেশি ঘড়িখানা নেই। ছোটকা ওই ডান হাতেই ঘড়ি পরেন।

কয়েক মুহূর্ত কারো মুখে কোনো কথা ফোটে না। তারপরই মিনু কাকিমা উদ্‌বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ঘড়ি খুলে গিছলে?'

নিজের ডান হাতখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে ছোটকা হতভম্বের মতন ঘাড় নেড়ে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করেন— 'না।'

চোখ কপালে তুলে উত্তেজিত রামুকাকা বলে ওঠেন— 'তবে গেছে। প্রসেশনে মেরে দিয়েছে। ওফ্ কী কাণ্ড দেখো'—

রামুকাকার কথা শেষ হবার আগেই ছোটকা হনহন করে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

বাসে বুড়ি

মফস্‌সল লাইনের বাস। ঘড়ঘড়, ঝরঝর ভোকভোক করে চলেছে। কাছে কোথাও হাট বসেছে, বাসে বেশ ভিড়। ভিড়টা ছাদেই বেশি। অনেকেই দেখলাম বাসের ভিতর ঢোকার চেয়ে ছাদে চড়াই বেশি পছন্দ করে। কন্ডাক্টার গোঁত্তা মেরে এদিক ওদিক করছে। কারো বগলের নীচ দিয়ে, কারো ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে টিকিট কাটছে। আমি মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

এক বুড়ি উঠল। তার কোলে একটা ছাগলছানা। বাসের মেঝেয় লোকের পায়ের ফাঁকে বুড়ি থেবড়ে বসে পড়ল। পাশে বসল তার ছাগল।

খানিকবাদে কন্ডাক্টার এসে বলল, 'একী তলায় কেন? ওইতো একটা লেডিস সিট খালি, উঠে বস।' বুড়ি কাতরকণ্ঠে বলল, 'না বাবা পড়ে যাব। যা ঝাঁকুনি।'

হঠাৎ বুড়ির সঙ্গীর ওপর কন্ডাক্টারের নজর পড়ল। অমনি এক ধমক—'অ্যাই ছাগল তুলেছ যে? জান না বাসে গোরু ছাগল তোলা নিয়ম নেই।'

বুড়ি বলল, 'কেনে খেতিটা কী হয়েছে বাবা?'

—'প্যাসেঞ্জারের অসুবিধে হয়।'

'বটে! কী অসুবিধে হচ্চে শুনি? ওই যে বউটার কোলে কচি মেয়েটা একনাগাড়ে চেল্লাচে, কানে তালা ধরিয়ে দিল গো, তার বেলায় কিছু নয়। ইদিকে আমার পুঁটি উঠে অবধি একটা রা কাড়েনি সে করল অসুবিধে?'

আর কথা না বাড়িয়ে কন্ডাক্টার বুড়ির কাছে টিকিট চাইল।

আঁচলের গিট খুলে দুটো পাঁচ পয়সা চোখের সামনে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে দেখে বুড়ি ভাড়া দিল। পয়সা পেয়ে গুণে কন্ডাক্টার বললে, 'ছাগলের ভাড়া লাগবে।'

বুড়ি তেড়ে উঠল, 'হেই বাবা, উর আবার ভাড়া কী? এট্টুকুন প্রাণী!'

বুড়ির ওপর কন্ডাক্টার চটেছিল। গলা একটু চড়িয়ে বলল, 'মালের ভাড়া লাগে। পয়সা দাও!' বুড়িও গলা চড়াল— 'ইঃ, বলি ওই যে লোকটা তিনটে নাউ নিয়ে চলেছে তা নাউয়ের ভাড়া লেগেছে নাকি? নাউগুলোর চেয়ে আমার পুঁটির ওজন কম। মেপে দেখো কেনে?'

বইখাতা হাতে কয়েকজন স্কুলের ছেলে মজা দেখছিল। তারা সরবে সাপোর্ট করল, 'ঠিক বলেছ বুড়িমা। ওজন হোক, লাউ ভারী না পুঁটি ভারী, তবে টিকিট।'

কন্ডাক্টার বলল, 'কিন্তু এ হল জ্যান্ত প্রাণী। জ্যান্ত জীবের ভাড়া লাগবে।

ভাবলাম এবার বুড়ির উপায় নেই। কঠিন যুক্তি। কিন্তু বুড়ি তৎক্ষণাৎ হাত মুখ নেড়ে বলে উঠল— 'বলে কী গো। দুমাসের ছানার আবার টিকিট। এই যে কচি মেয়েটা, ওর ভাড়া লেগেছে নাকি? অবলা মুখ্যু মেয়েমানুষ পেয়ে যাতা বোঝাচ্ছ কেন বাছা?'

ছাত্ররা হৈ হৈ করে উঠল। 'সাবাস বুড়িমা, আচ্ছা দিয়েছ! পুঁটি মাইনর। ওর আবার টিকিট কী?'

—'এই মেয়েটা মানুষের বাচ্চা!' কন্ডাক্টার গম্ভীরভাবে জানাল।

—'মানুষ নয় বলে পুঁটিকে অবহেলা কোরো না। ওর ভারী বুদ্ধি। এক্কেবারে মানবের মতো।' বুড়িও ছাড়বার পাত্রী নয়।

কন্ডাক্টার এবার হাল ছেড়ে দিল। তর্ক করে সময় নষ্ট হচ্ছে। অন্য যাত্রীদের টিকিট কাটা দরকার। দু-একজন ইতিমধ্যে তাক বুঝে বিনা টিকিটে সটকে পড়েছে। এদিকে পুঁটির ভাড়া পাওয়ার আশা কম। সে বেজার মুখে একখানা টিকিট বুড়ির হাতে গুঁজে দিয়ে অন্যদিকে ফিরতে ফিরতে বলল— 'বাচ্চা কোলে নাও। মেঝেয় রেখেছ কেন?'

বুড়ি নির্বিকারভাবে পুঁটিকে আঁকড়ে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল।

একটু পরে। হঠাৎ শুনলাম তুমুল তর্জন গর্জন। একজন লোক চেঁচাচ্ছে।— 'এই বুড়ি তোর ছাগলের কাণ্ডটা দেখ। ইস! কতগুলো কচি ডাঁটা মুড়িয়ে দিয়েছে। কী লোকসান! আর এই বাসও হয়েছে যাচ্ছেতাই। ছাগল ভেড়া যা ইচ্ছে তুলবে। ওহে কন্ডাক্টার দেখো ইদিকে।'

উঁকি মেরে ঘটনাটা বুঝে দেখি সর্বনাশ্। লোকটি ছোটো এক ধামা পালং শাক রেখেছিল পুঁটির সামনে। বোধহয় বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল হাটে। মুখের

কাছে রসাল খাদ্য পেয়ে পুঁটি আর লোভ সামলাতে পারেনি। কখন চিবোতে শুরু করে দিয়েছে।

কন্ডাক্টার হাজির। যো পেয়ে গেছে। চোখ পাকিয়ে বলল— 'কী রে বুড়ি, তোর ছাগলের নাকি বড়ো বুদ্ধি। বড়ো লক্ষ্মী। খুব যে বড়ো বড়ো কথা হচ্ছিল। এবার?'

একটা ছাত্র ফুট কাটল— 'আহা, বাচ্চা ছেলে খিদে পেয়েছিল। সকালে বেরিয়েছে, টিফিন হয়নি।'

পুঁটির ব্যবহারে বুড়ির বেজায় অপমান লেগেছে। সে পুঁটিকে দুই থাপ্পড় কষিয়ে দিল।— 'হতভাগা কেবল খাই খাই। আসার আগে অতগুলো পাতা খাওয়ানু না? বাসে উঠেছিস, বসতে পেয়েছিস, তা নয়। যত বিটকেলে বুদ্ধি। ছাগলার স্বভাব যাবে কোথা?'

চাঁটি খেয়ে পুঁটি ভ্যা ভ্যা করে কান্না জুড়ে দিল। ছেলেগুলো হট্টগোল করতে লাগল। কন্ডাক্টার বুড়িকে জোর করে নামিয়ে দেবে কিনা ভাবছে এমন সময় বুড়ি নিজেই ছাগল বগলে উঠে দাঁড়াল। বোধহয় তার যাবার জায়গা এসে পড়েছে কিংবা বেগতিক দেখে আগেই কেটে পড়ছে। 'চ বাড়িতে দেখাচ্ছি মজা। আচ্ছা গেরো হয়েছে বাবা ছাগল পুষে। ঝাড়া হাত পা কুটুম বাড়ি বেড়াতে যাব, উপায় নেই। দুদণ্ড না দেখলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। ফেলে আসব এবার, যত পারে চেল্লাক।' গজ গজ করতে করতে বুড়ি পুঁটিকে নিয়ে এগোল।

ঠিক নামার মুখে বুড়ি ঘাড় ঘোরাল। পালং শাকের মালিককে উদ্দেশ্য করে ঝাঁপিয়ে উঠল— 'তোমারও বাপু আক্কেল বলিহারি। ছাগলের জিবের ডগায় কচি শাক রেখেছ! বলি লোভ দেখালে মুনিরও মতিভ্রম হয়, এ তো অবোধ পশু! হবেই লোকসান।'

আচমকা ধমক খেয়ে শাকের মালিক ভ্যাবাচ্যাকা। 'ঠিক ঠিক'— ছেলেরা সায় দিল। বেশ খুশি খুশি হয়ে বুড়ি তখন বাস থেকে নামল।

(সত্য ঘটনা)

মিত্র হোটেল

কাটোয়া স্টেশনের খুব কাছে মিত্র হোটেল। চাকুরি সূত্রে আমার কাটোয়া গমন। কাটোয়া থেকে এদিক-সেদিক ট্রেনে গিয়ে কিছু কাজ করতে হবে আট-দশ দিন। তাই সাইকেল রিকশাওলাকে বলেছিলুম যে হোটেলটা স্টেশনের যত কাছে হয় ততই ভালো। যাতে দৌড়ে গিয়ে ট্রেন ধরতে পারি, আর চলনসই গোছের হলেই চলবে। রিকশাওয়ালা মিত্র হোটেলে হাজির করে।

দোতলা বাড়ি। দোতলায় মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো— মিত্র হোটেল। গোটা দোতলা জুড়ে হোটেল। সারি সারি ঘর সাত-আটখানা, সামনে রেলিং দেওয়া টানা বারান্দা। নীচের তলায় চা মিষ্টি তেলেভাজা ও লটকনের দোকান।

মিত্রমশাই ছোটোখাটো রোগা মানুষ। গায়ের রং তামাটে। ঝুনো নারকেলের মতন মুখখানি। মাথায় পাতলা চুল। কপাল ঘেঁষে টাক শুরু হয়েছে। পরনে হাতাওলা গেঞ্জি, খাটো ধুতি, রবারের চপ্পল। পরে অবিশ্যি বুঝেছিলাম যে এটা মিত্তিরবাবুর সর্বক্ষণের ড্রেস। কথায় কথায় তিনি জানিয়েছিলেন, 'আমার মশাই সম্বল চারখানা হাতাওলা গেঞ্জি আর দুজোড়া ধুতি। এতেই চলে যায় হোটেল বাজার। আর একখানা শার্ট আছে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যেতে, দূরে কোথাও ভদ্রতা রক্ষা করতে যেতে ওটা চাপাই।'

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে হোটেলের অফিস ঘর। মিত্রমশাই নেড়া তক্তাপোশে বসে, পাশে ক্যাশবাক্স, সামনে একটা টেবিল ঘিরে তিনটে চেয়ার। বসলাম চেয়ারে এবং হোটেলে থাকার ইচ্ছেটা জানালাম। শান্তিনিকেতন থেকে আসছি শুনে মিত্রমশাই চোখ পিটপিট করে খুশি খুশি ভাবে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'বেশ। সিট আছে, পাবেন।'

—'বড্ড গরম। ফ্যান আছে ঘরে?' জিজ্ঞেস করি।

—'আছে ফ্যানওলা ঘর,' জানালেন মিত্রমশাই, 'ডেইলি আট আনা একস্ট্রা ভাড়া লাগবে কিন্তু।'

—'দেব।' আমি রাজি।

রেট ঠিক হল, সিটের ভাড়া প্রতিদিন দু টাকা আর ফ্যানের জন্য বাড়তি আট আনা। মোট আড়াই। খাবার চার্জ আলাদা। পরে অবশ্য জেনেছিলাম, মিত্র হোটেলে একটি মাত্র ঘরে ফ্যানের হাওয়া খাওয়ার বিলাসিতার বন্দোবস্ত রয়েছে।

ঘর পছন্দ হল। দিব্যি খোলামেলা, উত্তর-দক্ষিণে জানালা। ঘরের চারকোণে চারটে সিট অর্থাৎ তক্তপোশ পাতা। একটার ওপর গোটানো বিছানা, অন্য তিনটি খালি। বিছানাওলা তক্তাপোশটি দেখিয়ে মিত্র বললেন, 'ওটা এক ট্যাক্স অফিসারের সিট। এখন ট্যুরে গেছেন। চমৎকার মানুষ।'

এক নজরে দেখে নিলাম, হুঁ, মাথার ওপর একটা সিলিং ফ্যান ঝুলছে বটে। সুইচ টিপে ফ্যানটাকে এবার ঘোরালাম। মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুললেও সে খুব-একটা কাতরাল না।

ইনকাম ট্যাক্স অফিসার সামন্ত মশায়ের দেখা পেয়েছিলাম পরদিন। বয়স বছর পঞ্চাশেক। শ্যামবর্ণ দশাসই গম্ভীর দর্শন। ওই শুষ্ক কঠোর আবরণের তলায় একটি রসিক চিত্তের নাগাল সহজে মেলে না। আমায় দুদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে, খবরাখবর নিয়ে তারপর সামন্তদা খোলস ছেড়েছিলেন। মিত্রমশাই সামন্তদাকে যমের মতো ভয় করতেন। প্রধান কারণ ট্যাক্স আতঙ্ক। চটে গেলে যদি বিরাট ট্যাক্স চাপিয়ে দেয়, ব্যাবসা লাটে উঠবে। তাই সামন্তদার জন্য বরাদ্দ ছিল স্পেশাল মিল, অন্য বোর্ডারদের একই চার্জে। যদিও মিত্রমশাই বাইরে বলতেন যে মি. সামন্ত নাকি স্পেশাল চার্জ দেন, তাই। সামন্তদা শুনে মুচকি হাসতেন। আমার ওপর সামন্তদার নেকনজর পড়েছে জেনে আমার ভাগ্যেও কখনো কখনো জুটত আধা স্পেশাল মেনু। যেমন, ডাল তরকারির সঙ্গে একটা একস্ট্রা এক পিস বেগুনভাজা বা মাছের মুড়োর অংশ, বিশেষত যেদিন সামন্তদা সঙ্গে খেতে বসতেন।

সামন্তদার জ্বর হল। মিত্রমশাই শশব্যস্ত হয়ে ডাক্তার ডাকতে গেলেন। অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার। সামন্তদা আমায় ডাক্তারটির নাম শুনিয়ে রাখলেন— 'ডক্টর বুচার।' অর্থাৎ জল্লাদ ডাক্তার। বলাবাহুল্য নামটি তাঁর নিজের দেওয়া। ডাক্তারটি

মিত্রমশায়ের ফেভারিট কারণ নাকি মিত্রমশায়ের শ্বশুর অক্কা পেয়েছে— এই ডাক্তারের হাতে এবং এর ফলে মিত্রর স্ত্রী দু বিঘে ধানজমি পায় বাপের সম্পত্তির ভাগ হিসেবে। সেই জমি বেচা টাকাতেই এই হোটেলের পত্তন।

—'এর চাইতে ভালো কোনো ডাক্তার ডাকতে বলুন,' আমি সন্ত্রস্ত হয়ে জানাই।

—'দরকার নেই। ডিগ্রি আছে। ওতেই হবে।' সামন্ত নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকেন।

গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো, হাতে ব্যাগ, ঝলঝলে প্যান্টশার্ট পরা ভীষণ গম্ভীর মুখে ঢেঙা কালো প্রৌঢ় ডাক্তারবাবুটি এলেন মিত্রমশায়ের পিছু পিছু। তিনি সামন্তদার বুকে পিঠে স্টেথো লাগিয়ে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন। থার্মোমিটার লাগিয়ে টেম্পারেচার নিলেন এবং ১০০ ডিগ্রি জ্বরেই খুব চিন্তিত ভাবে মাথা ঝাঁকালেন।

সামন্তদা অতি সুবোধের মতন শুয়েছিলেন। একফাঁকে আমায় তেরচা চোখে দৃষ্টি হেনে মিনমিনে কণ্ঠে বললেন, 'ডক্টর বু, ইয়ে মানে ডাক্তারবাবু, কেমন বুঝছেন, সিরিয়াস কিছু?'

—'নাঃ নার্ভাস হবার কিছু নেই,' ডাক্তার আশ্বাস দেন, 'প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছি, মিত্রমশাই আমায় রেগুলার খবর দেবেন কন্ডিশন জানিয়ে, প্রয়োজন হলেই আসব।'

—'বেশ। আপনার প্যাড আছে?' সামন্তদা বললেন।

—'আছে।' জানাল ডাক্তার।

—'অসুখের নামটা লিখে দেবেন প্রেসক্রিপশনে,' অনুরোধ করেন।

ডাক্তারবাবু ভেবেচিন্তে প্রেসক্রিপশন লিখে পাঁচটি টাকা ভিজিট পকেটে পুরে বিদায় নিলেন। মিত্রমশাই তাঁর সঙ্গে গেলেন।

ডাক্তার চলে যাওয়ার এক মিনিটের মধ্যে সামন্তদা উঠে বাক্স বিছানা গুছোতে শুরু করলেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'একী!'

সামন্তদা মুচকি হেসে বললেন, 'বাড়ি যাচ্ছি গ্রামে। খেপেছ? এই ডাক্তারের ওষুধ খাব? প্রেসক্রিপশন কাটালাম আপিসে ছুটির জন্যে দরকার হবে বলে। গাঁয়ে কবরেজমশায়ের দু পুরিয়া ওষুধ খেলেই চাঙা হয়ে উঠব।'

'দিন স্যার প্রেসক্রিপশানটা, ওষুধ নিয়ে আসি,' বলে ঘরে ঢুকে ব্যাপার দেখে মিত্রমশাই থ। সামন্তদা গম্ভীরভাবে বললেন, 'একটা রিকশা ডাকুন। দেশে গিয়ে ওষুধ কিনব। ওষুধে কী হবে? এখানে আমার সেবা করবে কে?'

'গুডবাই' করে সামন্তদা চলে গেলেন। আমি থাকতে থাকতে তিনি ফিরে আসেননি। তবে তাঁর সিট রাখা ছিল যথারীতি। ও-খাটে আর কাউকে জায়গা দিতে সাহস হয়নি মিত্রমশায়ের। যদি হঠাৎ এসে পড়েন ট্যাক্স অফিসার।

এক সন্ধ্যায় কাজ সেরে ফিরে দেখি আমার ঘরে দুই খালি তক্তাপোশের একটিতে বিছানা পেতে বসে আছেন গোলগাল ফর্সা চেহারা, লুঙ্গি ও স্যান্ডো গেঞ্জি পরা বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক। তাঁর খাটের পাশে শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা বড়ো পিচবোর্ডের বাক্স। আমি হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় আধশোয়া হতেই নতুন আগন্তুক যেচে আলাপ করলেন। নাম তাঁর বারিদবরণ বারিক। এক গ্লাস কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ। অর্থাৎ ঘুরে ঘুরে আয়না বিক্রি করেন। ঠিক নিজে হাতে বিক্রি নয়, দোকানে দোকানে গিয়ে বিভিন্ন আয়নার স্যাম্পল দেখান, অর্ডার নেন। পরে কোম্পানি মাল পাঠায় অন্য লোক মারফত, গাড়িতে। কোম্পানির পাওনা টাকা আদায়ও করেন বারিদবাবু।

বারিদবাবু গোপ্পে লোক। গল্প জুড়লেন, নানান দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতা। আমায় চা খাওয়ালেন। এখানে এলে তিনি নাকি মিত্র হোটেলেই ওঠেন এবং এই ঘরটিতে সিট চাই গরমকালে। আজ সারাদিন কাটোয়া শহরে চক্কর দিয়েছেন। পরদিন ভোরে বারিদবাবু মালপত্র সমেত বিদায় নিলেন। যাবেন কালনায়। পরশু হয়তো ফিরবেন এইপথে।

সেদিন আমার বেরুবার প্রোগ্রাম ছিল না। ঘরে বসেই কিছু কাজ করব। বেলা এগারোটা নাগাদ হোটেলের বেয়ারা জগুর সঙ্গে এক ভদ্রলোকের প্রবেশ ঘটল রুমে। ভদ্রলোক দৈর্ঘ্যে প্রস্থে মাঝারি, ময়লা রং, টিয়াপাখির মতন লম্বা নাক। নাকের নীচে এক চিলতে বাটারফ্লাই গোঁফ। পরনে ফুলপ্যান্ট, ফুলহাতা শার্ট, বুটজুতো। মাঝবয়সি। আমায় এক নজর দেখে তিনি হাতের পেটমোটা চামড়ার ব্যাগটা রাখলেন একটা শূন্য তক্তাপোশে। জগুর মাথায় একটা হোল্ডল এবং হাতে একটা বড়ো চটের থলে। হোল্ডল ও থলে সেই খাটে রেখে চলে গেল।

আগন্তুক ঝটপট বিছানা পেতে ফেললেন। তক্তাপোশে তারপর একটু খুটখাট করে বেরিয়ে গেলেন। আধঘণ্টাটাক বাদে ফিরে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আমায় খানিক নিরীক্ষণ করে কিঞ্চিৎ ভাঙা গলায় হাসি হাসি মুখে হাতজোড় করে বললেন— 'নমস্কার।' অর্থাৎ আলাপ করতে চাই।

অগত্যা আমিও প্রতিনমস্কার করলাম। কাজের খাতাপত্র গুছিয়ে সরিয়ে

রাখলাম। ভদ্রলোক প্রথমে আমার পরিচয় নিয়েই নিজের পরিচয় জানালেন। ইনিও একজন সেলসম্যান। কোনো এক কোম্পানির লজেন্স টফি ইত্যাদির গুণাগুণ প্রচার করেন, দোকানে দোকানে স্যাম্পল দেন, অর্ডার নেন এবং কোম্পানির হয়ে টাকাকড়ি আদায় করেন। ভদ্রলোক হুড়হুড় করে কথা বলেন এবং একটি মুদ্রাদোষ— খানিকবাদে বাদেই বললেন, 'বুঝলেন কিনা।' নাম— সত্যচরণ কুণ্ডু। নিবাস— বহরমপুর।

যা হোক লোকটি বেশ আমুদে। কথায় কথায় আমি বলে ফেললাম, 'গতকাল মি. বারিক এসেছিলেন। মানে বারিদবরণ বারিক। উনিও আপনার লাইনে। গ্লাস কোম্পানিতে আছেন।'

—'বুঝেছি, আরশি বারিক।' সত্যচরণের ভুরু কুঁচকোয়, 'তা ও কী বলল?'

—'না না কিছু বলেননি,' আমি জানাই, 'বেশ লোক। অনেক গল্পগুজব হল। কুড়িটা টাকা ভাঙিয়ে নিলাম ওঁর থেকে।'

—'আপনার ভাঙানি লাগবে? কত?' বলতে বলতে সত্য কুণ্ডু জামা তুলে কোমরে গিঁট দিয়ে জড়ানো লম্বা গেঁজে টাইপের একটা থলি বের করে বার দুই ঝাঁকুনি দিতেই বিছানার ওপর খুচরো পয়সা ও নোটের একটি ছোটো ঢিবি হয়ে গেল।

—'বলুন বিশ পঞ্চাশ কত টাকার ভাঙানি চাই? খুচরো পয়সা, নোট যা খুশি,' সত্য কুণ্ডুর ঘোষণা।

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, 'না না অত লাগবে না, এই গোটা পাঁচেক টাকার পঁচিশ আর পঞ্চাশ পয়সা পেলেই খুব উপকার হয়। যা খুচরোর আকাল। আর পাঁচ টাকার এক টাকার নোট।'

কুণ্ডু মশাই ভাঙানি দিলেন। অতঃপর তাঁর চামড়ার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো টফি বের করে আমার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন— 'খান।'

—'আরে আরে এতগুলো কেন?' আমি সন্ত্রস্ত।

—'খান খান,' কুণ্ডু উদার, 'আমাদের কোম্পানির প্রোডাক্ট। টেস্ট করুন। ফ্রি স্যাম্পল।'

একটি টফি মোড়ক ছাড়িয়ে মুখে দিয়ে বাকিগুলি ফেরত দিলাম। কুণ্ডু নিতে চান না। বললেন, 'বাড়ির জন্যে নিয়ে যান।'

—'আজ্ঞে বাড়ি ফিরতে আমার এখনও দেরি আছে', আমি আপত্তি জানাই।

পরদিন সকালে নীচের তলায় দোকানে গিয়ে টিফিন খেয়ে এসে দেখি

কুণ্ডুমশায় উধাও হয়েছেন। সেইদিন সন্ধ্যায় ফের বারিদবরণ বারিকের আবির্ভাব হল মিত্র হোটেলে।

কথায় কথায় বারিদবরণকে জানালাম যে সত্যচরণ কুণ্ডু এসেছিলেন।

—'ও লবেঞ্চুস কুণ্ডু।' বারিকের কণ্ঠে তাচ্ছিল্য।

—'হ্যাঁ বেশ চালাক। আমায় কিছু খুচরো করে দিলেন পঁচিশ আর পঞ্চাশ পয়সায়। এক টাকার নোটও দিলেন কিছু। আবার স্যাম্পল টফি খাওয়ালেন ফ্রিতে।'

বারিদবাবুর মুখখানা পাকা বেলের মতন টকটকে হয়ে উঠল। নিতান্ত অবজ্ঞাভরে তিনি জানালেন, 'ও পঁচিশ পঞ্চাশ। হুঁ, ওর কাছে ওইসব কারবারই বেশি। ছোটো দোকান থেকে আদায় কিনা। তা আপনার ভাঙানি দরকার? দু-একশো যা চাই বলুন। পাঁচ দশের নোটে নিতে পারেন। দুইও কিছু দিতে পারি।'

আমি কৃতার্থ হয়ে জানালাম, 'আজ্ঞে আর আমার ভাঙানি দরকার নেই।'

বারিকমশাই চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'একখানা লুকিং গ্লাস নেবেন? টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেব। মানে কস্ট প্রাইস। ফাস্‌ক্লাস জিনিস। অর্থাৎ টফির মতন আয়না স্রেফ ফ্রিতে দেওয়া সম্ভব নয় তাই যতটা সুবিধে করে দেওয়া যায়। আমি সবিনয়ে তাঁর অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করলাম, 'নাঃ বাড়ি নিয়ে যেতে ভেঙেটেঙে যাবে।'

কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ বারিক জানালেন, 'ঠিক আছে বোলপুর লাইনে গেলে আপনার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসব। বাড়ির মেয়েরা দেখবেন লুফে নেবে।'

বারিদবরণ পরদিন বিদায় নিলেন।

হোটেলের একখানা ঘরে চারজন ছাত্র থাকত। চারজনই কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কলেজ হস্টেলের সিট পায়নি তাই আপাতত হোটেলে রয়েছে। চারটি ছেলেই ষণ্ডামার্কা। কলেজে যায়। বিকেলে খেলতে যায়। সকাল সন্ধে পড়াশুনো করে। নিজেদের মধ্যে হুল্লোড় করে। মিত্রমশাই তাদের রীতিমতো সমীহ করে চলতেন। ছেলেগুলি প্রায় খেতে হাঙ্গামা লাগাত। চিৎকার করত

—'ঠাকুর, মাছের মুড়োটা কোথায়?'

—'ঠাকুর, মাছের পিস এত ছোটো কেন? ঝোলে ঝাল কেন এত?' ইত্যাদি।

পাছে অন্য খদ্দের তাদের দেখে বিগড়ে যায়, তাই বাইরের খদ্দের থাকলে ওদেরকে অফিস ঘরে একটা বেঞ্চে আলাদা খেতে দেওয়া হত।

ছেলে চারটির সঙ্গে আমার কিন্তু দিব্যি ভাব হয়ে গিছল। আমি আগে ফুটবল

ক্রিকেট খেলতাম এবং খেলার জগতের খবরাখবর রাখি জেনে ওরা কখনো কখনো আমাকে ওদের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে গল্প জুড়ত। মাঝে মাঝেই হাড়কিপ্টে মিত্রমশায়ের শ্রাদ্ধ করত সরবে। মিত্রমশাই শুনেও শুনতেন না। যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন চার দস্যিকে। আমায় বলতেন, 'খুরে খুরে দণ্ডবৎ মশাই, আর কক্ষনো স্টুডেন্ট ঢোকাচ্ছি না। জ্বালিয়ে দিলে—'

এক রাতে ওই চার স্টুডেন্টের সাথে আমি ভাত খাচ্ছি। চারমূর্তির একজন হাঁক পাড়ল, 'ঠাকুর ফ্যান দাও।'

—'ফ্যান!' আমি অবাক। 'ভাতের সঙ্গে ফ্যান খাও নাকি?'

স্টুডেন্টটি হেসে বলল, 'আজ্ঞে না, ফ্যান নয়, ডাল।'

—'মানে!' আমি হতভম্ব, 'তাহলে ফ্যান বলছ কেন?'

—'দাদা, ওটাই এখানে ডালের মেন ইনগ্রেডিয়েন্ট।' বোঝায় আর একজন, 'ডালে কতটা ফ্যান মেশায় জানেন? ডাল কম ফ্যানই বেশি। আমরা তাই ফ্যানই বলি। বড়োজোর বলা যায় ডাল মেশানো ফ্যান।'

বেগতিক দেখে মিত্রমশাই সুড়সুড় করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি কোনোরকমে হাসি চাপলাম।

একদিন রাত দশটা নাগাদ ঘুমবার জন্য সবে চোখ বুজেছি। খাবার ঘর থেকে ভেসে এল বহু কণ্ঠের কলরব। বুঝলাম অনেক খদ্দেরের আগমন ঘটেছে। নির্ঘাত জগুর কীর্তি। হোটেলের ছোকরা চাকর জগুর প্রধান ডিউটি হচ্ছে, দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খদ্দের পাকড়ানো। সে সমানে চেঁচিয়ে আহ্বান জানায়— 'চলে আসুন, ভাতের হোটেল। সস্তা রেট। টাটকা রান্না। সব গরম পাবেন। আমিষ নিরামিষ যা চান। সিট আছে—'

বেশি খদ্দের জোটাতে পারলে জগু মালিকের থেকে বকশিশও পায়।

খাবার ঘরে তুমুল হাঁকডাক হৈ চৈ চলল ঘণ্টা দেড়েক। ততক্ষণ আমার ঘুমের দফা গয়া।

পরদিন সকালে মিত্রমশাই বিগলিত বদনে আমার ঘরে দর্শন দিতে এলে, বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলাম। মিত্রমশাই কাঁচুমাচু ভাবে বললেন, 'কাল রাতে একটু ডিসটার্ব হয়েছে নাকি স্যার?'

গম্ভীরভাবে বলি, 'তা একটু হয়েছে বৈকি। অত রাতে হৈ চৈ হলে কি আর ঘুম আসে?'

মিত্রমশাই অপ্রস্তুত হেসে বললেন, 'কী করব স্যার, এসে পড়ল। খদ্দের

লক্ষ্মী। তার ওপর মড়া পোড়ানো পার্টি। ওদের পেলে কি কোনো হোটেল ছাড়ে?'

—'কেন?'

—'মানে দুদিনের যত বাসি খাবার ছিল সব পার করে দিলাম। সাধে কি আর ওদের এত খাতির।'

—'সে কী অসুখ করে যদি?' আমি চিন্তিত, 'যদি ধরা পড়ে যেতেন?'

—'নো রিস্ক স্যার,' মিত্র নির্ভাবনা, 'পাঁচ মাইল দূর থেকে হেঁটে এসে গঙ্গার তীরে মড়া পুড়িয়েছে। পেট জ্বলছে খিদেয়। তার ওপর নেশা করেছে। ওই হুতাসনে যা ঢালবেন স্রেফ দগ্ধ হয়ে যাবে। ভালো-মন্দর বিচার আছে নাকি? শুধু গরম গরম চাই। আর হ্যাঁ ভাতটা গরম টাটকা চাই। এক-একজনা যা টানল দেখলে ভির্মি খেতেন। ওদের জন্যে তাই পাইস সিস্টেম। মানে হাতা পিছু চার্জ।'

চার স্টুডেন্ট সেদিন কলেজ যাবার আগে খেতে বসে চিৎকার করে ঘোষণা করল, 'যাক বাবা কদিন আর বাসি খেতে হবে না, গুদোম সাফ।' তারপরই চারজন পিলে চমকানো হুংকার ছাড়ল— 'মড়া পার্টি যুগ যুগ জীও।'

—'দাদা। ও দাদা।'

এক রাতে কানের কাছে ফিসফিসানি ডাক শুনে ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে মিত্রমশাই। তিনি হাত জোড় করে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'দাদা ঘুম ভাঙালাম অপরাধ নেবেন না। বড়ো বিপদে পড়েছি, একটু সাহায্য করবেন যদি?'

—'কী ব্যাপার?' আমি উদ্‌বিগ্ন হয়ে মশারির বাইরে আসি। রাত তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

মিত্রমশাই হাত কচলাতে কচলাতে ভারি বিব্রতভাবে বললেন, 'হঠাৎ এক সাহেব এসেছে। কী যে চায় ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি যদি ওর সঙ্গে কথা বলেন।'

—'সাহেব ইংরিজি বলছে, না অন্য কোনো ভাষা?' আমি নার্ভাস।

—'ইংরিজিই তো মনে হচ্ছে, তবে ধরতে পারছি না কিচ্ছু।'

বারান্দায় গিয়ে দেখি এক লম্বা জোয়ান শ্বেতাঙ্গ যুবক চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের কাছে মস্ত এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আমি তাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাই আপনার?'

সাহেব তড়বড় করে কথা বলে গেল। ইংরিজিই বটে তবে কিঞ্চিৎ নাকি সুরে জড়ানো উচ্চারণ। বুঝতে আমারও কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল, যাহোক তার বক্তব্য মোটামুটি উদ্ধার করলাম।

সাহেবের নাম মার্টিন। অ্যামেরিকান। কাটোয়া শহরের কাছে একটা এগ্রিকালচারাল ফার্ম দেখতে এসেছিল। ভেবেছিল সন্ধের ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাবে। কাটোয়া স্টেশনে এসে শোনে, ট্রেন লেট। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে স্টেশনে। ট্রেন কখন আসবে ঠিক নেই। হয়তো গভীর রাত হয়ে যাবে। তাই সাহেব স্থির করেছে, রাতটা কোনো হোটেলে বিশ্রাম করে ভোরে কলকাতা রওনা দেবে। নোংরা স্টেশনে আর কাঁহাতক বসে থাকা যায়। সাইকেল রিকশাওয়ালাকে খুব কাছে কোনো হোটেলে নিয়ে যেতে বলতে এই মিত্র হোটেলে হাজির করেছে। সাহেবের চাই শুধু একটি সিংগল রুম ও একটি খাট। বিছানা তার সঙ্গে আছে। ঘরে ফ্যান থাকলে ভালো হয়, বড্ড গরম।

—‘ঘর খালি আছে’, জানালেন মিত্রমশায়, ‘ফ্যান? তা টেবিল ফ্যান একটা ম্যানেজ হয়ে যাবে, আমারটাই না হয় দেব। জিজ্ঞেস করুন কিছু খাবে কিনা? টোস্ট ওমলেট টি কফি বিস্কুট?’

দোভাষীর ভূমিকা আমার।

মার্টিন মাথা নেড়ে জানাল, ‘খাবারটাবার দরকার নেই। আমার ওয়াটার বটল-এ খাবার জল আছে। লজিং পেলেই যথেষ্ট।’

মিত্রমশাই সাহেবকে ঘর দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে মিত্রমশাই হাসি হাসি মুখে ঢুকতে জিজ্ঞেস করলাম— ‘সাহেব চলে গেছে?’

—‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

—‘কেমন ঘুমিয়েছিল?’

—‘বলল তো গ্র্যান্ড।’

মানে একটা কৌতূহল আছে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘চার্জ কী নিলেন?’

মিত্রমশাই মাথা চুলকে একগাল হেসে বললেন, ‘কুড়ি।’

‘অ্যাঁ, বলেন কী!’ আমি থ, ‘সিট রেন্ট আর একরাতের ফ্যান ভাড়া, সব মিলিয়ে বড়োজোর তো তিন-চার টাকা।’

—‘আজ্ঞে দিলাম বুক ঠুকে বলে,’ খুশিতে উজ্জ্বল মিত্র জানালেন, ‘তা মশাহ

একবারও দরদস্তুর করল না! এক কথায় বের করে দিল। ইস পঁচিশ বললেও বোধহয় আটকাত না।'

ঠাট্টা করলাম, 'আপনার হোটেল তো জাতে উঠে গেল। সাহেবসুবোরা পা দিচ্ছেন। আর কি আমাদের পুছবেন?'

—'হেঁ হেঁ, কী বলেন', মিত্রমশাই লাজুক হাসেন, 'তবে হ্যাঁ মডার্ন হোটেলকে খবরটা পৌঁছে দিতে হবে। বেটাদের রংঢং একটু বেশি কিনা, আমাদের তাই খাটো চোখে দেখে। এবার জানুক'—

আমার কাজ শেষ। এবার কাটোয়া এবং মিত্র হোটেল থেকে বিদায়ের পালা। পাওনাগণ্ডা মেটাবার সময় একটাকা ছাড় দিয়ে স্পেশাল ফেভার দেখালেন মিত্রমশাই। বললেন, 'কার্তিক পুজোর সময় এখানে আসবেন একবার। খুব ধুমধাম হয় শহরে। বাইরে থেকে কত লোক আসে দেখতে। আগে চিঠি দিলে আপনার সিট রিজার্ভ রাখব ওই ঘরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাকুর বিসর্জন দেখতে পাবেন।'

হোটেলের সেই চার স্টুডেন্ট আমায় তুলে দিয়ে এল হৈ হৈ করে।

দুঃখের বিষয় আর আমার কাটোয়া যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

বৈশাখ ১৩৯৪

বন্দী ডাবু

তপনবাবুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে। ডাবু'—

তপনবাবু চমকে ফিরে বললেন। 'অ্যাঁ, কী, খেয়েছে?'

—'না না, খায়নি কিছু' গিন্নি মাথা নাড়েন, 'ডাবু আটকে পড়েছে কাকাবাবুর ঘরে।'

—'কী করে?' তপনবাবু ভুরু কোঁচকান।

গিন্নি বললেন, 'একটু আগে দেখলাম যে কাকাবাবু বেরিয়ে গেলেন দরজায় তালা দিয়ে। এখন ওঁর শোবার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি, ডাবু ওই ঘরের ভিতরে। মেঝেতে বসে কী জানি খাচ্ছে। আমি নজর করছি দেখে, চট করে হাতটা কোলে লুকোল।'

—'হুম', তপনবাবু মাথা ঝাঁকান, 'কী খাচ্ছে দেখতে পেলে?'

—'না। তা সে যাই খাক। ও এখন বেরুবে কী করে? যদি বুঝতে পারে আটকে পড়েছে, দরজা বন্ধ, বেরুতে পারবে না, বাড়িতে আর কেউ নেই, ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে। কী কাণ্ড যে হবে? ওঃ!' ডাবুর মায়ের চোখে প্রায় জল এসে যায়।

—'আমাদের দিক থেকে ভিতরের দরজাটা?' জিজ্ঞেস করেন তপনবাবু।

—'ছিটকিনি দেওয়া, ওপাশ থেকে। আমি ঠেলে দেখেছি।' গিন্নি জানালেন।

—'হুম।' তপনবাবু মাথা ঝাঁকালেন। তারপর অভয় দিলেন, 'আরে অত ভাববার কী আছে? কাকাবাবু এখুনি এসে পড়বেন।'

—'এখুনি? হ্যাঁ, তুমি খুব জান। একা হয়ে এখন তো উনি উড়ছেন। কাল কখন বাড়ি ফিরেছেন জান? রাত আটটায়। আজ যদি অমনি ফেরেন? এই এখন

সাড়ে পাঁচটা থেকে আড়াই ঘণ্টা। ডাবু ও বাড়িতে একা আটকে থাকলে? উঃ।’

ডাবুর দিদি, ছয় বছরের বিনি এই ঘরেই ছিল। এতক্ষণ মা-বাবার কথা গিলছিল। সে গালে হাত দিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলে উঠল, ‘ওমা কী হবে গো?’

‘কিস্‌সু হবে না’ তপনবাবু ধমকে উঠলেন বিনিকে। তারপর স্ত্রীকে বললেন, ‘আহা অত উতলা হচ্ছ কেন? সব দিন কি আর দেরি করবেন? পাড়ায় একটু খুঁজে দেখো। দত্তবাড়ি কিংবা বসুমশায়ের কাছে। পেয়ে যাবে। চাবি এনে, তালাটা খুলে শ্রীমানকে খালাস করে দাও। সমস্যা মিটে যাবে।’

তপনবাবুর স্ত্রী রাগী চোখে একবার তাকালেন স্বামীর দিকে। বোধহয় ইচ্ছে ছিল যে তপনবাবুই উঠে খুঁজে আনুক কাকাবাবুকে। কিন্তু আড্ডা এবং বন্ধুকে ছেড়ে কর্তার ওঠার লক্ষণ নেই দেখে ভারি বিরক্ত হয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘বেশ, আমি যাচ্ছি। তুমি একটু নজর রেখো ডাবুকে।’

তপনবাবু গিন্নিকে বললেন, ‘দেখো, আবার কাকাবাবুর সঙ্গে রাগারাগি কোরো না। ওঁর কী দোষ? ডাবুটা মহা বিচ্ছু। উনি হয়তো জানতেই পারেননি যে ডাবু ওদিকে ঢুকেছে। কিংবা ভেবেছেন, বেরিয়ে গেছে। ডাবুটার জ্বালায় দেখছি ভিতরের দরজাটা বন্ধ রাখতে হবে।’

স্ত্রী দুপদাপ করে চলে যেতেই তপনবাবু বন্ধুকে বললেন, ‘বসো হে, আসছি এক্ষুনি।’ তিনি ঘর থেকে বাইরে গেলেন।

অনাথবাবু হাঁ হয়ে শুনছিলেন সব। তিনি প্রায়ই গল্পগুজব করতে আসেন তপনবাবুর কাছে। তপনবাবুর দুটি সন্তান। বড়োটি মেয়ে বিনি। ছোটো ছেলে ডাবুর বয়স বছর তিনেক।

কাকাবাবু মানুষটি তপনবাবুর বাড়িওলা। বয়স বছর পঁচাত্তর। তাঁর বাড়িটা একতলা। মোট চারটে শোবার ঘর। সামনের অংশে বাড়ির আধখানায় থাকেন কাকাবাবু ওরফে অমল মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী। পিছনের বাকি অংশটা ভাড়া নিয়েছেন তপনবাবু। দুই পরিবারের বাইরে যাওয়া-আসার পথ ভিন্ন ভিন্ন। অমলবাবুদের পথ সামনে একটা দরজা। আর ভাড়াটেদের পথ পিছনের দরজা দিয়ে।

মিনিটখানেক বাদেই ফিরে এলেন তপনবাবু। ধপ করে চেয়ারে বসে, কাপের চায়ে শেষ চুমুক মেরে বিড়বিড় করলেন, ‘যত্ত ঝঞ্ঝাট।’ তারপর তিনি মেয়েকে বললেন, ‘যা তো বিনি, আড়াল থেকে চোখ রাখ ডাবুর ওপর। বেশি কথাটথা বলিসনি। বেশ নিজের মনেই আছে।’

বিনি চলে যেতেই অনাথবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার?'

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে তপনবাবু বললেন— 'আর বল কেন, আমার পুত্রটি একটি আস্ত বাঁদর! কাকাবাবুর অংশ আর আমাদের দিকটার মাঝে একটা দরজা আছে। বেশির ভাগ সময় খোলাই থাকে সেটা। মানে ভেজানো থাকে। ওই পথে গিয়ে বুড়োবুড়ির খোঁজখবর নিই মাঝে মাঝে। ওঁরাও ডাকেন দরকারে। দুজনেই ভারি ভালো মানুষ। তা আমার শ্রীমানটি যখন-তখন টুক করে ওই দরজা ঠেলে খুলে ওধারে সেঁধোয়। কাকাবাবু কাকিমা অর্থাৎ কিনা ডাবুর দাদু দিদার কাছ থেকে নানান মুখরোচক খাদ্য জোটে যে। আর ওঁদের বাড়িময় ঘুরঘুর করে এটাসেটা ঘাঁটে মনের আনন্দে। বারণ করি। শোনে না।'

—'আসলে কাকাবাবুরা ডাবুকে খুব ভালোবাসেন। কাকাবাবু এমনিতে খুব গুছোনে মানুষ। ঘর টিপটাপ রাখেন। কিন্তু ওই ডাবুকে কিছু বলেন না। কতদিন বলেছি, অত লাই দেবেন না। এখন বোঝ ঠ্যালা।'

—'আরে হয়েছেটা কী, তাই বলো?' অনাথবাবু তাড়া দেন।

ফোঁস করে ফের একটা নিশ্বাস ফেলে তপনবাবু জানালেন, কাকিমা দিন সাতেকের জন্য ভাইয়ের বাড়ি গেছেন। কাকাবাবু একা রয়েছেন। বৃদ্ধের শরীর এখনও দিব্যি শক্ত। সকাল বিকেল বেড়ান। তবে চোখের দৃষ্টিটা খারাপ হয়ে গেছে। বেশ কম দেখেন। ডাবু কখন যে ওদিকে ঢুকেছিল, আছে না বেরিয়ে গেছে খেয়াল করেননি। বাইরের দরজায় তালা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে গেছেন। আবার মাঝের দরজাটাও ছিটকিনি দিয়ে গেছেন। হয়তো ডাবুর ভয়েই। অর্থাৎ শ্রীমান ডাবু এখন ওপাশটায় বন্দী।'

—'অ্যাঁ, ছেলেটা করছে কী?'

—'দেখলাম দিব্যি আছে। কাকাবাবুর ঘরের নীচু তাক থেকে টান মেরে ফলের টুকরিটা মেঝেতে ফেলেছে। একটা সিঙ্গাপুরি কলা ছাড়িয়ে বসে খাচ্ছে এবং আরও দুটো আস্ত সিঙ্গাপুরি কলা খোসা ছাড়ানোর অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে।'

—'অ্যাঁ!' ডাবুর কীর্তি শুনে অনাথবাবু থ।

তপনবাবু বলে চলেন, 'দেখলাম, দুটো আপেল মেঝেতে গড়াচ্ছে। আর একগোছা আঙুর। কলার সাধ মিটে গেলে বোধহয় ওগুলো চাখবে। আমায় দেখে কলাসুদ্ধু হাতটা পেটের কাছে আড়াল করে মিচকে হাসল। ভেবেছে, দাদু কোথাও গেছে। এখুনি আসবে। এই ফাঁকে যা পারি সাবড়ে নিই। টের পায়নি

যে আটকে পড়েছে। দাদু যে কখন ফিরবে ঠিক নেই। যদি তা বুঝতে পারে তাহলেই ঝকমারি। কুরুক্ষেত্র করবে। যাকগে, কাকাবাবু কাছেই আছেন। এই এসে পড়বেন।'

মিনিট দশেক কেটেছে।

তপনবাবু মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখছেন বাইরে, কাকাবাবু ফিরলেন কিনা। বিনি দৌড়ে এসে জানাল, 'বাবা, ডাবু চানাচুর খাচ্ছে।'

—'চানাচুর! পেল কোত্থেকে?' তপনবাবু অবাক।

বিনি বলল, 'নীচের তাকে ছিল শিশিতে। ডাবু কলাটা আধখানা খেয়ে ফেলে দিল। তারপর কটা আঙুর খেল। তারপর চানাচুরের শিশিটা নামিয়ে উপুড় করে সবটা দাদুর বিছানায় ঢেলেছে। একমুঠো খাচ্ছিল। আমি চাইলাম। দিল না।'

বোঝা গেল, এই ভাগ না দেওয়ার কারণেই ভায়ের ওপর বিনি বেজায় চটেছে। তাই চটপট নালিশ করতে এসেছে।

তপনবাবু বিনিকে বললেন, 'আচ্ছা তুই যা! দেখ কী করে। তবে বলিসনি কিছু।'

বিনি চলে যেতেই তপনবাবু হতাশ সুরে বললেন, 'ডোবাল।'

তারপরেই তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ওঘরে চানাচুর এল কী করে? কাকাবাবুর ভাজাভুজি খাওয়া বারণ। কাকিমা ওসব বাজারের খাবার মোটে ঢুকতে দেন না। বুঝেছি।'

'কী?' অনাথবাবুর কৌতূহল বাড়ে। কেসটা বেশ জমেছে।

তপনবাবু নিজের মনেই বকে যান, 'তাই কাকাবাবু আমাদের সাথে খেতে চাইলেন না। কাকিমাকে চলে যেতে বললাম, আপনি একা থাকবেন। বরং আমাদের কাছে খান কটা দিন। তা উনি বললেন, কোনো অসুবিধে হবে না। মোক্ষদা রান্না করবে। দুপুরে আমায় খেতে দেবে। রাতে খাই শুধু দুধ আর হাত-রুটি গুড় দিয়ে। রুটি তো মোক্ষদা বানিয়ে রেখে যাবে। দুধটা শুধু গরম করে নেব। ব্যাস, মিটে গেল। টিফিনটা নিজেই বানাব। পাঁউরুটি, টোস্ট, মাখন, জেলি, কলা। কোনো ব্যাপারই নয়। তোমাদের কাকিমা অবশ্য মোক্ষদাকে বলে গেছেন আমার সকালের টিফিনটা বানিয়ে দিতে। আমি না করে দিয়েছি। দুবেলা দুকাপ চা বানিয়ে দিক। ব্যাস যথেষ্ট।'

—'মোক্ষদা কে?' জিজ্ঞেস করেন অনাথবাবু। 'ওঁদের কাজের মেয়ে। পুরনো লোক।'

—'হ্যাঁ, তারপর?' কাকাবাবুটির সম্বন্ধে অনাথবাবুর আগ্রহ বাড়ছে।

—'তারপর আর কি। বৃদ্ধ বেশ একটা গর্বের হাসি দিয়ে বলেছিলেন—বুঝলে হে, তোমাদের কাকিমা আমায় যতটা অক্ষম ভাবে ততটা আমি নই। সাত বছর একা কাটিয়েছি চাকরির প্রথমে। নিজে রান্না করে খেয়েছি। কারও ওপর নির্ভর করতে আমি ভালোবাসি না।'

—'এখন বুঝছি, ওসব ভান। আসল মতলবটা অন্য।'

—'কী মতলব?' প্রশ্ন করেন অনাথবাবু। যদিও খানিকটা আঁচ করেছেন।

—'কী আবার! এই ফাঁকে কটা দিন খুশিমতো পেটপুজো করবেন। চানাচুর এনেছেন। অন্য সময়ে ফল আসে শুধু কলা। এখন আপেল আঙুরও চালাচ্ছেন। আরও কী কী এনে খাচ্ছেন কে জানে? বোধহয় হরদম মুখ চালাবার লোভে খাবারগুলো নিজের শোবার ঘরেই রেখেছেন। যাই একবার দেখে আসি শ্রীমান কী করছেন? সবটা চানাচুর শেষ করে যদি? ডোবাবে।'

তপনবাবুর সঙ্গে অনাথবাবুও চললেন।

কাকাবাবুর শোবার ঘরে একটিমাত্র জানলা। মস্ত বড়ো। দক্ষিণ দিকে। জানলার গায়ে সিমেন্টের লাল-রঙা চওড়া বেদি। ওই বেদিতে পা ছড়িয়ে বসেছিল ডাবু। হাঁ করে কেবলই ঝোল টানছে জোরে জোরে।

তপনবাবু দেখেই বললেন, 'এই রে, ঝাল লেগেছে। বিনি, যা তো এক গেলাস জল নিয়ে আয় চট করে। আর এক টুকরো পাটালি।'

ঢকঢক করে জল খেয়ে, পাটালি গুড়ের টুকরোটা মুখে ফেলে চুষতে চুষতে শ্যামল রঙ, একমাথা কোঁকড়া চুল, শুধু ইজের পরা, গান্দা-গোব্দা ডাবু, চোখে খুশির ঝিলিক হেনে, কচি ভুট্টার দানার মতো দাঁতের সারি মেলে একগাল হাসল।

তপনবাবু ডাবুকে বললেন, 'মুড়ি খাবে?'

—'হেঁ।' ডাবু মাথা দোলায়। সে মুড়ি খেতে খুব ভালোবাসে।

তপনবাবু বিনিকে বললেন, 'যা তো মা, এক বাটি মুড়ি নিয়ে আয়।'

বিনি গিয়ে মুড়ি আনল। গরাদের ফাঁক দিয়ে দেওয়া হল বাটিটা। অমনি ডাবু দুহাতে দুমুঠো মুড়ি তুলে, বাঁ মুঠোটা মুখে পুরল। যতটা মুড়ি মুখে ঢুকল, তার চেয়ে বেশি ছড়াল বাইরে।

ডাবু কচ কচ করে মুড়ি চিবুচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল যে তপনবাবুর স্ত্রী হনহন করে আসছেন। তপনবাবু বিনিকে, 'তুই এখানে থাক' বলে তাড়াতাড়ি

জানলা ছেড়ে এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে। অনাথবাবুও তাঁর পিছু নিলেন।

ডাবুর মা থমথমে মুখে বললেন, 'পাড়ায় কোথাও নেই। সব বাড়িতে খুঁজেছি। কী হবে?'

—'আহা অত ঘাবড়াচ্ছ কেন?' তপনবাবু স্ত্রীর দুশ্চিন্তা উড়িয়ে দিলেন, 'তুমি বরং একবার রতনপল্লী আর অবনপল্লীটা ঘুরে এসো। রিকশা নিয়ে যাও। নাড়ুবাবু, ডাক্তারবাবু— এমনি তিন-চারটে বাড়িতে খোঁজ নাও। ঠিক পেয়ে যাবে। এদের বাড়িতেই যান কাকাবাবু। আর হ্যাঁ, ভকতের দোকানটা একবার নজর কোরো। যদি কিছু কিনতে ঢোকেন।'

—'ডাবু কী করছে? উৎকণ্ঠিত স্ত্রীর প্রশ্ন।

—'খাসা আছে। মুড়ি খাচ্ছে।' তপনবাবু জানালেন।

ডাবুর মা একটা সাইকেল-রিকশা চেপে হুস করে চলে গেলেন।

অনাথবাবু বললেন, 'দেখো তপন, তুমি ডাবুর কাছে এখন থেকো না। আমি আর বিনি থাকছি। ভুলিয়ে রাখব। তোমায় দেখে যদি বায়না ধরে? বেরুতে চায়?'

—'তা ঠিক।' সায় দেন ডাবুর বাবা।

জানলার পাশ দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তপনবাবু আড় চোখে দেখলেন, ডাবু আয়েশ করে মুড়ি খাচ্ছে জানলায় বসে। ভুলু কুকুরটা জুটেছে বাইরে। ওপরের দিকে তাকিয়ে সে মুড়ির লোভে ঘনঘন লেজ নাড়ছে। বিনিও রয়েছে। বাবাকে ডাবু ভ্রূক্ষেপই করল না।

অনাথবাবু অবিশ্যি থেমে গেলেন জানলার পাশে। ডাবুকে বললেন, 'বাঘ দেখেচ?'

—'হুঁ। ছারকাছে।' ডাবু মাথা দোলায়।

—'একটা বাঘের গপ্পো শুনবে?'

—'হুঁ।' ডাবুর চোখ বিস্ফারিত হয়।

অনাথবাবু হাত মুখ নেড়ে একটা বাঘের গল্প শুরু করলেন। বিনিও ঘেঁসে আসে গল্প শুনতে।

ডাবু হাঁ করে শোনে। মাঝে মাঝে এক খাবলা মুড়ি গালে পোরে। ভুলু কুকুরও জানলার নীচে মুখ তুলে রয়েছে। গল্পের লোভে নয়, মুড়ির লোভে। গল্প চলছে। হঠাৎ ডাবু 'আঁ আঁ' করে ডাক ছেড়ে, জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে একটা পা বাড়িয়ে বেরুতে চেষ্টা করে।

অনাথবাবু চমকে উঠলেন, ‘কী হল?’

—‘পেনছিল। ওই যে।’ ডাবু বাইরে নীচে দেখায়। অনাথবাবু দেখলেন যে জানলার ধার দিয়ে গেটের দিকে যাওয়া কাঁকর বিছানো পথে এক আঙুলটাক মাত্র লম্বা একটি পেনসিল পড়ে আছে। কার কে জানে? বিনি তাড়াতাড়ি পেনসিলটা তুলে ভাইয়ের হাতে দিল। ডাবু পেনসিলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পরম যত্নে তার ইজেরের পকেটে রাখে। ফের গল্পে মন দেয়।

মিনিট দশেকের একটা গল্প শেষ করে অনাথবাবু একটু হাঁপিয়ে গেলেন। ডাবুকে বললেন, ‘তুমি মুড়ি খাও। আমি ঘুরে আসছি। আবার গপ্পো বলব। কেমন?’

ডাবু ঘাড় নেড়ে উদারভাবে অনুমতি দেয়।

তপনবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে অনাথবাবু দেখলেন যে, বন্ধুটি মেঝেতে থেবড়ে বসে। তার সামনে মাটিতে কয়েক গোছা চাবি এবং হাতুড়ি ছেনি ইত্যাদি কিছু যন্ত্রপাতি।

অনাথবাবুকে দেখে তপনবাবু জিজ্ঞেস করলেন— ‘ডাবু?’

—‘দিব্যি আছেন খোস মেজাজে।’

—‘হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি। ব্যস্ত হবার কারণ নেই। মিছিমিছি সবাই’—

বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে অনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই চাবিগুলো কেন?’

—‘মানে দেখছিলাম চেষ্টা করে যদি তালাটা খোলা যায়?’

—‘বাড়ির ওধারে দিয়ে গেছলে বুঝি সামনের তালাটা খুলতে?’

—‘হুঁ। খুলল না।’

—‘হাতুড়ি ছেনি— এগুলো?’

—‘ভাবছিলাম, তেমন বুঝলে তালাটা ভাঙব কিনা? কিংবা ভেতরের ছিটকিনিটা?’

অনাথবাবু বুঝলেন যে বন্ধুটি বাইরে ভারি নিশ্চিন্ত ভাব দেখালেও মনে মনে নিজেও বেশ ভড়কেছে।

অনাথবাবু বসলেন। জল খেলেন। দুটো কথাবার্তা বলে ফের ডাবুর কাছে গেলেন মিনিট পনেরো বাদে।

ডাবু তখনও দুহাতে মুড়ি খাচ্ছে। ছড়াচ্ছে। এবং মাঝে মাঝে এক মুঠো ভুলোকে ছুঁড়ে দিয়ে বলছে— ‘নে খা।’

বিনি বাগানে একটা ইটের ওপর বসে গালে হাত দিয়ে হাঁ করে দেখছে ভাইয়ের কীর্তিকলাপ।

অনাথবাবুকে দেখেই ডাবু বলল, 'জ্যেঠু গপ্পো।'

—'হ্যাঁ', অনাথবাবু এবার শুরু করলেন হাতির গল্প।

গল্পের মাঝে অনাথবাবু লক্ষ করলেন যে বাড়ির সামনে বেশ লোক জমছে। বোধহয় ডাবুর মায়ের কল্যাণে খবরটা রটেছে পাড়ায়। ওই ভিড়ের বেশির ভাগই নানা বয়সি মহিলা। কিছু কুঁচোকাঁচাও রয়েছে। ওরা সবাই উদ্‌বিগ্ন ভাবে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। বাড়িওলা অমলবাবুর নামে কিছু সজোর বিরূপ মন্তব্যও কানে আসে ওই ভিড় থেকে। কয়েকজন অতি উৎসাহীকে সরেজমিনে তদন্তের ইচ্ছায় গেট খুলে ডাবুর জানলার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে অনাথবাবু হাত নেড়ে তাদের বারণ করলেন। তারা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে পিছিয়ে গেল।

সহসা কলরব ওঠে। তপনবাবুর স্ত্রী রিকশায় চড়ে হাজির হলেন স্বয়ং বাড়িওলা সমেত।

কাকাবাবু প্রায় ছুটে গিয়ে সদর দরজার তালা খুলে ঢুকলেন বাড়ির ভিতর, পিছু পিছু ডাবুর মা।

নিজের শোবার ঘরে পা দিয়েই পরিপাটি ঘরখানার দুর্দশা দেখে অমলবাবু থ।

তপনবাবুর স্ত্রী বললেন, 'কাকাবাবু, আমি ঘর পরিষ্কার করে দিচ্ছি। আগে এটাই সরাই।'

তিনি এবার, 'তবে রে শয়তান' বলে ছেলের পিঠে একটা ছোট্ট কিল মেরে তাকে জাপটে তুলে নিলেন বুকে।

ডাবু অমনি খপ করে জানলার একটা গরাদ আঁকড়ে ধরে কাঁদ কাঁদ সুরে চেঁচাতে লাগল, 'আমি এখন যাব না। হাতির গপ্পো শেষ হয়নি।'

'বটে! আবার ঢং হচ্ছে?' ঝাঁঝিয়ে উঠে ডাবুকে আর এক ঘা ঘষাতে মায়ের হাত উঠতেই অনাথবাবু বাধা দিলেন— 'আহা মারবেন না। সত্যি গপ্পোটা যে শেষ হয়নি। ডাবু চলো। তোমাদের ঘরে গিয়ে বাকিটা শুনব।'

আশ্বাস পেয়ে ডাবু গরাদ ছেড়ে দেয়।

ছানা

বোলপুর-দুর্গাপুর লাইনের বাস। চলেছে দুর্গাপুরের দিকে।

বাসে ভিড় বেশ। ছাদের অর্ধেকটা প্রায় ভর্তি। খোলের ভিতরে বসার আসন একটিও খালি নেই। অনেক প্যাসেঞ্জার দাঁড়িয়ে। ধরে দাঁড়াবার লম্বা হাতল দুটো পাশাপাশি মুঠোয় হাউসফুল। গায়ে গায়ে ঠেসে দুই লাইনে পিঠোপিঠি খাড়া যাত্রীদল। সিটের কোণা খামচে দাঁড়াবার উপায়গুলিও প্রায় বুক্‌ড।

শরতের শুরু। সকাল দশটা নাগাদ। রোদ দিব্যি চড়া।

বড়ো মোট-ঘাট সঙ্গে থাকলে যাত্রীদের ব্যবস্থা বাসের ছাদে। তখন তারা আর পাশের দরজা দিয়ে বাসের পেটে সেঁধুবার চেষ্টাই করে না। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে যায়। উপরের টানে ও নীচের ঠেলায় মানুষসমেত হরেকরকম মাল পাচার হয় বাসের মাথায়।

বাস এগোয়। ভিড় ও গরম বাড়ে। যাত্রীদের অস্বস্তি ও মেজাজ চড়ে।

এক নিরীহদর্শন ধুতি ও শার্ট গায়ে বছর চল্লিশের অফিসযাত্রী আপত্তি তোলেন— 'ও মশাই, পা-টা সরান। আমার চটির ওপর আপনার জুতো।'

—'সরি, নো উপায়! ভিড়ের বাসে অমনি হয়।'— কানঢাকা হাপ বাবরিচুলো, ঝুলো গোঁফ, পরনে নীলচে চোঙা প্যান্ট, লাল হলুদ ডোরা কাটা স্পোর্টস গেঞ্জি এবং ছুঁচলো কালো জুতোর মালিক মাস্তান টাইপ যুবকটি উত্তর দেয়।

মনে দপ করে ওঠা আঁচ সবটা বাইরে প্রকাশে তেমন ভরসা হয় না। তবু অভিযোগকারী ক্ষুব্ধস্বরে জানালেন, 'ভিড় বলে কি যা খুশি করবেন? মাথায় পা রাখবেন?'

—'আপনার মাথাটা ওখানে থাকলে তাই রাখতে হত', নিস্পৃহ জবাব যুবকের। 'আর আপনার ছাতাটা যে দুবার আমার পাঁজরে খোঁচা মারল? নেহাত ভিড় বলে বলিনি কিছু। তা সরাচ্ছি পা। কিন্তু যদি আপনার ছাতা ফের গায়ে ঠেকে, ওটাকে ছুড়ে ফেলে দেব বাইরে।'

ছত্রধারী আর কথা বাড়াননি বেশি লোকসানের ভয়ে। বরং ছাতাটা একটু আঁকড়ে টেনে নেন কাছে। মাস্তান টাইপ ইঞ্চিখানেক জুতো সরায় কৃপাবশে।

পানাগড় এল। এখানে বাস মিনিট দশেক জিরোয়।

প্যাসেঞ্জারদের কিছু ওঠানামা হয়। বসার জায়গা খালি থাকে না। তবে হাত-পা মেলে দাঁড়াবার কিঞ্চিৎ সুবিধে মিলল।

একজন লোক বাসের সামনের দরজার কাছে হাজির হল মাথায় একটা টিন বয়ে। সে নামাল টিনটা। ধপ করে মাটিতে রাখল। শব্দে মালুম হল ভিতরে ভারী কিছু রয়েছে।

লোকটি মাঝবয়সি। জোয়ান। পরনে হাতওলা গেঞ্জি ও খাটো ধুতি। কাঁধের গামছা দিয়ে সে মুখের ঘাম মুছতে থাকে।

টিনটা কেরোসিনের। চকচকে গা। টিনের দুপাশে দুটো লোহার শিকের হাতল ঝালাই করে লাগানো। টিনের মাথায় একখণ্ড ঈষৎ হলদেটে মোটা কাপড় টান করে পাতা।

বাসের কন্ডাক্টার টিনটা ভালোমতন দেখে নিয়ে বলল— 'ছানা?'

—'হ্যাঁ।' লোকটি ঘাড় নাড়ে।

—'মালের ভাড়া লাগবে।' কন্ডাক্টারের ঘোষণা।

ছানাওলা অনুনয়ের দৃষ্টি হানে কন্ডাক্টারের মন ভেজাবার আশায়। যদি ভাড়াটা কমে বা মাপ হয়। তবে সে মুখে কোনো কথা বলে না।

কন্ডাক্টার কিন্তু তার দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে বিড়ি ধরায়।

ছানাওলা এবার দুহাতে টিনের দুই হাতল পাকড়ে টেনে টিনটা তুলল সামনের দরজার পাদানিতে। অনুরোধ জানায় প্যাসেঞ্জারদের— 'দাদা একটু সরে। দরজাটা ছেড়ে দিন।'

—'এখানে মাল কেন? ছাদে যাও।' আপত্তি ওঠে।

—'এই একটু বাদেই নেবে যাবে।' ছানাওলা সাফাই গায়।

—'ছানা ছলকাবে।' আরেক যাত্রী সন্ত্রস্ত।

—'না স্যার। ঠাসা মাল।' ছানাওলা অভয় দেয়।

ছানাওলা টিনটা টেনেটুনে নিয়ে গিয়ে রাখল ড্রাইভারের পেছনে কাঠের পার্টিশানের গায়ে। নিজে দাঁড়ায় পাশে।

ছানাওলার ভাগ্য ভালো। হঠাৎ কাছে এক সিটেবসা যাত্রী জানলা দিয়ে একটা বাসকে আসতে দেখে— 'আরে এক্সপ্রেস এসে গেছে'— বলেই তড়াক করে উঠে দুদ্দাড় করে নেমে গেল বাস থেকে। ছানাওলা তার শূন্য সিট দখল করল।

বারকয়েক জোরে জোরে হর্ন মেরে বাস ছাড়ল।

শেষ সময়ে দু-তিনজন যাত্রী উঠল। তারা অবশ্য বসতে পেল না। তাদের একজন দাঁড়াল ছানাওলার ঠিক সামনে। ফলে ছানার টিন মালিকের একটু চোখের আড়াল হয়ে গেল।

পরের স্টপেজে বাসে উঠলেন এক বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ নেহাতই বেঁটে ও ক্ষীণকায়। তার গায়ে ঢোলাহাতা আধময়লা পাঞ্জাবি ও ধুতি। পায়ে চপ্পল। শুকনো নারকেলের মতন মুখখানা। আদ্যিকালের গোল ফ্রেমের চশমাটা নাকের ডগায় ঝুলছে। তাঁর হাতে একটা বড়োসড়ো পুঁটলি। বাইরে থেকে দেখে মনে হল পুঁটলিতে পেয়ারা জাতীয় কোনো ফল রয়েছে।

বৃদ্ধ বাসে উঠে মুশকিলে পড়লেন।

প্রথমে তিনি উঁকি মেরে মেরে খোঁজ নিলেন— 'একটু বসার জায়গা হবে?'

সিটে বসা প্যাসেঞ্জার সবারই অন্যমনস্ক ভাব। কেউ যেন শুনতেই পেল না সেই আবেদন।

বৃদ্ধ বুঝলেন যে বসার আশা নেই।

দাঁড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে বেশ অসুবিধে। এক হাতে ভারী পুঁটলিটা। খাটো মানুষটির পক্ষে রোগা অপর হাতে রড আঁকড়ে সোজা হয়ে থাকা বিলক্ষণ কঠিন কাজ। রড ভালো মতো নাগালই পাচ্ছেন না।

লোকাল বাস ঘন ঘন থামছে চলছে। হঠাৎ ঘ্যাঁচ— ব্রেক। আবার হ্যাঁচকা মেরে এগোয়। ফের থামে। এই অনবরত ঝাঁকুনির মধ্যে শক্ত মুঠোয় কিছু না ধরে খাড়া থাকা একমাত্র কন্ডাক্টারদের পক্ষেই সম্ভব। প্যাসেঞ্জার হলে টাল খাবেই।

বৃদ্ধ বারকয়েক রড ফসকে অন্য প্যাসেঞ্জারদের গায়ে গোত্তা খেলেন।

বিরক্তিসূচক মন্তব্য শোনা যায়— 'আঃ দাদু সোজা হয়ে দাঁড়ান।'

—'ওঃ পুঁটলি সামলে।'

বৃদ্ধ অসহায় চোখে তাকান। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল ড্রাইভারের পেছনে পার্টিশানের গায়ে একটি নিরাপদ আশ্রয়।

যেখানে ছানার টিন রাখা হয়েছে তার এক পাশে প্যাসেঞ্জারদের সিটের দিকে পার্টিশানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন যাত্রী। তিনি বোধহয় টিনটির পরিচয় জানেন। বলেছে বটে, ঠাসা মাল, ছলকাবে না। তবু ভরসা কী? তাই লোকটি টিন থেকে একটু তফাতেই রয়েছেন।

টিনের অপর পাশে, ড্রাইভারের সিটে যাবার পথের দিকে, পার্টিশানে সামান্য একটু জায়গা খালি। বৃদ্ধটি গুটিগুটি গিয়ে সেই বিঘতখানেক ফাঁকা পার্টিশানে কোমর ঠেস দিয়ে হাঁপ ছাড়লেন।

ব্যাপারটা পুরোপুরি আরামদায়ক নয় যদিও। বাসের ঝাঁকুনিতে কখনো কখনো বৃদ্ধের হাঁটুর কাছে টিনের ধারটা ঘসা খাচ্ছে। তবু অন্যদের কটু মন্তব্য শুনতে হবে না, এই বাঁচোয়া।

পায়ের কাছে একটা কেরোসিনের টিন। ঝাঁকুনিতেও নটনড়নচড়ন। বৃদ্ধের নজর মাঝে মাঝেই টিনটার ওপর যায়।

ওপরে মোটামুটি পরিষ্কার একটি টানটান ন্যাকড়া পাতা। তারপর নীচে টিনটা মাথাওলা না মাথাকাটা বোঝার উপায় নেই। বৃদ্ধ একবার তাঁর হাতের পুঁটুলিটা টিনের ওপর কাপড়ে রাখতে গিয়েও রাখলেন না। তাঁর মাথায় অন্য এক ইচ্ছের উদয় হল।

বৃদ্ধ নীচু হয়ে টিনের পাশটায় টিপেটুপে ঠেলে দেখলেন। মনে হল, ভেতরের বস্তুটি বেশ জমাট ওজনদার। তরল হালকা কিছু নয়।

বৃদ্ধ মন স্থির করে ফেললেন। ভিড়ের বাসে উপরের শক্তপোক্ত মালের ওপর বসা কিছু অপরাধ নয়। সুতরাং তিনি টিনে পাতা কাপড়ের ওপর জুত করে চেপে বসে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পশ্চাদ্‌ভাগ ভুস করে ঢুকে গেল টিনের ভেতর ছানা ভেদ করে অনেকখানি, একেবারে খাপে খাপে আটকে গেলেন টিনে।

—'অ্যাঁক!'

বৃদ্ধের গলা থেকে আর্তনাদটা বেরুনো মাত্র অন্য প্যাসেঞ্জারদের চোখ পড়ল তাঁর ওপর। পরক্ষণেই হৈ হৈ কাণ্ড।

ছানাওলা সামনের লোকটির আড়াল কাটিয়ে গলা বাড়িয়েই লাফিয়ে উঠল— 'হায় হায়, সর্বনাশ হয়ে গেল।'

—'চোপ।' বহুকণ্ঠ একসঙ্গে ধমকে ওঠে।

—'ওঠানোর সময় খেয়াল ছিল না?'

—'এই কন্ডাক্টার, এখানে ছানা রাখতে দিয়েছ কেন?'

ছানাওলা ও কন্ডাক্টারের মুখ চুন।

ফাঁদে পড়া বৃদ্ধ তখন মরিয়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন টিন থেকে। কিন্তু পারছেন না।

তাঁর কোমর অবধি টিনে আটকা। পা দুটো লগবগ করে ঝুলছে। হাতের পুঁটুলিটা অবশ্য ছাড়েননি। অন্য হাতের চাড়ে টিন থেকে ওঠার বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছেন বারবার। তাতে যেন আরও সেঁটে বসে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে প্রায় খসে পড়া চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে তুলে দিচ্ছেন। কাতর চোখে চাইছেন সবার পানে বুঝি বা সাহায্যের আশায়। টিনের গা বেয়ে উপচে পড়া ঘন ছানা গড়িয়ে নামছে।

দু-তিনজন প্যাসেঞ্জার বৃদ্ধের হাত ও কাঁধ ধরে টান দিলেন তবে কাজ হল না। টিনসুদ্ধু বৃদ্ধ একটু সরলেন মাত্র।

—'দেখি দেখি মোসাই সরুন। সব এলেম বোঝা গেছে। এই সামান্য প্রবলেম'— এগিয়ে আসে সেই চোঙা প্যান্ট, ডোরা গেঞ্জি, ছুঁচোল জুতোধারী মস্তান টাইপ যুবক। সে ইতিমধ্যে একটা সিটে বসতে পেয়েছিল। বসে বসে দেখছিল কেসটা। এবার নিজের হিম্মত দেখাতে এল।

চোঙাপ্যান্ট গম্ভীরভাবে টিনের একধারে ডান পা চাপিয়ে বৃদ্ধের দু বগলের ভেতর দিয়ে দু হাত গলিয়ে মারল এক হাঁচকা টান।

ব্যাস, টিনমুক্ত হয়ে উঠে এলেন বৃদ্ধ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন বিপর্যয়।

টিনের কানায় ভর দেওয়া উদ্ধারকর্তার জুতো গেল হড়কে। ফলে তার পাটা ডেবে গেল টিনের ভেতর ছানায়।

বৃদ্ধ উদ্ধারের আনন্দরোল জাগতে-না-জাগতেই প্রায় বিষম খেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা বাস। সব্বাই থ।

মুখ ভেটকে সন্তর্পণে পা-খানা টিন থেকে বের করে আনে যুবক। ডান পা হাঁটু অবধি ছানায় মাখামাখি। প্যান্টের ফাঁকে, জুতোর খাঁজে ঢুকেছে ছানা। নীল প্যান্ট ও কালো জুতোয় ছোপ ছোপ ধবধবে ছানা লেগে দারুণ খোলতাই হয়েছে। এমনকী সেই ছানায় ডোবা বৃদ্ধ অবধি নিজের দুর্দশা ভুলে হাঁ করে চেয়ে থাকেন। কাঁচা ছানার গন্ধে ভুরভুর করছে বাস।

যুবক ছানামাখা পা-খানা যথাসম্ভব দূরে রাখে নিজের বাকি দেহ থেকে। অন্য প্যাসেঞ্জাররাও যতটা পারে তফাতে সরে যায়। ওই পায়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

—'এঃহে'— ছানাওলার গলা দিয়ে জোর আক্ষেপটা তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বেরিয়ে যায়।

মাস্তানটি আওয়াজ লক্ষ্য করে ঘাড় ঘুরিয়ে ছানাওলাকে দেখেই গর্জে ওঠে— 'সাট আপ।'

ছানাওলা অমনি মুখ নীচু করে চুপ।

তার পাশের যাত্রীটি সহানুভূতির সুরে চাপা গলায় বলল, 'ইস কী হয়ে গেল!'

ছানাওলা ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীচুস্বরে বিড়বিড় করে, 'আরও যে কী আছে হায় বরাতে?'

হট্টগোল শুরু হতেই বাস থেমে গিছল। ড্রাইভার ফিরে বসে মন দিয়ে দেখছিল ব্যাপারখানা। এবার সে জিজ্ঞেস করল, 'ছানা নামবে কোথায়?'

উত্তর হল— 'মুচিপাড়া।'

বাস স্টার্ট দিল এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। বোধহয় চটপট মুচিপাড়া পৌঁছনোর তাগিদে। ওই আপদটাকে যত তাড়াতাড়ি বিদেয় করা যায়।

ছানামাখা যুবক দু পা ফাঁক করে রড আঁকড়ে সেইখানে খাড়া দাঁড়িয়ে। জানলার পাশে নিজের ফেলে আসা সিটের দিকে বারকতক চাইল বটে কিন্তু ফিরে গেল না। কারণ বোধহয় ভেবে দেখল যে তাহলে পায়ে পায়ে ঠেকিয়ে বসতে হবে। ফলে অন্য পায়ের প্যান্টটারও দফারফা নিশ্চিত।

ফাঁকা সিটটা আর এক যাত্রী তখন সসংকোচে দখল নিল।

ছানার টিনে আটকা পড়া বৃদ্ধ এতক্ষণ পার্টিশানের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়েছিলেন। কী কারণে, বোধহয় কতদূর এলেন দেখার উদ্দেশ্যে উল্টোমুখো হবার চেষ্টা করতেই অন্য প্যাসেঞ্জাররা হাঁ হাঁ করে উঠল— 'একদম পেছনে ফিরবেন না দাদু। ঘুরে যান। ঘুরে যান।'

বৃদ্ধ ঘাবড়ে গিয়ে তক্ষুনি আগের ভঙ্গিতে বহাল হলেন।

প্যাসেঞ্জারদের আপত্তি করার বিলক্ষণ কারণ ছিল। বৃদ্ধের পেছন দিকে ধুতি ও পাঞ্জাবির অনেকখানি পিঠের আধাআধি থেকে প্রায় হাঁটু অবধি ছানা লেপা। সুতরাং তার পিছন দিকের স্পর্শ বিপজ্জনক বৈকি।

—'খুক খুক'— চাপা হাসির আওয়াজ যেন?

ছানামাখা-পা যুবক ফিরে দেখল লেডিজ সিটে বসা দুই তরুণী তারই পানে চেয়ে মুখে আঁচল দিয়ে ফুলে ফুলে উঠছে। মাস্তানটির ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়তেই তারা গোটা মুখ কাপড়ে ঢেকে ফেলে।

যুবক ঘাড় ফেরাল। মেয়ে দুটিকে কিছু বলল না। তবে আশেপাশের পুরুষ প্যাসেঞ্জারদের মুখে কটমটিয়ে নজর বোলায় একবার। ভাবখানা যেন—

লেডিজদের ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু বেটাছেলে কেউ দাঁত বেরক করুক, বুঝবে ঠেলা।

পুরুষরা অবশ্য কেউ তেমন আস্পর্ধা দেখাল না। বেশির ভাগেরই বিমূঢ় ভাব তখনও কাটেনি। মজা উপভোগের মতন মনের অবস্থা নয়।

কিছুক্ষণ বাদে ফের সেই সন্দেহজনক খুক খুক শব্দ।

এবার যুবক আর ঘাড় ফেরায় না মেয়ে দুটির পানে। তবে সে আর এক প্রস্থ কড়া চোখে জরিপ করে নেয় পুরুষ যাত্রীদের হাবভাব।

ড্রাইভারের পাশে তিন সিটের ডগায় যে ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি ছানামাখা-পা যুবককে জিজ্ঞেস করলেন ডেকে, 'কদ্দূর যাবেন?'

উত্তর হয়— 'স্টেশন।'

—'আমার জায়গায় বসুন ভাই, অসুবিধে হবে না। আমি একটু পরেই নেবে যাব।' ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

প্রস্তাবটি যুবকের মনে ধরল। সে দু পায়ের মধ্যে ফাঁক রেখে ডান পা টেনে টেনে গিয়ে বসল ওই সিটে। বাঁ পা মুড়ে ছানামাখা ঠ্যাংখানা ছড়িয়ে দিল। অতঃপর গম্ভীর বদনে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল সিধে।

সিটের অন্য দুই যাত্রী পেছিয়ে গেল যতটা সম্ভব। আর ড্রাইভার ছানার গন্ধে একবার নাক কুঁচকালো বটে তবে আপত্তি জানাল না।

মুচিপাড়া এসে পড়ল।

নামল ছানার টিন। ছানায় পড়া সেই বৃদ্ধও নামলেন সেখানে। অতি সাবধানে। সবার গা বাঁচিয়ে।

—'ছানাটা নষ্ট হয়ে গেল তো?' লেডিজ সিটের জানলা দিয়ে একটা বউ সমবেদনা জানাল।

—'নাঃ, নষ্ট হবে কেন? তবে পোয়া তিনেক মাল লোকসান হল।' ছানাওলা জবাব দেয়।

—'ও ছানা দিয়ে কী হবে?' বউটি কৌতূহলী।

উত্তর এল— 'রসগোল্লা।'

—'অ্যাঁ সেকী!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। গরম রসে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে।' একগাল হেসে জানায় ছানাওলা।

শারদীয়া ১৩৯৫

হাবুর বিপদ

স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাবু ভাবল, থাক ফিরে যাই। গরমকাল। মর্নিং স্কুল হচ্ছে। আর কয়েক মিনিট পরে সাতটা বাজবে। ঘণ্টা পড়বে স্কুল আরম্ভের। একতলা স্কুল বাড়িটির ঘরে ঘরে ছেলেদের কলরব। উঠানে কিছু ছেলে খেলছে। হাবুর মনে ভেসে ওঠে সুধীরবাবু, ভারিক্কি চেহারা। গম্ভীর মুখ, মোটা চশমার কোণের আড়ালে বড়ো বড়ো দুটি চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি। হাবু জানে স্যার তাকে পছন্দ করেন। কিন্তু তা হলে ক্লাসের কাজে অবহেলা ক্ষমা করার লোক নন তিনি।

যদি স্কুল না যায়? সময় কাটাবার জায়গার অবশ্য অভাব নেই। দত্তদের আমবাগানে ঢুকলেই খাসা সময় কেটে যাবে। কিন্তু ক্লাস কামাই করলে কাল বাবার কাছ থেকে চিঠি আনতে হবে, অনুপস্থিত হবার কারণ দর্শিয়ে। তখন? বাবাকে কী কৈফিয়ত দেবে? বই হাতে স্কুলে বেরিয়ে গিয়েছিল কোন চুলোয়? অতঃপর অবধারিত মারাত্মক পরিণতির কথা ভেবে হাবু শিউরে ওঠে। ভীষণ রাগ হতে থাকে ভজার ওপর। ওর পাল্লায় পড়েই এই গণ্ডগোল। হাবু তো প্রথমে রাজি হয়নি। ভজাটা কিছুতেই ছাড়ল না। এখন?

বাবা না সুধীরবাবু? না না, বাবা কিছুতেই নয়। যদি বরাতে দুর্ভোগ থাকে স্যারের হাতেই হোক। হাবু স্কুলে ঢুকে পড়ে।

উঁহু, আজ লাস্ট বেঞ্চ নয়। ওটার ওপর স্যারদের চিরকাল কড়া নজর। মাঝামাঝি বসা যাক। ভাগ্যে থাকলে পাঁচ-ছজনের ভিড়ে মিশে হয়তো এ যাত্রায় পার পেয়ে যেতে পারে। থার্ড বেঞ্চের এককোণে তিনকড়ির পাশে হাবু বসে পড়ল।

পর পর তিনটে ক্লাস কেটে গেল। এবার আসবেন সুধীরবাবু। বাংলা রচনার ক্লাস। তারপর টিফিন। হাবু বাইরে যতটা সম্ভব শান্ত থাকবার চেষ্টা করছে। বুকের মধ্যে কিন্তু তার হাপর পড়ছে।

সুধীরবাবু ধীর পদক্ষেপে ক্লাসে ঢুকলেন। দশাসই মানুষটির পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। কাঁধে পাট করা সাদা চাদর। ছাত্ররা তাঁকে ভয়-ভক্তি দুটোই করে। ছাত্রদের উন্নতির জন্য তিনি প্রচুর খাটেন, তবে বড্ড কড়া মাস্টার।

চেয়ারে বসে সুধীরবাবু প্রশ্ন করলেন, 'গতবারে কী রচনা লিখতে দিয়েছিলাম জান?'

—'বাংলাদেশে বর্ষাকাল।'

—'ও হ্যাঁ। সবাই লিখে এনেছ?'

—'হ্যাঁ স্যার!' ক্লাসসুদ্ধ ছেলেরা ঘাড় হেলে।

—'বেশ, কয়েকটা শোনা যাক।'

ছেলেরা যে যার রচনা খাতা বের করে ওপরে রাখে।

এটাই সুধীরবাবুর মেথড। কয়েকজনকে বেছে বেছে পড়তে বলেন। অন্যদের বলেন মন দিয়ে শুনবে। অন্যের লেখা শুনলে নিজের লেখার মান সম্বন্ধে একটা ধারণা হবে। আমি তো সবার খাতা বাড়ি নিয়ে গিয়ে শুধরে দেব। কিন্তু প্রত্যেকের লেখা তো প্রত্যেকে পড়তে পারবে না। অন্তত ক্লাসে কয়েকখানা রচনা শোনা যাক। কে কেমন লিখেছে কিছুটা জানো।

—'প্রফুল্ল পড়ো।' সুধীরবাবু আদেশ দিলেন।

প্রফুল্ল খাতা খুলে 'বাংলাদেশে বর্ষাকাল' পড়তে আরম্ভ করে। পাতা দুই শোনার পর হঠাৎ ধমকে ওঠেন, 'থামো। আমি রচনা লিখতে বলেছি। বই থেকে কপি করতে বলিনি।'

—'কেন স্যার?' প্রফুল্ল আমতা আমতা করে।

—'আবার কেন। দে-সরকারের রচনার বই থেকে হুবহু টুকে এনেছে। এ চলবে না। কাল নতুন করে লিখে এনে দেবে। আর কষ্ট করে আরও দু-একখানা বই উল্টিও। মনে থাকবে?'

এবার তাঁর লক্ষ্য লাস্ট বেঞ্চ।

—'নিতাই?'

নিতাই নামকরা ফাঁকিবাজ। প্রথমটা ভান করল যেন শুনতেই পায়নি।

—'নিতাই?'

—'আমাকে বলছেন স্যার?'

—'হ্যাঁ, ক্লাসে আর কটা নিতাই আছে? পড়?'

নিতাই মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। —'কী হল?'

—'আজ্ঞে লিখতে পারিনি।'

—'কেন?'

—'আজ্ঞে, সময় পাইনি, মায়ের অসুখ।'

—'ও তোমায় বুঝি মায়ের সেবা করতে হয়েছে। দুই দিদি কী করছিল?'

—'আজ্ঞে বারবার ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা করতে হয়েছে কি না। বাবার মোটে সময় নেই তাই।'

—'কী হয়েছে তোমার মায়ের?'

—'জ্বর, সর্দি, কাশি।'

—'এখন কেমন আছেন?'

—'জ্বর ছেড়েছে। আজ ভাত খেয়েছেন।'

—'মিথ্যাবাদী!' সুধীরবাবুর গর্জনে সারা ক্লাস কেঁপে ওঠে। 'গতকাল তোমার মাকে দেখেছি গোঁসাইবাড়িতে কীর্তন শুনছেন। দাঁড়িয়ে থাকো ওই কোণে, টিফিনেও বেরুবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে। কালকেই তোমার রচনা চাই। এই নিয়ে পর পর দুদিন হল। এর পরে যদি রচনা আনতে ভুল হয় তাহলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। মনে থাকবে?'

—'মনে থাকবে,' সুধীরবাবুর একটি মুদ্রাদোষ। মনে থাকুক না থাকুক তিনি সবাইকে বলে যান— 'মনে থাকবে?'

—'প্রশান্ত!'

ফার্স্ট বয় প্রশান্ত খাতা বাগিয়ে বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বেশ দীর্ঘ রচনা, সুন্দর গুছিয়ে লেখা। বর্ষার বর্ণনায় কয়েকটা তালমাফিক কবিতার উদ্ধৃতি হয়েছে। সুধীরবাবু মন দিয়ে শোনেন।

তবে ছেলেরা লক্ষ্য করে স্যারের কপালের মাঝখানে একটি ভাঁজ অর্থাৎ তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন। ওই ভাঁজ তার চিহ্ন।

প্রশান্তর পাঠ শেষ হয়, সুধীরবাবু বললেন, 'ভালো হয়েছে, তবে আরেকটু মৌলিক হওয়া উচিত। শুধু রচনা বইগুলোর ওপর নির্ভর করবে কেন? চাই নিজস্ব ভাব, ভাষা। নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তবেই রচনার প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য আসবে। মনে থাকবে?'

প্রশান্ত একটু ক্ষুণ্নমনে বসে পড়ে।

সুধীরবাবুর সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরছে, 'হাবুলচন্দ্র!'

হাবু নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

'হাবুল!'

হাবু এবার উঠে দাঁড়ায়। উঃ, কী ভাগ্য তার!

—'পড়ো তোমার রচনা।'

হাবু হাইবেঞ্চে রাখা বইখাতাগুলোর ওপর থেকে একটা খাতা তুলে নিল। পাতা খুলে ওর সামনে মেলে ধরে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

—'কী আরম্ভ করো। বড্ড সময় নিচ্ছ।' সুধীরবাবু তাড়া দেন।

—'হ্যাঁ স্যার।' হাবু পড়তে শুরু করে—

—'আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাসকে বাংলাদেশে বর্ষাকাল বলে। এই দুই মাসে প্রচুর বৃষ্টি পড়ে তাই এই ঋতুর নাম বর্ষা। বর্ষার আগে গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম পড়ে। তখন মাঠ-ঘাট শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। ডোবা, পুকুরের জল যায় মরে। সূর্যের তাপে মানুষজন, পশুপাখি, গাছপালা সবাই হাঁসফাঁস করতে থাকে। মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টি হয় বটে, তবে বৃষ্টি দু-এক পশলা, ঝড়ের দাপটটাই হয় বেশি। জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করে। আষাঢ় মাসে নামে অঝোর বৃষ্টিধারা। বর্ষা এসে সব-কিছু ভিজিয়ে দেয়। প্রকৃতি স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।'

হাবু প্রথম দিকটায় ঠেকে ঠেকে আস্তে আস্তে পড়ছিল। ক্রমে তার পড়ার গতি বাড়ে, বেশ ঝরঝর করে বলে চলে।

'বর্ষা নামে বাংলাদেশের সব জায়গায়। শহরে, গ্রামে, জঙ্গলে পাহাড়ে। শহরে বর্ষা কোনো দিন দেখিনি, তবে গ্রামে থাকি কিনা, তাই প্রতি বছরই বর্ষাকালে গ্রামের অবস্থা কেমন হয় বেশ জানি। দেখতে দেখতে মজে যাওয়া পুকুর, ডোবা, খাল, বিল জলে ভরে ওঠে। রাস্তাঘাট হয় কাদা প্যাচপ্যাচে। চলতে ফিরতে তখন ভারি অসুবিধা। কাগজে পড়েছি শহরে রাস্তাঘাট ভালো, কাদা হয় না। কিন্তু সেখানেও রাস্তায় জল জমে। কাগজে ছবি দেখেছি, কলকাতার কোথাও কোথাও এক কোমর জল দাঁড়িয়েছে। লোকে নৌকা চালাচ্ছে।'

—'অ্যাই তিনকড়ি, মুখ নামাও।' সুধীরবাবু ধমকে ওঠেন।

তিনকড়ি হাঁ করে হাবুর খাতার পানে চেয়ে ছিল। তৎক্ষণাৎ ঘাড় নামায়। হাবু চমকে পড়া বন্ধ করে।

—‘হুঁ। তারপর।’ সুধীরবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেন। হাবু আরম্ভ করতে একটু দেরি করে। খাতার ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে।

—‘কী হল?’ নিশ্চয় নিজের হাতের লেখা নিজেই পড়তে পারছে না। নাঃ, বকে বকেও হাতের লেখার উন্নতি করা গেল না ছেলেটার। সুধীরবাবু ভাবেন।

হাবু আবার পড়ে—

—‘তবে বর্ষাকালে চাষিদের ভারি ফুর্তি। বৃষ্টি ভালো হলে চাষ ভালো হবে। অনেক ফসল উঠবে ঘরে। যে বছর বৃষ্টি কম হয় সেবার তাদের মাথায় হাত। বাগদীপাড়ার রাম অনাবৃষ্টির বছর আমাদের গোলা থেকে ধান নিয়ে যায়। নইলে যে তার ছেলে বউ না খেতে পেয়ে মরবে। বেশি বৃষ্টির আবার বিপদ আছে, নদীতে বন্যা হয়। আগের বছর আমাদের গাঁয়ের পাশে খরস্রোতা নদীতে বান ডাকল। দুপাশে মাঠ ভেসে গেল। কত শস্যক্ষেত ডুবে নষ্ট হল। গাঁয়ের মধ্যেও জল ঢুকে এসেছিল। ছোটো ছোটো অনেক মাটির ঘর পড়ে গেল। মাঝরাত্রে বান এসেছিল। ভাগ্যিস দুলু মাঝি হাঁক দিয়ে ডেকে সবাইকে সাবধান করে দিল, নইলে অনেকে ভেসে যেত। আমাদের বাড়িতে অনেক পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছিল সে রাতে।...’

সুধীরবাবু মন দিয়ে শোনেন। খাসা লিখছে। বই-টইয়ের ধার ধারেনি। সব নিজের অভিজ্ঞতা, ভাষাটিও সুন্দর— ছেলেটা চর্চা রাখলে বড়ো হয়ে নির্ঘাত সাহিত্যিক হবে।

ফার্স্ট বয় প্রশান্ত পাশের ছেলেকে কনুই দিয়ে মৃদু গোঁতা মারল, ‘শুনছিস? স্রেফ আবোল তাবোল। পয়েন্ট কই?’ সে ফিসফিসিয়ে বলে।

—‘তিনকড়ে—!’ তিনকড়ি আবার ঊর্ধ্বগ্রীবা বিস্ফারিত নয়নে হাবুর মুখের দিকে চেয়েছিল। স্যারের ধমক শুনে মাথা নোয়ায়।

হাবু পড়ে যায়। বর্ষাকালে তার গ্রামের জীবনের নানা বিচিত্র কাহিনি—

বর্ষায় নাকি অসুখ-বিসুখ খুব বাড়ে। বিশেষত পেটের অসুখ আর সর্দিজ্বর। ডাক্তারবাবুরা নাকি নাওয়া খাওয়ার সময় পান না তখন। গাছে গাছে সবুজ পাতা বেরোয়। কখনও সখনও সারারাত টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়। আর ব্যাংগুলো পাল্লা দিয়ে হেঁড়ে গলায় গান জোড়ে। ভারি মজা লাগে। জলে গর্ত বুজে যাওয়ায় মাঝে মাঝে ঘরের দাওয়ায় সাপ উঠে আসে। প্রত্যেক বছরই গ্রামের দু-একজনকে সাপে কামড়ায়।

‘ভোরবেলা চাষিরা লাঙল কাঁধে হেট হেট করে গোরু তাড়িয়ে ক্ষেতে যায়।

দুপুরেও মাঠে থাকে। তাদের ঘরের লোক ভাত নিয়ে যায় দুপুরে খাবার জন্যে।'

আরও অনেক কিছু লিখেছে সে। মাঝে মাঝে পাতা উলটিয়ে বলে চলে—

বর্ষাকালে গ্রামে তাদের কী সব পালাপার্বণ ব্রত হয়। ওই সময় স্কুলে নাকি ছাত্র কম আসে। তাদের ক্ষেতে কাজ করতে হয়, তাই ছুটি নেয়। হাবুর কাজ করার দরকার নেই। তাই রোজ স্কুলে আসতে বাধ্য হয়। এমনি কত—

হাবুর রচনা শেষ হল। সুধীরবাবু স্মিতমুখে বলেন, 'বেশ হয়েছে, নিজের দেখা জিনিস লিখেছ। খুব ভালোভাবে আর একটু গুছিয়ে লেখা দরকার।'

তিনি ঘড়ি দেখলেন ক্লাস শেষ করতে আর পনেরো মিনিট বাকি। এবার সামনের সপ্তাহের রচনার বিষয় দিয়ে দেবেন আর এ সপ্তাহের খাতাগুলো নিয়ে নেবেন সংশোধনের জন্য। 'হরিপদ, খাতা নাও।'

মনিটর হরিপদ প্রত্যেকের কাছে গিয়ে রচনা খাতা সংগ্রহ করতে লেগে যায়। সুধীরবাবু ভাবেন আসছে বারে কী রচনা দেওয়া যায়! ঠিক আছে, দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোর পৌরাণিক আখ্যানটা বলে দেবেন ক্লাসে।

—'স্যার, হাবু খাতা দিচ্ছে না।'

হরিপদর ডাকে সুধীরবাবু অবাক হন। 'কেন?'

—'তা জানি না। বলছে কালকে দেবে।'

—'হাবুল!'

হাবু উঠে দাঁড়ায়।

—'খাতা দিচ্ছ না কেন?'

হাবুর মুখে কথা নেই।

—'কী উত্তর দাও?'

—'আজ্ঞে, কাল ভালো করে লিখে দেব।'

—'দেখি খাতাটা।' সুধীরবাবু রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করলেন।

হরিপদ হাবুর রচনা খাতার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াতেই তিনকড়ি টপ করে ওপরের খাতাখানা তাঁর হাতে তুলে দেয়। হরিপদ সেখানা স্যারের হাতে সমর্পণ করে।

খাতার মলাটে চোখ বুলিয়েই তাঁর কাছে রহস্য পরিষ্কার হয়— গোটা গোটা করে লেখা 'বীজগণিত খাতা'।

ও, এইজন্যে এত ধানাই পানাই! কাল ভালো করে লিখে এনে দেব। নাঃ, ছেলেটা অতি অগোছালো! তিনি পই পই করে সব্বাইকে বলে দিয়েছেন একটা আলাদা রচনা খাতা করতে। যা-তা খাতায় লিখবে না। দু সপ্তাহে একটা বাংলা

রচনার ক্লাস, তিনি সমস্ত খাতা বাড়ি নিয়ে যান। ভালো করে সংশোধন করে তিন-চার দিন পরে খাতা ফেরত দেন। এবার অবশ্য ফেরত দিতে আরও তিনদিন বেশি দেরি হয়েছিল। শ্রীমান ইতিমধ্যে হোমটাস্ক লিখে বসে আছে। তাড়াতাড়ি লিখেছ খুব ভালো কথা। কিন্তু তা বলে অঙ্ক খাতায় লিখবে? কোনো আলগা কাগজে বা রাফখাতায় লিখতে পারত। তারপর আসল খাতা ফেরত পেলে তাতে টুকে নিত। আর হতে পারে হাবুল রচনা খাতাটি হারিয়ে বসে আছে। ফলে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাতেই লিখেছে। ছি ছি একী নোংরামি, আজ তিনি আচ্ছা করে ধুচুনি দেবেন হাবুলকে। ছেলেখেলা পেয়েছে? সুধীরবাবু খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে হাবুকে বকুনি দেবার জন্য মনে মনে কড়া কড়া বাক্য ভাঁজতে থাকেন।

অ্যাঁ এ কী! খাতা শেষ! কিন্তু রচনা কই?

—'হরিপদ, তুমি ভুল খাতা দিয়েছ, এতে রচনা নেই।'

—'অ্যাই, ঠিক খাতা দে। যেটায় লিখেছিস।' হরিপদ হাবুকে তাড়া লাগান।

তিনকড়ি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না স্যার। ওই খাতা দেখেই পড়েছে।'

হ্যাঁ, তাই তো! নীল মলাটে রবিঠাকুরের ছবি ছাপা। তিনি পড়বার সময় লক্ষ্য করেছিলেন। সুধীরবাবু আর একবার পাতাগুলো সব উল্টে দেখেন, নেই!

ব্যাপার কী? ম্যাজিক নাকি? তিনি কী রকম ঘাবড়ে যান। তিনি শুনলেন, ক্লাসের ছেলেরা শুনল— অত বড়ো লেখাটা পড়ল।

—'হাবু, এই খাতা দেখেই পড়েছ?'

—'হ্যাঁ,' হাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

—'তবে লেখা কই?'

হাবু নীরব নিস্পন্দ। 'কী? উত্তর দাও।' হাবু চুপ।

তবে কি সম্ভাবনাটা বিদ্যুতের মতো তাঁর মস্তিষ্কে উদায় হয়। কিন্তু এ যে অবিশ্বাস্য।

—'তবে কি মানে, তুমি কি লেখনি? বানিয়ে বানিয়ে বললে?'

—'হ্যাঁ স্যার।' ক্ষীণ কণ্ঠে হাবুর উত্তর আসে।

সুধীরবাবু হতভম্ব। তাঁর কুড়ি বছরের মাস্টারি জীবনে এ সমস্যা একেবারে অভিনব। শোনেননি কখনও।

প্রথমেই তাঁর কান গরম হয়ে উঠল রাগে। কী আস্পর্ধা। বেমালুম ঠকাল আমাকে। বেয়াদপ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তাটা মাথায় আসে।

চশমার পুরু কাচের ভিতর থেকে সুধীরবাবুর বড়ো বড়ো চোখ দুটোর স্থির দৃষ্টি হাবুর ওপর নিবদ্ধ। শুধু হাবু নয়, গোটা ক্লাস কাঠ হয়ে আছে ভয়ে। হাবুর ভবিষ্যৎ ভেবে সবাই আতঙ্কিত। হাবু মনে মনে জপছে— হে ভগবান। যা হয় ইস্কুলে, বাবার কানে যেন না পৌঁছায়। হে ভগবান দয়া করো।

তখন সুধীরবাবুর মাথায় ঘুরছে— অদ্ভুত কাণ্ড! অতখানি রচনা স্রেফ বানিয়ে বলে গেল। আর এমন সুন্দর করে। আশ্চর্য! সত্যি বলতে কি তাঁর ইচ্ছে করছে নেমে গিয়ে ছেলেটার পিঠ চাপড়ে বলেন, 'সাবাস!'

না, অতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। ক্লাসের ডিসিপ্লিন রাখা তাহলে শক্ত হয়ে পড়বে। হয়তো এর পর থেকে প্রত্যেক ছেলে না লিখে বানিয়ে বলবার চেষ্টা করবে হাবুর দেখাদেখি। অবশ্য আর কারও ক্ষমতা নেই অমন বানায়। এমনকী ফার্স্ট বয় প্রফুল্লরও সাধ্য নেই।

থমথমে মুখ, গুরুগম্ভীর স্বরে সুধীরবাবু বললেন, 'কী, লেখনি কেন? দুসপ্তাহের মধ্যে সময় হল না!'

—'আজ্ঞে, ভেবেছিলাম কাল সন্ধেবেলা লিখে ফেলব।' হাবু মিনমিন করে, 'কিন্তু গোপালপুরের মেলা গিয়েছিলাম বিকেলে। ফিরতে রাত হয়ে গেল। এসে দেখি খেতে দিচ্ছে। খেয়ে পড়া বাবার বারণ, তাই—'

—'হুম! তা সোজাসুজি স্বীকার করলে পারতে—'

—'ভেবেছিলাম করব।'

—'ও! তারপর বুঝি বুদ্ধি গজাল?'

—'না স্যার!' হাবুর কণ্ঠে কান্নার আভাস।

'বেশ, মনে থাকে যেন। কাল আমার রচনা চাই। ঠিক যা যা বললে সব পরিষ্কার করে লিখে আনবে। মনে থাকবে? খাসা বলেছ।'

শারদীয় ১৩৭৮

কার অধিকারে?

বাস চলছিল গড়িয়ে গড়িয়ে, থেমে থেমে। চৌমাথা থেকে বাজার অবধি পথে বেজায় ভিড়। তাছাড়া প্যাসেঞ্জারও ওঠেনি তেমন; অনেক সিট খালি। হয়তো আরও লোক তোলার আশায় বাস আস্তে আস্তে ধরছিল। কন্ডাক্টার ক্রমাগত চিৎকার করছে— 'দুর্গাপুর, ইলেমবাজার, পানাগড়, দুর্গাপুর— চলে আসুন।'

আমি বসেছিলাম ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, চকচকে পিতলের রডগুলোর গায়ে কোণের সিটটায়। ওখান থেকে ড্রাইভারের হাবভাব বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। ড্রাইভারের বাঁপাশের সিটে একজন মাত্র যাত্রী। তার পায়ের কাছে মস্ত উঁচু এক লুঙ্গির গাঁটরি। লোকটি বৃদ্ধ। পরনে ধুতি ও শার্ট, নাকের ডগায় গোল ফ্রেম চশমা, রোগা চেহারা, মাথায় কদমছাঁট পাকা চুল। সে বাসের ঝাঁকুনির তালে তালে টলটলায়মান লুঙ্গির মনুমেন্টটিকে কোনোরকমে আঁকড়ে ধরে সামলাচ্ছিল।

ঘন ঘন থামছে গাড়ি, আবার বিনা নোটিশে গোঁত্তা মেরে এগোচ্ছে। ফলে লোকটি গাঁটরি সামলাতে কিঞ্চিৎ বেগ পাচ্ছিল বোধহয়। হঠাৎ সে বলল— 'বাজারের পথটা পেরোতে আর কতক্ষণ লাগবে হে?'

সঙ্গে সঙ্গে— ঘ্যাঁচ! ব্রেক কষল বাস। যুবক ড্রাইভার আধখাওয়া বিড়িটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাঁটরির মালিকের মুখোমুখি ঘুরে বসে কড়া গলায় বলল— 'কী মশাই, ভদ্রতা জানেন না? আমায় "হে" বললেন যে, অ্যাঁ! কোন অধিকারে? কী রাইট আপনার?'

আচমকা ড্রাইভারের এই রুদ্রমূর্তি দেখে লোকটি থতমত হয়ে গেল। কাঁচুমাচুভাবে ক্ষীণ হেসে বলল, 'এঁহে, তা অধিকার একটু আছে তো—'

ড্রাইভারের তর্জনে বৃদ্ধের বাকি কথা আর শেষই হল না।

—'বটে? আবার অধিকার ফলানো হচ্ছে? বলতে চান বয়সে বড়ো? তবে আর কি, এক্কেবারে মাথা কিনে নিয়েছেন। যা খুশি তাই বলা যাবে।'

—'না, মানে আমি—' বৃদ্ধ মিনমিন করে কী বলতে যেতেই এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল ড্রাইভার।

—'থাক থাক আর ন্যাকা সাজবেন না। হে-টে আবার কোনদিশি ডাক? যত্তসব অভদ্র। আমাদের বুঝি প্রেস্টিজ-টেস্টিজ নেই? বলি, কোট-প্যান্ট পরা বাবু হলে এমন হে-টে বেরুত মুখ দিয়ে?' তার গজর গজর আর থামে না। বেচারা বৃদ্ধ ঘাবড়ে গিয়ে চুপ। সে বিমর্ষভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম, ড্রাইভারটির আত্মসম্মান খুব প্রখর এবং হে সম্বোধনে বিশেষ আপত্তি আছে।

ড্রাইভারের বকুনি অবশ্য বেশিক্ষণ চলার সুযোগ হল না। অন্য যাত্রী হৈ হৈ করে উঠল— 'ও দাদা, এবার স্টার্ট দিন, লেট হয়ে যাচ্ছে। চলতে চলতে লেকচার হোক'... ইত্যাদি।

তাড়া খেয়ে বাস ছাড়ল। বার কয়েক নিজের মনে বকবক করে ড্রাইভার অ্যাকসিডেন্ট বাঁচাতে মন দিল।

জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। দুপাশে উদার মাঠ, দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত। গোছা গোছা হলুদ শীষভরা ধানগাছের ডগাগুলো হাওয়ায় ঢেউ খেলছে। মাঝে মাঝে আলের পথ বেয়ে হন হন করে চলেছে কর্তা, তার ঘাড়ে রংচঙে টিনের বাক্স। চার-পাঁচ হাত পিছনে চলেছে ঘোমটা ঢাকা স্ত্রী; কাঁখে ছেলে। অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে, আবার দৌড়ে গিয়ে ধরছে স্বামীকে। মাথায় তরিতরকারি নিয়ে যাচ্ছে হাটুরে। রাখাল ছেলেরা দূর থেকে মুখ ভেঙাচ্ছে বাসের প্যাসেঞ্জারদের। রাস্তার ধারে বড়ো ছোটো পুকুর। ঘাটে কাপড় কাচছে বউ-ঝিরা। ছোটো ছেলেরা সাঁতার কাটছে আর তোলপাড় করছে জল। কোথাও জলের ধারে ছিপ হাতে ধ্যানমগ্ন একটি লোক, অন্য পারে একই ভঙ্গিতে এক বক। কখনো সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে লম্বা লেজওলা ফিঙে। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ড্রাইভার ও গাঁটরির মালিক সেই বৃদ্ধের মধ্যে নীচুস্বরে কী জানি কথাবার্তা হচ্ছে।

অবাক হয়ে দেখি, প্রায়ই বাস থামলে ড্রাইভার নিজে থেকেই ঘাড় বাড়িয়ে দেয় বৃদ্ধের দিকে। চাপা স্বরে কথা হয়। বৃদ্ধের কথায় ড্রাইভার ঘনঘন মাথা

দোলায়, হাসে। বাঃ, ড্রাইভারের রাগ দেখছি পড়ে গেছে। বোধহয় বৃদ্ধের ওপর একটু বেশি মেজাজ দেখানো হয়ে গেছে ভেবে সে এখন লজ্জিত। তাই আলাপ-টালাপ করে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

এক স্টপেজে ড্রাইভারের কোনো চেনা লোক তাকে একটি সিগারেট অফার করল। দেখলাম, ড্রাইভার একটু বিব্রতভাবে চোখ টিপে তাকে ইশারা করল— না। ফের সে বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

এমনি চলল পানাগড় অবধি।

পানাগড়ে বাস থামতে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল, নামবে বলে। পাশের দরজা খুলে তড়াক করে লাফিয়ে নামল ড্রাইভার। ছুটে গিয়ে হাজির হল বাসের সিঁড়ির মুখে। নিজেই টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনল লুঙ্গির গাঁটরি।— 'রিকশা, অ্যাই রিকশা!' হাঁক পাড়ল সজোরে। বাসের ছোকরা হেলপারকে ডাক দিল— 'ওরে কেষ্টা, রিকশায় তুলে দে মালটা।' তারপর সে একছুটে ঢুকল সামনের মিষ্টির দোকানে।

বৃদ্ধ ও মাল সাইকেল-রিকশায় উঠল। হন্তদন্ত হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ড্রাইভার। হাতে একটা হাঁড়ি, খুব সম্ভব মিষ্টি আছে তাতে। বৃদ্ধের কোলে গুঁজে দিল হাঁড়িটা। টুকরো টুকরো কথা এল কানে— 'বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে। না না, তাতে কী, এই সামান্য'— হাত কচলাতে কচলাতে সে টুক করে একটা পেন্নামও ঠুকে দিল বৃদ্ধকে।

রীতিমতো আশ্চর্য হলাম। ড্রাইভারটির রাগ ও প্রায়শ্চিত্ত দুই-ই দেখছি বাড়াবাড়ি ধরনের। রিকশা ছেড়ে দিতে ও ফিরে এল। মাথা নেড়ে সমানে বিড়বিড় করছে : 'আরে ছি ছি। আরে ছি ছি— কী কাণ্ড!'

বেজায় কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম— 'কী ব্যাপার মশাই?'

সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আর বলবেন না স্যার, কেলেঙ্কারি!!'

—'কেন? কে উনি?'

ড্রাইভার চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'মামাশ্বশুর!'

বললাম, 'সে কী, মামাশ্বশুরকে চিনতে পারেন নি।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'কী করে চিনব বলুন, একটিবার মাত্র দেখেছি। সেই বিয়ের সময়। বছর খানেক আগে ওই হট্টগোলের মাঝে কত রকমের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সবাইকে কি মনে আছে ছাই। হঠাৎ সন্দেহ হল কেমন চেনা-চেনা ঠেকছে। আর কী সব বলছিল, অধিকার টধিকার আছে, ভাবলাম একটু খোঁজ

নিই তো। ব্যাস, বেরিয়ে গেল— কুটুম্ব। একেবারে সাক্ষাৎ গুরুজন। পানাগড়ে কাপড়ের দোকান আছে! বউ ছেলেবেলায় কয়েকবার এসেছে এনাদের বাড়ি। ইস, বউয়ের কানে যদি ঘটনাটা যায়?'

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে ড্রাইভার বলল— 'ওনার ব্যাভারটাও কিন্তু উচিত হয়নি, যাই বলুন। উঠেই পরিচয় দে, না ঘাপটি মেরে মজা দেখছেন। বললেন, বাবাজী আমায় চিনতে পার কিনা পরখ করছিলুম।'

আমার দিকে কাতর চোখে চেয়ে সে বলল— 'এক কেজি স্পেশাল রাজভোগ দিলাম। পড়বে না রাগটা? বউয়ের কাছে আর বোধহয় কথাটা তুলবেন না। কী বলেন দাদা?'

আমি ভরসা দিলাম, 'কিছু ঘাবড়াবেন না। আমার তো মনে হল উনি মোটেই চটেননি। বেশ হেসে কথা-টথা বলছিলেন দেখলাম।'

—'ও ড্রাইভার দাদা। ছাড়ুন ছাড়ুন। লেট হয়ে যাচ্ছে—' বাসের যাত্রীরা চিৎকার শুরু করল। কন্ডাক্টারও ঘন্টি মারছে ঘনঘন। ড্রাইভার আমার কাছে আরও একটু সান্ত্বনা পাবার আশায় ছিল। তাড়া খেয়ে মহা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে ঘ্যাঁচ করে একসেলারেটার চাপল। ঝাঁকুনি খেয়ে এগোল বাস।

১৩৮৭

প্রতিশোধ

ট্রাকটা যখন সিউড়ি পৌঁছল তখন সন্ধে নেমে গেছে। শহরের মধ্যে ঢুকে একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা থামিয়ে অর্জুন সিং বলল, 'মন্টু ভাই, আমরা এখানেই আস্তানা গাড়ব। আমার চেনা হোটেল। খানাপিনা ফাস্ট ক্লাস। নাস্তা করে তুমি বেরিয়ে পড়ো তোমার দুশমনের খোঁজে।'

দোতলায় একখানা ডবল বেড ঘর নেওয়া হল অর্জুন সিং আর মন্টুর জন্য। ট্রাকের খালাসি রামপ্রসাদ থাকবে নীচে। ঘরে নিজেদের জিনিসপত্র রেখে মুখ হাত ধুয়ে, চা-টা খেল তারা। তারপর মন্টু পথে বেরল পায়ে হেঁটে। অর্জুন ট্রাক নিয়ে গেল কাছেই একটা গ্যারেজে রাখতে।

প্রায় কুড়ি বছর বাদে মন্টু সিউড়ি এল। অনেক বদলেছে শহরটা। ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে চলে মন্টু। অনেক পুরনো বাড়ি ভেঙে বড়ো বড়ো হাল ফ্যাশানের বাড়ি তৈরি হয়েছে। অনেক কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। সরু রাস্তা চওড়া হয়েছে। দোকানপাটও বেড়েছে প্রচুর। বেড়েছে রাস্তার যানবাহন ও পথচারীর ভিড়। অনেক ফাঁকা মাঠ গ্রাস করেছে ঘরবাড়ি। মন্টু সাবধানে দুপাশে নজর রেখে চলে। পুরনো কিছু কিছু বাড়ি, দোকান, গাছ ইত্যাদি খেয়াল করে এগোয়। নানান বাঁক ঘোরে পথে। একটু একটু করে তার গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি হতে থাকে। তারপর থমকে দাঁড়ায় একটা ঝকঝকে তেতলা বাড়ির সামনে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে উথালপাথাল। মন্টু কাঠ হয়ে মোহাবিষ্টের মতন ওই বাড়িটা দেখে। নীচের তলায় একটা মস্ত সাইকেলের দোকান। ওপরের দুটো তলায় মনে হল লোকের বাস।

এইখানেই ছিল। তবে এই বাড়ি নয়। মন্টুর মনে ভেসে ওঠে একটা একতলা

পুরনো বাড়ির ছবি। পলেস্তারা খসা দেয়াল। বাড়ির সামনে ফালি জমিতে ফুলগাছের বাগান। মাঝখান দিয়ে সরু ইট বাঁধানো পথ। লোহার শিকে তৈরি গেট। যেখানে কেটেছে তার ছোটোবেলার অনেকগুলি বছর। মন্টু ব্যাকুল হয়ে আশেপাশে তাকায়। ওই তো পলাশ গাছটা আজও রয়েছে। বসন্তে ওর ডালে ডালে যেন আগুন জ্বলত। কাছাকাছি আরও কয়েকটা বাড়ি দেখছি আজও একই রকম আছে।

প্রবল উচ্ছ্বাস চাপতে মাথা ঝিমঝিম করে মন্টুর। বহু আগেকার প্রায় মুছে যাওয়া কত ঘটনার স্মৃতি ক্রমে উজ্জ্বল হয়। কত আনন্দের স্মৃতি, কত বেদনার স্মৃতি তোলপাড় ঢেউ তুলে ধেয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা স্মৃতি, যা এতকাল দূরে থেকেও কখনো ক্ষীণ হয়নি। প্রায় প্রতিদিনই ঘটনাটা তার স্মৃতিপটে চাবুক মেরেছে। সেই প্রবল রাগ আর ঘৃণা ভরা স্মৃতিটা এখানে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে লকলক করে শিখা তোলে। মাথার ভিতর ফের দপ করে ওঠে প্রতিহিংসার আগুন। বিশ্বনাথ ওরফে বিশে গুন্ডার কদাকার আকৃতিটা ফুটে ওঠে মনে।

বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স। মিশকালো রং। মোটা গোঁফ। ঝাঁকড়া কালো চুল। লোমশ ভুরুর নীচে নিষ্ঠুর দুটো চোখ। বিশাল দেহ। সর্বদা খচমচ করে পান চিবুচ্ছে আর কষে পিচ গড়াচ্ছে। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। গলায় সোনার চেন। পরনে সদাই ধবধবে সাদা ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি। ওই মোষের মতন চেহারায় তাতে রূপটা আরও খোলতাই হত।

কোথায় সে? দমবন্ধ উত্তেজনায় মন্টু বিশ্বনাথকে দর্শনের আশায় চারধারে চায়। কিন্তু দেখতে পায় না। তারপরেই একটা কথা মনে হতে তার হুঁস ফেরে।

এতকাল বাদে বিশ্বনাথকে দেখলে সে কি চট করে চিনতে পারবে? মন্টুকে দেখলেই কি আর এখানকার পুরনো লোকেরা চিনবে এক নজরে? বছর বারোর সেই রোগা পাতলা ভ্যাবলা ছেলেটা আর আজকের ছ-ফুট লম্বা, শক্তপোক্ত জোয়ান স্মার্ট যুবকটির মধ্যে কতটুকু মিল? তার সেই কিশোর মুখখানা কত ভেঙেচুরে গেছে। টিকলো নাক এখন খাড়া। তার সেই বয়সের ফ্যাকাশে ফর্সা রং আজ রোদে জলে ঘুরে তামাটে। পাট পাট করে একপাশে আঁচড়ানো চুল ভোল পাল্টে এখন ঘাড় ছোঁয়া, ঢেউ খেলানো। নাঃ, নিজে থেকে পরিচয় না দিলে আগের মন্টুকে যারা দেখেছে তারা এখন চিনতে পারবে না মোটেই।

এই বাড়ি থেকে পাঁচখানা বাড়ি তফাতে একটা চায়ের দোকান ছিল। সেখানেই আড্ডা মারত বিশে আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। কখনো দোকানের বেঞ্চি

জুড়ে। কখনো সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হেন কুকাজ নেই তারা করত না। পাড়ার লোক তাদের যমের মতো ভয় পেত।

মন্টু পায়ে পায়ে সেই দোকানের দিকে যায়।

আরে সেই দোকানটা যে এখনও টিকে আছে! তবে ক্যাশবাক্সের পিছনে বসা সাধুচরণের জায়গায় এখন অন্য লোক। দোকানের ছিরি কিছুটা পাল্টেছে। বলা যায়, উন্নতি হয়েছে। কয়েকটি খদ্দের বসে আছে ভিতরে। কিন্তু খুঁটিয়ে নজর করেও বিশ্বনাথ বা তার চ্যালাদের সঙ্গে মেলে, এমন কাউকে সেখানে আবিষ্কার করতে পারে না মন্টু। সে ওই দোকানে ঢুকে এক কাপ চা খেল বেশ সময় নিয়ে। নাঃ, গুন্ডা প্রকৃতির লোকের কোনো গুলতানি তার চোখে পড়ে না। নেহাতই নিরুপদ্রব পাড়া।

বিশে গুন্ডা কি তার আড্ডার জায়গা বদলেছে? চায়ের দোকানে বিশ্বনাথের হদিশ জিজ্ঞেস করতে ভরসা হল না মন্টুর। কী জানি, যদি অন্য কিছু সন্দেহ করে। ফলে তাদের সব প্ল্যান যদি ভেস্তে যায়!

মন্টু ফিরে চলে হোটেলে। কত কথা ভাবতে ভাবতে—

ওই বাড়িতে, এখনকার তেতলা নয়— সেই একতলা পুরনো বাড়িটায় জন্মেছিল মন্টু। ওইখানেই কেটেছে তার জীবনের বারোটি বছর। মন্টুর বয়স যখন সাত তখন তার বাবা মারা যান। একমাত্র সন্তান মন্টুকে নিয়ে তার মা চরম বিপাকে পড়েন। আত্মীয়স্বজন কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। কেউ আশ্রয় দিতে আহ্বান জানায়নি, হয়তো মায়ের বাবা বেঁচে থাকলে সেটুকু জুটত। মন্টুর মায়ের আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর। অনাহূতভাবে কারো আশ্রয়ে যেতে চাননি। ভালো সেলাই জানতেন তিনি। সেলাইয়ের অর্ডার নিয়ে আর স্বামীর সামান্য জমানো পুঁজি সম্বল করে কায়ক্লেশে সংসার চালাতে থাকেন। ছেলেকে পড়াতে থাকেন স্কুলে।

কিন্তু তাও সইল না বরাতে। দুর্যোগ ঘনাল। মন্টুদের বাড়ির মালিক বাড়িটা হঠাৎ বেচে দিয়ে সিউড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। বাড়িটা কিনেছিল বিশ্বনাথ ওরফে বিশে গুন্ডা। বাড়িটার মালিক হয়েই সে মন্টুর মাকে নোটিশ দিল— এক মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। ওখানে সে দোকান করবে।

মন্টুর মা বাড়ি খুঁজতে থাকেন। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে তেমন কোনো বাড়ি মেলেনি সুবিধামতো।

ঠিক এক মাস বাদে বিশে দুই সাকরেদ নিয়ে হাজির হল তাগাদায়।

মন্টুর মা মিনতি জানিয়েছিলেন, 'আর কটা মাস সময় দিন। কম ভাড়ায় এখানে ভাড়া পাইনি কাছাকাছি। এই পাড়ায় একজন কথা দিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে একটা ঘর খালি হবে ছমাস বাদে। সেটা আমায় দেবেন অল্প ভাড়ায়। আমার সামর্থ্য তো জানেন। কম ভাড়ায় পেলেও, বেশি দূরে যেতে সাহস হল না। দূরে গেলে ছেলের ইস্কুলে যাওয়া-আসা মুশকিল। তাছাড়া আমি প্রায়ই সেলাইয়ের অর্ডার নিতে, কাপড়-সুতো কিনতে বাইরে ঘুরি। ছেলেকে চেনাশোনা প্রতিবেশীদের ভরসায় একা রাখি। আর কটা মাস অপেক্ষা করুন।'

নির্দয় বিশে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না দেখিয়ে একচোট গালিগালাজ দিয়ে জানিয়েছিল, 'ওঃ, আরও কটা মাস? আবদার! আর পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি খালি করে দিতে হবে। নইলে কেস খারাপ হবে বলে দিচ্চি।'

মন্টুর মা তেজি মানুষ ছিলেন। এমন অভদ্র ব্যবহারে রুখে উঠে বলেছিলেন, 'আমি নিয়মিত ভাড়া দিচ্ছি। এমন জবরদস্তি করে আমাদের বাড়ি ছাড়া করতে পারেন না। দেশে আইন আছে।'

—'বটে, আইন দেখানো হচ্ছে? দে ঘর ফাঁকা করে। দেখি কে কী করতে পারে?'

খেপে গিয়ে বিশে হুকুম করতেই তার দুই সাগরেদ টপাটপ ঘরের বাক্স বিছানা চেয়ার বইপত্তর তুলে বাইরে ছুড়ে ফেলতে শুরু করে।

মন্টুর মা কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব থেকে হাঁ হাঁ করে এগিয়ে গেছিলেন বাধা দিতে। কিন্তু তার আগেই বিশের হাতের এক ঝটকা মন্টুর মাকে আঘাত করে পাশে খাটের ওপর ফেলে দেয়। মন্টু আর থাকতে পারেনি। সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বিশের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বিশের হাতের এক প্রচণ্ড থাপ্পড় খেয়ে লুটিয়ে পড়েছিল মেঝেয়। ক্ষণকালের জন্য জ্ঞানও হারিয়েছিল রোগা-দুবলা ছেলেটা।

বিশ্বনাথ নির্মম হেসে কর্কশ স্বরে মন্তব্য করেছিল, 'উচ্চিংড়েটার তো আস্পর্ধা কম নয়! যাকগে, আর পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ি না ছাড়লে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। আইন-আদালত করলে কিন্তু ওই ছেলের লাশ পাওয়া যাবে মাঠে, এই বলে রাখছি।'

হুমকি দিয়ে ঘরের ছত্রাকার জিনিসে বারকয়েক লাথি মেরে ছিটকে ফেলে গটগট করে বেরিয়ে গিয়েছিল বিশে।

পাড়ার লোক দূর থেকে ব্যাপারটা দেখেছিল। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি।

অপমানটা বড্ড বেজেছিল মন্টুর মায়ের বুকে। তবু তিনি ভয়ে পিছু হটবার পাত্রী ছিলেন না। হয়তো কোর্টে যেতেন সত্যি সত্যি। কিন্তু একমাত্র সন্তানের প্রাণনাশের আশঙ্কায় সিউড়ি ছাড়লেন দিন কয়েক বাদে।

এই কদিনও রেহাই পায়নি মন্টুরা। সে বা তার মা বিশ্বনাথের আড্ডাখানা চায়ের দোকানটার সামনে দিয়ে গেলেই শুনতে হয়েছে তাদের উদ্দেশে কটূক্তি। সব তারা মুখ বুজে সয়ে গেছে, না শোনার ভান করে।

সিউড়ি ছেড়ে মা ছেলে হাজির হয়েছিল মন্টুর বড়োমামার কাছে হুগলিতে।

হুগলিতে পাঁচটা বছর বড়ো অনাদরে কেটেছিল মন্টুর।

মন্টুর বড়োমামা ছপোষা মানুষ। বাসা ছোটো। মন্টুদের আগমনে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। বিশেষত বড়োমামি। সোজাসুজি চলে যেতে না বললেও, আকারে ইঙ্গিতে ক্রমাগত বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে এই উটকো আপদ বিদায় হলেই বাঁচি। মন্টুকে কেবলই উপদেশ দিতেন চটপট কোনো রোজগারের চেষ্টা কর। মন্টুর মা অবশ্য সেখানেও সেলাই করে যথাসম্ভব নিজেদের খরচা জোগাতেন। মাধ্যমিক পাস করেই তাই মন্টু মামারবাড়ি ছাড়ে রোজগারের ধান্দায়, মায়ের অমতেই।

প্রথমে একজন ট্রাক ড্রাইভারের হেল্পার হয়ে বেরিয়ে পড়ে। বছর দুই নানা জায়গায় ঘোরে, নানান কাজ করে, যখন যা জুটেছে। তারপর কানপুরে থিতু হয়। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একটা মোটর গ্যারেজে মোটর গাড়ির কলকব্জার কাজ শিখতে থাকে।

বহু কষ্ট সহ্য করে প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে সে একজন পাকা মোটর মেকানিক হিসাবে নাম কেনে। রোজগারও অনেক বাড়ে। এতদিন যখন যেটুকু পেরেছে মাকে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছে। তবে মামারবাড়ি গেছে কদাচিৎ। এবার সে মাকে নিজের কাছে কানপুরে এনে রাখে।

মন্টুর মা কিন্তু আর বেশিদিন বাঁচেননি। দুঃখে কষ্টে তাঁর শরীর ভেঙে গেছিল। শেষজীবনে মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছিল ভেবে, মন্টুর হৃদয় ভারি তৃপ্তি পায়। তবে একটা ব্যাপারে মন্টু নিশ্চিত— সিউড়ি থেকে ওভাবে অপমানিত হয়ে চলে আসার দুঃখময় স্মৃতি কোনোদিন ম্লান হয়নি মায়ের মনে।

মা মুখে কিছু প্রকাশ করতেন না বটে, কিন্তু কখনো তাদের সিউড়ির জীবনের

শেষ কটা দিনের প্রসঙ্গ তুলতেন না। যেন ওই দিন কটা ভুলে যেতে চাইতেন জোর করে। মন্টু সেকথা তুললেও কঠিন মুখে চুপ করে থাকতেন। যোগ দিতেন না কথায়।

একবার মন্টু উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেছিল, 'জানো মা, ইচ্ছে করে একবার সিউড়ি যাই। গিয়ে শয়তান বিশের মাথাটা ডান্ডা মেরে ভেঙে দিয়ে আসি।'

শুনে আঁতকে উঠেছিলেন— 'না খোকা, অমন মতলব করিসনি। ওখানে গিয়ে ওসব করলে তুই খুন হয়ে যাবি। অনেক কষ্টে দাঁড়িয়েছিস, তুচ্ছ কারণে একটা বাজে লোকের ওপর শোধ তুলতে গিয়ে কেন নিজের জীবন নষ্ট করবি? সে আমি সইতে পারব না।' মা তারপর একটুক্ষণ চুপ করে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, 'একদিন ওর পাপের শাস্তি ঠিক পাবে। আমি বিশ্বাস করি।'

একা সিউড়ি গিয়ে বিশ্বনাথের ওপর ঝাল মেটানোর হঠকারিতা করেনি মন্টু। কিন্তু সেই অপমানের কারণে দুরন্ত প্রতিশোধের ইচ্ছেটা তুষের আগুনের মতো তার নিরুপায় বুকে নিয়ত ধিকিধিকি জ্বলেছে। এতদিনে বুঝি বা সেই আকাঙ্ক্ষা মিটবে অর্জুন সিংয়ের দৌলতে।

হরিয়ানাবাসী অর্জুন সিং। বয়স চল্লিশের কিছু বেশি। বিশাল জোয়ান। দুর্ধর্ষ প্রকৃতি। এক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির পার্টনার সে। সারা ভারত চষে বেড়ায় ব্যাবসার কাজে। দরকারে নিজেও ট্রাক চালায়। দিব্যি বাংলা জানে। মন্টুর সঙ্গে পরিচয় কানপুরে। সরল পরিশ্রমী যুবক মন্টুকে ভালো লেগেছিল অর্জুনের। কানপুরে এলেই সে মন্টুর সঙ্গে আড্ডা দেয়।

মন্টু একদিন কথায় কথায় অর্জুন সিংকে বলে ফেলেছিল, সিউড়িতে বিশে গুন্ডার হাতে তাদের লাঞ্ছনার কাহিনি।

অর্জুন ফুঁসে উঠেছিল, 'এখনও তার বদলা নাওনি কেন?'

মন্টু সখেদে জানায়, 'কী করব?' সিউড়িতে একা গিয়ে শোধ তুলতে গেলে লাইফ রিস্ক। মায়ের বারণ। ইচ্ছে কি আর হয় না?'

সিংজি টেবিলে দড়াম করে এক ঘুসি বসিয়ে গর্জন ছেড়েছিল, 'দোস্ত, আমায় আগে বলোনি কেন? আরে, কত আচ্ছা আচ্ছা গুন্ডা বদমাসের সঙ্গে আমার খাতির আছে। ওই বিশের মতো পাতি গুন্ডাকে সিউড়ি থেকে বেমালুম হাপিস করে এনে তোমার পায়ের নীচে ফেলার বন্দোবস্ত করে দেব। তখন বেটাকে যো খুশ কোরো। কোনো ডর নেই। এমন জায়গায় এনে ফেলব কেউ পাত্তা পাবে না। থানা পুলিশ হলে আমি সামলাব। সে হিম্মত আছে। অর্জুন

গোঁফ চোমড়াতে চোমড়াতে গম্ভীর বদনে প্রশ্ন করে, 'তা দুশমনটাকে হাতে পেলে কী করবে? আমি বলি, একদম খতম করে দাও।'

—'না না, খুন নয়।' আপত্তি জানিয়েছিল মন্টু।

—'তবে?'

—'ইচ্ছে হয় একা একা খালি হাতে একবার ওর টক্কর নিই। তারপর যে-হাতে ও আমায় চড় মেরেছিল, যে-হাতে ও আমার অসহায় মাকে ধাক্কা মেরেছিল, সেই হাতখানা মুচড়ে ভেঙে দিই।' বলতে বলতে মন্টু নিজের দুই পেশীবহুল হাত দুখানায় চোখ বোলায়। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে।

অর্জুন সিং মন্টুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, 'বহুৎ আচ্ছা। এবার যখন সিউড়ি লাইনে যাব, তোমায় সাথ নেব। সেই বেতামিজ বিশেটাকে চিনিয়ে দিয়ো। পরে ওকে তুলে এনে তোমার সাথে লড়িয়ে দেব।'

সেই উদ্দেশ্যেই সিউড়ি এসেছে অর্জুন সিং আর মন্টু।

হোটেলের কাছাকাছি এসে মন্টুর হঠাৎ মনে হল, ভরতের সঙ্গে একবার দেখা করি। ও কি এখনও বাসায় আছে?

ভরত সাইকেলরিকশা চালাত। মুলুক থেকে সদ্য আসা সহায়হীন যুবক ভরতকে মন্টুর বাবা কিছু সাহায্য করেছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতা ভোলেনি ভরত। মন্টুদের খুব ভালোবাসত। মন্টুর মাকে রিকশায় ঘুরিয়ে অনেক সময় ভাড়া নিতে চাইত না। আর নিলেও নামমাত্র। যখন মন্টুরা সিউড়ি ছাড়ে তখন ভরতের বয়স বছর তিরিশ। স্টেশনের কাছে বউ-বাচ্চা নিয়ে বাস করত সে। গোপনে বিশ্বনাথের খবর জানতে ভরতই সব চাইতে নিরাপদ।

মন্টু হোটেলে ফিরল রাত নটা নাগাদ।

অর্জুন সিং অপেক্ষায় ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'খবর মিলল?'

—'মিলেছে।' জবাব দেয় মন্টু। সংক্ষেপে ভরতের পরিচয় দিয়ে মন্টু বলে, 'ভরতের কাছে জেনেছি, বিশে গুন্ডার এখন হাল বেশ খারাপ। ওর গ্যাং ভেঙে গেছে। টাকাপয়সাও উড়ে গেছে। এখন থাকে শহরের সীমানায় একটা ছোট্ট বাড়িতে। আমাদের আগের বাড়ি, সে বাড়ি অবশ্য এখন আর নেই, ভেঙে তিনতলা নতুন বাড়ি হয়েছে দেখলাম। সেটাও নাকি বিশের হাতছাড়া হয়ে গেছে। মালিক অন্য লোক। ও এখন শহরের ভেতর মোটে আসে না। হয়তো পুরনো শত্রুদের ভয়ে। চার-পাঁচ বছর ওকে চোখে দেখেনি ভরত। শুনেছে

এসব। আমি ভরতকে ভার দিয়ে এসেছি বিশ্বনাথের গতিবিধির খোঁজ করতে। ও কাল আমায় জানাবে সব।'

সারাদিন হোটেল ঘরে কাটিয়ে, পরদিন বিকেলে মন্টু গেল ভরতের কাছে। রাতে ফিরে অর্জুনকে রিপোর্ট করল— বিশ্বনাথ নাকি বাড়ির বাইরে বেরোয় কদাচিৎ। তার কাছে লোকজন আসে খুব কম। একদম একা, নেহাতই জীবন কাটাচ্ছে। ওর দুই ছেলে বাইরে চলে গেছে। তারা কখনো আসে না। বউ মরে গেছে। এক বুড়ো ওর কাজ করে। ওই বুড়ো প্রত্যেকদিন সন্ধের সময় বাড়ির বাইরে যায়। আড্ডাফাড্ডা মেরে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে ফেরে। রাতে ওই বাড়িতেই থাকে।

অর্জুন তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলল, 'আরে এ আদমি তো একদম ফালতু। তুমি সির্ফ লোকটাকে আমায় দেখিয়ে দাও। বাইরে না বেরোলে ওর কোঠিটা চিনিয়ে দাও। ব্যস, কাম ফতে। আমার লোক ঠিক ওকে গায়েব করবে।'

মন্টু একটুক্ষণ গুম মেরে থেকে বলল, 'দেখো সিংজি, বাইরে নয়, আমি এখানেই বিশ্বনাথের সঙ্গে মোলাকাত করব ঠিক করেছি। ওর বাড়িতেই। ও আমাদের বাড়ি এসে আমায় অপমান আর মাকে অপমান করেছিল। আমিও ওর বাড়ি গিয়ে সেই অপমানের শোধ নেব।'

সিংজি চমকে বলল, 'আরে ভাই, এ কেয়া বাত?'

—'হ্যাঁ, তাই করব। ওর দলবল যখন নেই, একা বিশ্বনাথের সঙ্গে মোকাবিলাটা এখানেই হয়ে যাক। বাড়িটা আমি দেখে আসছি। বেশ নির্জন। পাশে ঝোপঝাড়, বড়ো বড়ো গাছ। রাতে পাড়াটা একেবারে অন্ধকার নিঝুম হয়ে যায়। ওর বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট আছে, কিন্তু সামনে কাঁচা রাস্তায় এখন স্ট্রিট লাইট যায়নি। ওর কাজের লোকটা বেরিয়ে যাবার পর, অন্ধকার হলেই ওর বাড়িতে ঢুকব। ভরতের রিকশায় যাব। বিশ্বনাথের বাড়ির কাছাকাছি নেমে, হেঁটে গিয়ে ওর দরজায় নক করব। দরজা না খুললে জানলার শিক বাঁকিয়ে ঢুকব। শিকগুলো পলকা, দেখে এসেছি। বিশ্বনাথের ওপর হাতের সুখ করে, ফের ভরতের রিকশায় চেপে চলে আসব। আমি বেরোলেই, তুমি ট্রাক নিয়ে হোটেল ছাড়বে। আমার লাগেজ নিয়ে। স্টেশনের কাছে লালজির ধাবায় অপেক্ষা করবে। আমি কাজ সেরে ফিরলেই, গাড়ি স্টার্ট দেবে। তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যে-কোনো জায়গায় সুবিধেমতো আমায় নামিয়ে দিয়ো। কটা মাস এদিক-সেদিক লুকিয়ে থেকে কানপুরে ফিরব। ভরত ছাড়া এখানে কেউ আমায় চিনতে পারেনি।

আমার কানপুরের ঠিকানাও কেউ জানে না। পরে জানাজানি হলেও, আমায় কেউ ধরতে পারবে না। আর ভরত কাউকে বলবে না। তেমন বুঝলে না হয় কানপুরে ফিরব না কয়েক বছর। হ্যাঁ, একটু ছদ্মবেশ ধরতে হবে। মাথায় টুপি, চোখে গগলস, ফলস দাড়ি-মোচ— এতেই হবে। যাতে পরে পুলিশ পেছনে লাগলেও, বিশ্বনাথ আমায় না শনাক্ত করতে পারে। প্ল্যানটা কী রকম?'

অর্জুন সিং এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'প্ল্যান ঠিক আছে। লেকিন হামভি তুমার সাথে যাব।'

—'কেন?' মন্টু অবাক।

সিংজি গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মন্টু ভাই, এইসব গুন্ডা বদমাস বহুৎ খতরনাক। তুমি তো খালি হাতে বদলা নিতে চাও। লেকিন ওই বদমাসটার হাতে অস্ত্র থাকতে পারে। পিস্তল, চাকু। ও যাতে সেটা না চালায়, আমি খেয়াল রাখব। ট্রাক রেডি থাকবে। কাম ফতে করে এসেই আমরা স্টার্ট দেব।'

মন্টু খুঁত খুঁত করে, 'কিন্তু পরে তুমি যদি ঝামেলায় পড়ো?'

অর্জুন সিং ধমক দিল, 'ব্যস ব্যস, সে আমি ম্যানেজ করব।'

পরদিন রাত নামতেই মন্টু ও অর্জুন সিং শহরের সীমানার এক জায়গায় ভরতের রিকশা থেকে নামল। জায়গাটায় সবে বসতি গড়ে উঠছে। অঘ্রানের অল্প পাতলা কুয়াশা জমেছে। আশপাশ শুনশান। শুধু খানিক দূরে একটা মুদির দোকানে মিটমিটে আলো দেখা যাচ্ছে।

একটা ছোটো অন্ধকার মাঠ পেরল দুজনে। মাঠের গা ঘেঁসে কাঁচা রাস্তা। রাস্তার ধারে তফাতে কিছু বাড়ি। তবে লোক নেই পথে। একটা ছোটো একতলা বাড়ির সামনে গিয়ে মন্টু দেখাল— 'এই বাড়ি।'

নিঃশব্দে দুজনে বাড়িটার দরজায় কান পাতে। কোনো শব্দ নেই ভিতরে। তবে মৃদ আলোর রেখা কপাটের ফাঁক দিয়ে নজরে আসে। অর্জুন সিং একটা বড়ো রুমাল বেঁধে নিল তার মুখে। চোখের নীচ অবধি ঢেকে। তার চোখেও মন্টুর মতন কালো গগলস। সে পাগড়ি পরে না। কিন্তু আজ বেঁধেছে। মন্টু দরজায় টোকা দেয় খটখট।

—'কে?' ভিতর থেকে প্রশ্ন হয়।

—'আজ্ঞে দশরথ।' জবাব দেয় মন্টু।

বিশ্বনাথের বাড়িতে যে বৃদ্ধ কাজ করে তার নাম দশরথ। বাড়ির মধ্যে থেকে

অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসে। দরজাটা খুলতে বেশি দেরি হচ্ছে। কিছু সন্দেহ করল নাকি? হঠাৎ ছিটকিনি খোলার শব্দ হয়। পাল্লা ফাঁক হতে হতে ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন হয়, 'তুই এত তাড়াতাড়ি?'

মুহূর্তে কপাট ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল মন্টু। ভিতরের লোকটির বুকে ছুরি বসিয়ে, সে চাপা হিংস্র কণ্ঠে গর্জায়, 'খবরদার। চেঁচালেই মরবে।'

মন্টুর পেছন পেছন ঘরে ঢুকে কপাটে ছিটকিনি তুলে দেয় অর্জুন সিং।

—'অ্যাঁ অ্যাঁ...' আর্তস্বর বের হয় বিশ্বনাথের গলায়।

—'চোপ।' ফের ধমকায় মন্টু।

ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বিশ্বনাথ। সিংজি খপ করে বিশ্বনাথের হাত দুটো পেছন থেকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে, তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় ঘরের মাঝখানে। তার সারা গায়ে হাত চালিয়ে পরখ করে নেয় যে ওর কাছে কোনো অস্ত্র আছে কিনা। এরপর মাথা নেড়ে মন্টুকে জানায়— নেই কিছু।

সিংজি এবার বিশ্বনাথকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা পিছু হটে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তীক্ষ্ণ নজর রাখে বিশ্বনাথের ওপর। মন্টু ও বিশ্বনাথ এখন মুখোমুখি। ক্রুদ্ধ চোখে বিশ্বনাথ ওরফে বিশে গুন্ডার দিকে চেয়ে থাকে মন্টু।

সিংজির বিদ্রূপ ভরা কথা শোনা যায়, 'এ ভাই, বুড্ঢা কো থোড়া কম জোরে পিটো। নেহি তো মার্ডার হোয়ে যাবে।'

মন্টু তখন এক চরম বিস্ময়ের মাঝে! আর, সামনে এই লোকটা কে? এত বছর যে লোকের মূর্তি মন্টুর হৃদয়ে প্রতিনিয়ত জ্বালা সৃষ্টি করেছে, যার ওপর প্রতিশোধের কামনায় অস্থির হয়েছে, এ তো সেই লোক নয়।

হ্যাঁ, সেই লোকই বটে, কিন্তু কুড়ি বছর আগের সেই বিশে গুন্ডা নয়। বরং বলা উচিত— এ বিশে গুন্ডার প্রেত! একে এখন মন্টুর দেখা বিশ্বনাথ বলে চেনাই কঠিন। কুড়ি বছর বড়ো কম সময় নয়। তবু এতখানি পরিবর্তন ভাবা যায় না!

কিঞ্চিৎ স্থূল সেই বিরাট লম্বা চওড়া বপুটা যেন শীর্ণ কুৎসিত পোড়া কাঠ হয়ে গেছে। ভাঁজ পড়া চোপসানো গাল। কণ্ঠা বের করা সরু গলা। মাথায় আধপাকা পাতলা চুল। গোঁফ উধাও। মুখে অন্তত দুদিন না-কামানো দাড়ি। শরীর ধনুকের মতন বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে সামনে। একদা উদ্ধত চোখ দুটো কোটরে বসা, ঘোলাটে। আতঙ্কে বিস্ফারিত। থরথর করে কাঁপছে দেহ। বুঝি এখুনি পড়ে যাবে হাঁটু ভেঙে। বিশ্বনাথের পরনে ঢলঢলে আধময়লা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি। পায়ে রবারের চটি।

মন্টু থ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বিশ্বনাথ কাতর কণ্ঠে মিনতি জানায়, 'আমার কিছু নেই। আমায় মেরো না। নিয়ে যাও যা আছে। দয়া করো।'

এই কটা কথা বলেই সে মুখ হাঁ করে ভীষণ হাঁপাতে থাকে। আরও কুঁজো হয়ে যায়। দুহাতে চেপে ধরে নিজের বুক। বোঝা গেল না— শুধু ভয়ে নয়, প্রচণ্ড হাঁপানির টানে তার বাকরোধ হয়ে গেছে। নীচু হতে হতে বুঝি সে পড়েই যেত মেঝেতে। মন্টু ঝপ করে ওর কাঁধ আঁকড়ে টেনে নিয়ে বসিয়ে দেয় একটা চেয়ারে। মরণ ফাঁদে পড়া জীবের মতো উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে বিশ্বনাথ সশব্দে লম্বা শ্বাস টানে আর ফেলে।

মন্টু ঘরের ভিতর একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। নিতান্ত অভাবের ছাপ গোটা ঘরে। একটা নেড়া তক্তাপোশ, কাঠের দুটো চেয়ার ও একটা টেবিল। দেয়াল-তাকে ডাঁই করা একগাদা পুরনো খাতা। দেয়ালে পেরেকে ঝুলছে একটা রঙ-চটা ছাতা— এমনই সব জিনিস। সবই ধুলোমলিন।

খানিক ধাতস্থ হয়ে মন্টু আবার বিশ্বনাথের দিকে চোখ ফেরায়। অর্জুন সিং ইতিমধ্যে বিশ্বনাথের চেয়ারের পিছনে সরে গিয়ে, গোঁফে তা দিতে দিতে লক্ষ্য করছে মন্টুর হাবভাব।

কঠিন চোয়াল মন্টুর তীব্র দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে, বিশ্বনাথ অসহায় ভঙ্গিতে ছটফট করে ওঠে। ওর গলা দিয়ে অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ বেরোয়।

ছুরিটা খাপে পুরে প্যান্টের পকেটে চেপে, চাপা কড়া গলায় মন্টু প্রশ্ন করে প্রাক্তন বিশে গুন্ডাকে, 'আমায় চিনতে পারছ?'

—'না না।' বিশ্বনাথ ঘাড় নাড়ে।

—'অনেক বছর আগে। কুড়ি বছর। বাড়ি দখলের নামে একটা ছোটো ছেলে আর তার মাকে তাদের বাড়ি গিয়ে অপমান করেছিলে, মনে আছে?'

—'না না।' হয়তো সত্যিই বিশের মনে নেই, অথবা সে মিথ্যে ভান করছে।

—'অসহায় ছেলেটাকে মেরেছিলে। তার মাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে। ঘরের জিনিসপত্র ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলে। মনে আছে?'

হাঁপাতে হাঁপাতে বিশ্বনাথ ঘাড় নাড়ে, 'না না, আমি না।'

মন্টু এবার তার কোটের পকেট থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বের করে বিশ্বনাথের চোখের সামনে ধরে বলল, 'দেখো, একে চিনতে পারো?'

ফোটোটা মন্টুর মায়ের। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার ছবি। সযত্নে ফ্রেমে বাঁধানো এই ফোটোর বড়ো এক কপি মন্টুর কানপুরের বাসায় আছে।

বিশ্বনাথ বোধহয় আজকাল চোখে ভালো দেখে না। বেশ কিছুক্ষণ সে ছবিটা দেখে খুব কাছে ঝুঁকে। তারপর চিনতে পারে। কারণ মহাভয়ে তার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায়। হাঁপানির টানও বেড়ে যায়। ফ্যাসফেসে গলায় বলে ওঠে, 'কে, কে তুমি?'

—'আমি সেই ছোটো ছেলেটা। আমার মায়ের এই ফোটো। মায়ের ওপর সেই অত্যাচারের আজ শোধ নিতে এসেছি।' ব্যঙ্গ মেশানো হিসহিসে গর্জন ছাড়ে মন্টু, 'এবার?' সে ঘুসি বাগিয়ে ডান হাত তোলে বিশ্বনাথকে আঘাত করার জন্য।

মন্টুর ভয়ংকর আক্রোশের আঁচে বিশ্বনাথ আরও কুঁকড়ে যায়। মরিয়া চেষ্টায় সে দুহাত মেলে আত্মরক্ষার তাগিদে।

মন্টু কিন্তু অদ্ভুত আচরণ করে। তার উদ্যত হাত সহসা থমকে যায় শূন্যে। সে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেয় হাত। তারপর দুপা পিছিয়ে গিয়ে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে বিশ্বনাথের দিকে। তার চোখ বেঁকে যায়, যেন চরম বিতৃষ্ণায়। এমন খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, হঠাৎ সে অর্জুন সিংয়ের উদ্দেশ্যে উত্তেজিত ভাবে বলে ওঠে, 'আরে দূর, একে কী মারব? এ লোকটা যে আধমরা। এর গায়ে হাত দিতে আমার ঘেন্না হচ্ছে। থাক এটা। তিলে তিলে মরুক। মা ঠিকই বলেছিলেন। চলো।' সে পায়ের বুট দিয়ে বিশ্বনাথের গায়ে একটা ঠোক্কর মেরে ঝটিতে পিছু ফেরে।

'ঠারো!' সিংজির নির্দেশ পেয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ায় মন্টু।

হুঁশিয়ার অর্জুন সিং পকেট থেকে কয়েক টুকরো কাপড় আর খানিকটা দড়ি বের করে। বিশ্বনাথের মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তার মুখ বাঁধে। দড়ি দিয়ে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধে তাকে। তারপর ভীষণ গলায় হুমকি দেয়, 'লেকিন এ নিয়ে ঝামেলা পাকালে, ফির এসে একদম খতম করে দেব। সমঝা?'

মুখ দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস আটকে যাওয়ায় বিশ্বনাথের তখন শোচনীয় অবস্থা। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কোনোরকমে নাক দিয়ে টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে, ফেলছে। তাকে নজর করতে করতে সিংজি মিচকে হেসে বলল, 'নাঃ, বুড্‌ঢা মরবে না। যবতক দশরথ না আসে, বাবা বিশসোনাথ থোড়া আরাম করুক।'

ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মন্টু ও সিংজি বেরিয়ে যায়।

শোধবোধ

অমল মহা ভাবনায় পড়ল।

কাল ইংরিজি গ্রামার ক্লাস। শুধু ক্লাসই নয়— উইকলি পরীক্ষা নেবেন বলেছেন স্যার। আজ সন্ধেবেলা মাস্টারমশাই যখন পড়াতে আসবেন, গ্রামার পড়ানোর জন্য সে বই দেবে কী করে? বইয়ের কী হল তার কৈফিয়তই বা কী দেবে? অন্য ছেলেকে পড়ার বই দেওয়া পছন্দ করেন না বাবা। তারপর আবার না বলে দিয়েছে। এবং ঠিক সময়ে ফেরত না পাওয়ায় পড়া তৈরি করতে পারেনি যদি শোনেন? পরিণতিটা মারাত্মক হতে পারে। ভাবতেই অমলের বুক শুকিয়ে যায়।

সোম আর শুক্রবার ফিফ্‌থ পিরিয়ডে ইংরিজি গ্রামার ক্লাস। গত সোমবার বিকেলে স্কুল থেকে বেরুনোর মুখে মিহির বলেছিল, 'অমল, তোর ইংরিজি গ্রামার বইটা দিবি, আজ? কাল ঠিক ফেরত দেব।'

—'কেন, তোরটা কী হল?' অমল জানতে চায়।

একটু আমতা আমতা করে বলেছিল মিহির, 'আমারটা কোথায় যে রেখেছি, খুঁজে পাচ্ছি না। আজকের পড়াটা তোর বই থেকে একবার দেখে নেব।'

'মাত্র একদিনের জন্যে চাইছে, তাই সে বইটা দিয়েছিল মিহিরকে।' মনে মনে আশা ছিল, এই সূত্র ধরে মিহিরের সঙ্গে তার ভাব জমবে। মিহিরের সঙ্গে ভাব জমাতে তার খুব ইচ্ছে।

মিহিরের রং শ্যামলা। রোগা ছোটোখাটো চেহারা। চুলের ছিরি নেই— বেড়ে বেড়ে ঘাড় অবধি লম্বা হলে তখন দেয় কদমছাঁট। বেশির ভাগ দিন আধময়লা জামার সঙ্গে পাজামা বা প্যান্ট পরে স্কুলে আসে। পায়ে রবারের

চটি। তবে মুখখানি সুন্দর। ঝকঝকে চোখ দুটো। মজার মজার কথা বলে। কথাবার্তায় ভারি বুদ্ধির ছাপ।

লেখাপড়ায় খুব ভালো। কেবল পড়ার বই নয়, মিহির বাইরের বইও বেশ পড়ে। সেটা ওর কথা শুনে বোঝা যায়। কিন্তু ছেলেটি একটু অদ্ভুত ধরনের। কখনো খুব হাসিখুশি, আবার কোনো কোনো দিন চুপচাপ গম্ভীর। কারোর সঙ্গে বেশি মিশতে চায় না। কেমন যেন ওপর ওপর আলাপ রাখে।

শুধু অন্তরঙ্গ হবার লোভেই নয়, বই দেওয়ার পিছনে একটা অন্য কারণও ছিল। মাসখানেক আগে একদিন অমল দেখে মিহির টিফিনের সময় ক্লাসে বসে কী একটা বই পড়ছে। উঁকি মেরে দেখি, বইটার নাম রবিনহুড।

মিহির মুখ তুলে বলে, 'পড়েছিস এটা? কুলদারঞ্জন রায়ের বই। দারুণ গল্প।'

—'না। তোর হয়ে গেছে?'

—'আর দুপাতা বাকি।'

—'দে-না আমায় পড়তে।'

মিহির ইতস্তত করে বলে, 'আমার বই নয়। পাড়ার লাইব্রেরির বই। আর কাউকে দেওয়া বারণ। আচ্ছা নে। কাল ঠিক ফেরত দিস।'

কথার খেলাপ করেনি অমল, বিকেলে না খেলে পড়ে শেষ করে পরদিনই ফেরত দিয়েছিল বইখানা। খানিকটা তারই প্রতিদানে গ্রামার বইটা মিহিরকে না দিয়ে পারেনি। কিন্তু তার জন্যে এমন মুশকিলে পড়বে কে জানত?

সোমবার সে দিয়েছিল গ্রামার বইটা। মঙ্গলবার মিহির বলল, 'এই যাঃ, ভুলে গেছি আনতে।'

বুধবারেও ওই এক কথা, 'এই যাঃ, আজও ভুলে গেছি। কাল ঠিক এনে দেব।'

বৃহস্পতিবার মিহির স্কুলেই এল না।

কী করবে? অমল ভেবে কোনো কূলকিনারা পায় না। কী হল তার বইয়ের? মিহির কি তার বইটা হারিয়ে ফেলেছে, তাই আনছে না!' আর-একটা সম্ভাবনাও তার মনে জাগে। মিহির তার বইখানা পুরনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দেয় নি তো? মাস দুই আগে সে কালীঘাটে উজ্জ্বলা সিনেমায় মর্নিং শো-এ টারজান দেখতে গিয়েছিল। উজ্জ্বলার কাছেই কতগুলো পুরনো বইয়ের দোকান। পুরনো বই কেনাবেচা করে। হঠাৎ সে দেখে সেইরকম একটা দোকানে মিহির পিছনে দাঁড়াতেই শোনে দোকানি বলছে, 'দু টাকার বেশি দিতে পারবে না।'

—'কী রে, কী করছিস?'

অমলের গলা পেয়ে মিহির চমকে উঠেছিল। ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'কিছু না।' বলতে বলতেই সে সরে এসেছিল দোকান থেকে। তার হাতে একখানা বই ছিল। চট করে সেটা ঢুকিয়ে নিয়েছিল কাঁধের ব্যাগে। এক নজর দেখেই অমলের মনে হয়েছিল ওটা পড়ার বই। মিহির বোধহয় বইখানা বিক্রি করতে চেষ্টা করছিল? মিহির আর দাঁড়ায়নি। 'চলি। একটা কাজ আছে', বলে ব্যস্তভাবে বিদায় নিয়েছিল।

সেই ঘটনাটা মনে পড়তে অমল ভাবল, 'মিহিরের কি লুকিয়ে পুরনো বইয়ের দোকানে বই বিক্রির অভ্যেস আছে? অমলের পাড়ায় একজনের এই অভ্যেস আছে। দেবুকে কেউ তার বই দিতে চায় না। গল্পের বই বা পড়ার বই পড়তে চেয়ে এনে স্রেফ বেচে দেয় পুরনো বইয়ের দোকানে। সেই পয়সায় সিনেমা দেখে, রেস্টুরেন্টে খায়। বই ফেরত চাইলে বলে— 'হারিয়ে গেছে।' ভয়ে ওকে কেউ আর বই দিতে চায় না।

অনেক লেখাপড়ায় ভালো ছেলেরও নাকি এই বদ অভ্যাস থাকে। ছোটোকাকা বলছিল যে ওদের মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ারের একজন স্টুডেন্টের এই স্বভাব। অথচ তার রেজাল্ট খুব ভালো।

বইটা যদি মিহিরের কাছ থেকে উদ্ধার করতে না পারি? ভাবলেই অমলের দিশাহারা লাগে। নিজে পয়সা জমিয়ে একটা নতুন বই কেনা যাবে না? যদি বা যায়, ততদিন কী করবে? মাস্টারমশাই তো আজই জিজ্ঞেস করবেন— ইংরেজি গ্রামার বই কোথায়? অতঃপর বরাতে জবাবদিহি এবং লাঞ্ছনা।

মিহিরের বাড়ি সে চেনে না। রবি থাকে মিহিরের পাড়ায়। মিহির কেন ক্লাসে আসেনি রবি বলতে পারল না। এক পাড়ায় থাকে বটে কিন্তু মিহিরের সঙ্গে তার তেমন ভাব নেই।

রবিকে ধরে অমল, 'ছুটির পর তোর সঙ্গে যাব। মিহিরের বাড়িটা আমায় দেখিয়ে দিস। আমার একটা বই নিয়েছে। খুব দরকার। ফেরত আনব।'

অমলদের স্কুলটা হাজরা রোড এবং ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ের কাছে। অমলের বাড়ি স্কুলের দক্ষিণে, রবির সঙ্গে সে চলল স্কুল থেকে উত্তর দিকে। কিছু দূর গিয়ে তারা ল্যান্সডাউন রোড ছেড়ে বাঁদিকে একটা ছোটো রাস্তায় ঢুকল। তারপর খানিক এঁকেবেঁকে চলে এক জায়গায় থেমে রবি বলল, 'ওই বাড়িটা। একতলা। হলুদ দরজা।'

রবি চলে গেল। অমল মিহিরের বাড়িটা দেখতে দেখতে এগোল। ছোটো একতলা বাড়ি। খুব পুরনো। দেয়ালের পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। জানলা দরজার রংচটা। জানলাগুলোর কোনো কোনো পাল্লা ভাঙা। পাশেই একটা বস্তি। সামনে দিয়ে গেছে নোংরা জলের ড্রেন। দুর্গন্ধ উঠেছে। ইস, এ কী বাড়ি!

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে অমল জোরে জোরে ডাক দিল, 'মিহির! মিহির আছে?'

—'কে?' এক বিবাহিতা ভদ্রমহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। মহিলার পরনে মলিন শাড়ি। তাঁর মুখের সঙ্গে মিহিরের মুখের খুব মিল। হয়তো মিহিরের মা।

—'মিহির আছে।' মহিলা জবাব দেন।

—'একটু ডেকে দিন-না।'

—'ওর জ্বর হয়েছে,' মৃদুস্বরে বললেন মহিলা।

—'কিন্তু আমার যে একটা বই নিয়েছে ও। খুব দরকার। আজই চাই।' কাতর কণ্ঠে বলে অমল।

—'তোমার নাম কী?'

—'অমল। অমল রায়। আমি ওর সঙ্গে পড়ি।'

একটুক্ষণ চুপ করে চেয়ে থেকে কোনো কথা না বলে মহিলা ভিতরে ঢুকে গেলেন।

অনিশ্চিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অমল। সত্যি ডেকে দেবেন তো? না ওর নাম শুনে মিহির দেখাই করবে না! তাহলে ওর মাকে নালিশ করবে। অমল একটু মুখচোরা ধরনের, কিন্তু আজ বেকায়দায় পড়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

নিঃশব্দে মিহির এসে দরজায় দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল, 'ভেরি সরি অমল।' তার গায়ে চাদর জড়ানো। শুকনো মুখ।

—'এই নে'— মিহির অমলের গ্রামার বইখানা এগিয়ে দেয়।

ছোঁ মেরে বইটা টেনে নিয়ে অমল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। যাক বাবা!

—'জ্বর হয়ে গেল,' মিহির কাচুমাচু ভাবে হাসে। 'কাল ঠিক কারো হাতে পাঠিয়ে দিতাম।'

বই ফেরত পেয়ে অমলের মনটা বেজায় হাল্কা। দেরি হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরেই খেলতে ছুটবে। 'আচ্ছা চলি', বলেই সে হাঁটা দিল।

মিহির আরও দুদিন স্কুল কামাই করল। এর পর থেকে অমল মিহিরকে একটু এড়িয়ে চলতে লাগল। মিহির সম্বন্ধে ওইরকম খারাপ সন্দেহ করার জন্য তার মনে লজ্জা জমেছে। তাছাড়া ভয়, ফের যদি ও বই চায়। মিহির অবশ্য বই নিয়ে কোনো কথাই তুলল না।

প্রায় দু সপ্তাহ বাদে। বুধবারে। সকাল দশটা নাগাদ অমল স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছেছে। খানিক দূরে মিহির তখন স্কুলে ঢুকছে। গেটের পাশে দাঁড়িয়েছিল ওদের ক্লাসের জগবন্ধু। জগবন্ধু ভালো ফুটবল প্লেয়ার। ডানপিটে। তবে পড়াশুনায় সুবিধের নয়। কোনোরকমে পাস করে যায়।

জগবন্ধু মিহিরকে আটকাল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কীরে বই এনেছিস?'

মিহির থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

—'দে।' জগবন্ধু হাত বাড়ায়।

—'এখন নয়। টিফিনের পর। প্লিজ।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক।' মিহির ঘাড় নাড়ে।

স্কুল শুরুর ঘণ্টা পড়ল। অমলের ক্লাসঘর দোতলায়। জগবন্ধু তাড়াতাড়ি ক্লাসে চলল।

অমলের মনে কৌতূহল। মিহির আবার কী বই নিয়েছে? ঠিক সময়ে ফেরত দেয়নি মনে হচ্ছে। ক্লাসে জগবন্ধু বসে অন্য বেঞ্চে। তাই তখনই তাকে জিজ্ঞেস করা গেল না ব্যাপারটা। পরে অমল ভুলে গেল। বিষয়টা মনে পড়ল ফের টিফিনের সময়।

টিফিনের ঘণ্টা পড়লে ক্লাসে বসে ব্যাগ থেকে টিফিন বাক্স বার করল, টিফিন খেয়ে অমল একতলায় নামল। পাঁচিল ঘেরা মস্ত কমপাউন্ড। ছেলেরা হৈ হৈ করে খেলছে— লাট্টু, গুলি, এক্কাদোক্কা। মার্চের শেষাশেষি, তাই কিছু ছেলে ফুটবলও শুরু করে দিয়েছে রবারের বলে। গেটের বাইরে ফুচকা, চীনেবাদাম, আলুকাবলি, পেয়ারা ইত্যাদি নানা মুখরোচক খাবারের পসরা ঘিরে ছেলেদের ভিড়। হঠাৎ অমল দেখল, বারান্দার এক কোণে মেঝেতে উবু হয়ে বসে— মিহির কী জানি লিখছে।

গুটিগুটি এগিয়ে অমল উঁকি মারল। সামনে খোলা ইংরিজি গ্রামার, তাই থেকে মোটা একখানা খাতায় টুকছে মিহির।

পিছনে কেউ টের পেয়ে মাথা ঘোরাল মিহির। অমলকে দেখেই বসে ঝপ করে বন্ধ করে দিল বইটা।

—'কীরে, কপি করছিস?' একটু হেসে বলল অমল।

—'হুঁ।' মিহিরের মুখ থমথমে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল অন্যদিকে।

মিহিরের বিরক্ত ভাব দেখে অমল সরে গেল। মনে মনে সে বেশ আহত। কপি করা দেখে ফেলেছি বলে কী এমন দোষ করেছি?

স্কুলের পর অমল জগবন্ধুর সঙ্গ ধরল। যেতে যেতে বলল, 'তোর কী বই নিয়েছিল মিহির?'

—'ইংরিজি গ্রামার বই। দেখ-না, সোমবার বলল, তোর ইংরিজি গ্রামার বইখানা একদিনের জন্যে দিবি? ফেরত দেব। আমার বইটা পাচ্ছি না খুঁজে। আজকের পড়াটা একবার দেখে নিতাম। তা দিলাম। নেহাত ওর খাতা দেখে মাঝে মাঝে অঙ্কের হোমটাস্ক টুকে নিই, তাই। তা গতকাল আনল না বইটা। আচ্ছাসে কড়কে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কাল না পেলে মজা দেখাব। তা ভয়ে আজ ঠিক এনেছে।'

অমল বলল, 'মিহির বোধহয় ওর নিজের ইংরিজি গ্রামারটা হারিয়ে ফেলেছে। টিফিনের সময় দেখলাম, তোর বই থেকে খাতায় টুকছে। আমার কাছ থেকেও নিয়েছিল ইংরিজি গ্রামার বই। একদিনের বদলে তিনদিন রেখে দিয়েছিল। শেষে ওর বাড়ি গিয়ে নিয়ে এসেছি। নিশ্চয় আমারটা থেকেও কপি করেছে, তাই দেরি করছিল।'

বিজয় যাচ্ছিল তাদের পাশে পাশে। বিজয় লেখাপড়ায় ভালো। মিহিরের সঙ্গে পড়াশুনায় তার রেষারেষি। তবে এইট থেকে নাইনে উঠতে সে মিহিরের কাছে হেরে গেছে। কারণ ফোর্থ হয়েছে। বিজয় ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, 'মিহির মোটেই ওর ইংরিজি গ্রামার হারায়নি। আসলে ও বইটা কেনেইনি। আমি তো ওর পাশে বসি। বছরের গোড়া থেকে দেখছি, একদিনও ইংরিজি গ্রামার বই আনেনি। হয়তো বই কেনার পয়সা সিনেমা-টিনেমা দেখে উড়িয়েছে। এখন এর-ওর কাছে থেকে নিয়ে টুকে কাজ চালাবার ধান্দায়। নিজের বাড়িতে অমনি বানিয়ে বলবে— খুঁজে পাচ্ছি না। হারিয়ে ফেলেছি। বিজয়ের কথা শোনামাত্র অমলের মনে হয়— তাই হবে। মিহির বই কেনেইনি। তবে সত্যি কি ও বই কেনার টাকা খরচা করে ফেলেছে? না কেনার পয়সা জোটে নি? তার মনে ভেসে ওঠে মিহিরের বাড়ি। সেই দীন দরিদ্র আবাস। ওর মায়ের ম্লান রূপ।

অমল মাথা নামিয়ে চলে যায়।

দুদিন বাদে। শুক্রবার। ছুটির পর অমল স্কুল থেকে বেরিয়েই মিহিরকে

ধরল। সোজা জিজ্ঞেস করল, 'তোর ইংরিজি গ্রামার বই থেকে টোকা শেষ হয়ে গেছে?'

মিহির থতমত খেয়ে মাথা নাড়ল।

—'আর কতখানি বাকি?'

—'আরও প্রায় চার পাতা। মানে টার্মিনাল পরীক্ষায় যদ্দূর হবে।' মিহির হতাশভাবে বলে।

—'একদিনের মধ্যে ওটা কপি করতে পারবি?'

—'হ্যাঁ।'

—'মানে আজ যদি দিই কাল ঠিক ফেরত দিবি বইটা?' বলতে বলতে অমল তার ব্যাগ থেকে গ্রামার বইখানা বের করে।

মিহিরের চোখ চকচক করে ওঠে। মুখ দিয়ে তার কথা বেরয় না।

—'নে।' মিহিরের হাতে বইটা গুঁজে দিয়ে অমল উল্টো দিকে রওনা দিল।

—'শোন।'

মিহিরের ডাকে অমল ফিরে দাঁড়ায়।

—'চাঁদের পাহাড় পড়েছিস? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা।'

—'নাঃ।'

—'দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। পড়ে দিস।' মিহির তার ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে এগিয়ে দিল।

—'তোর পড়া হয়ে গেছে?'

—'না। টিফিনে পড়েছি আজ বাইশ পাতা। উঁঃ একসেলেন্ট। লাইব্রেরির বই। কাল ফেরত দিস ভাই। উঁহু, একদিনে শেষ করতে পারবি না বোধহয়। ঠিক আছে, সোমবার আনিস।'

মিহিরের মুখে লাজুক মিষ্টি হাসি। যেন ভাবে বোঝাতে চায়— একটুও কি শোধবোধ হল না?

চৈত্র ১৩৯০

খানদানি যুদ্ধ

নসিবপুর আর ভাগ্যনগর। পাশাপাশি দুই নবাবের দুই রাজ্য।

রাজ্য দুটি আয়তনে ছোটো। তবে সেখানে নবাবি জাঁকজমক সমারোহের অভাব নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, দুই নবাব বংশেরই খানদানি বলে খুব নাম। তাই তাঁরা আচার ব্যবহারে, নবাবি আদবকায়দা, সৌজন্য প্রদর্শনে ছিলেন ভারি হুঁশিয়ার!— ধনদৌলত তো নশ্বর বস্তু— আজ বাড়ে, কাল কমে— কিন্তু খানদানি আদবকেতায় খুঁত হয়ে গেলে যে দুনিয়ার কাছে চিরকালের জন্য বদনাম হয়ে যাবে। সুতরাং দুই নবাবই নানান পালা পরবে সৌজন্য ও প্রীতি বিনিময়ে নিজেদের বনেদি সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে কড়া নজর রাখতেন।

এতকাল নসিবপুর ও ভাগ্যনগরের মধ্যে দিব্যি ভাবসাব ছিল। কিন্তু এক তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মন কষাকষির ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষের আগুন উঠল জ্বলে।

রাজ্য দুটির সীমানায় একটি গ্রাম নিয়ে লাগল বিরোধ। দুপক্ষই দাবি করছে গ্রামটি তাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। একটা মীমাংসায় আর কিছুতেই পৌঁছনো যাচ্ছে না। ফলে গ্রামবাসীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

দুই পক্ষের সিপাইরাই গ্রামবাসীদের ওপর জবরদস্তি চালায়। দুই রাজ্য থেকেই দাবি করা হয় খাজনা। নিরুপায় গ্রামবাসীরা তখন দুজন নবাবের কাছেই আবেদন পাঠাল— হুজুর, দয়া করে আপনারা একটা মীমাংসা করে নিন। নইলে যে গরিবদের প্রাণ যায়।

নবাবরা দাড়ি চুমরিয়ে, গোঁফে তা দিয়ে চিন্তা করলেন— কথাটা সত্যি বটে। এ বেচারারা কেন বিনা দোষে কষ্ট পায়? সুতরাং একটা ফয়সালা করা নিতান্তই প্রয়োজন।

ভাগ্যনগর থেকে নসিবপুরের নবাবের কাছে পত্রদূত হাজির হল। মিনে করা রুপোর থালায়, মখমলি চাদরে ঢাকা, আতরে ভুরভুর, সোনালি জলে লেখা চিঠিখানি তুলে নসিবপুরের নবাব পাঠ করলেন— আল্লা-তালার কৃপায় আশা করি হুজুরের দিল— তবিয়ৎ বহুত খুশ। হুজুর বোধহয় অবগত আছেন যে আমাদের রাজ্যের সীমানায় একটি গ্রাম নিয়ে দুই রাজ্যে কিঞ্চিৎ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। অধমের পূর্বপুরুষগণের আশীর্বাদে ওই গ্রামটি ভাগ্যনগরেরই রাজ্যভুক্ত। তাই গরিবের একান্ত অনুরোধ যে আপনি দয়া করে আপনার সিপাহীদের ওই গ্রামে হামলা করতে বারণ করবেন।

চিঠি শুনে নবাবের আমির-ওমরাহ, উজির-নাজির, মনসবদার— সবাই একযোগে প্রতিবাদ জানাল— 'সেকী কথা হুজুর! ও গ্রামের মালিকানা তো নসিবপুরের। তামাম দুনিয়া বরাবর এ কথা জানে। ভাগ্যনগরের এ কেমন অন্যায় আবদার?'

সুতরাং, নসিবপুরের নবাবের উত্তর পৌঁছল ভাগ্যনগরের হাতে— হুজুরের শুভেচ্ছায় এই গরিবের দিন গুজরান হচ্ছে কোনোরকমে। খোদাতালাহর কৃপায় আপনার ধনদৌলত মানইজ্জত দিন দিন অপর্যাপ্ত হোক। আপনার হুকুম তামিল করতে পারলে এ বান্দা কৃতার্থ হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওই গ্রাম আসলে নসিবপুরের সম্পত্তি। তাই অধমের একান্ত আবেদন যে ভাগ্যনগরের সিপাহীরা যেন ওই গ্রামে আর পদার্পণ না করে।

অবস্থা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। দুপক্ষই তাদের দাবি ছাড়তে নারাজ। দরকার হলে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। খানদানি কেতাদুরস্ত রেখে ভাগ্যনগরের নবাব চিঠি দিলেন নসিবপুরে—

বান্দার বেয়াদপি মাপ করবেন। পূর্বপুরুষগণ-অর্জিত ওই গ্রামটি দান করার এক্তিয়ার এই অধমের নেই। তবে হুজুরের যদি জমির বিশেষ প্রয়োজন থাকে তাহলে ভাগ্যনগরের অন্য যে-কোনো অংশ থেকে গ্রামটির দু গুণ জমি গ্রহণ করুন। প্রস্তাবটি মনঃপূত না হলে আপনি মেহেরবানি করে রণক্ষেত্রে শার্দূলবিক্রম প্রদর্শনপূর্বক গ্রামটি অধিকার করে নিন। তাহলে হুজুরের ইচ্ছা এবং গরিবের ধর্ম দুই বজায় থাকে।

পত্রপাঠ নসিবপুরের নবাব হুংকার ছাড়লেন— 'ঠিক হায়। তাই হবে।' আর আমির-ওমরাহ সভাসদরাও রব তুলল— 'বেশ তাই হোক। ভাগ্যনগরের এ হুমকি বরদাস্ত করা চলবে না। ওদের দেখিয়ে দেওয়া যাক নসিবপুরি হিম্মতের জোর কত।'

নসিবপুরের জবাব গেল— গোলামের গোস্তাকি মাফ করবেন। গ্রামটি হুজুরের পায়ে অর্পণ করতে পারলে এ গরিব কৃতার্থ হত। কিন্তু এমন অনধিকার চর্চা করলে বেহেস্তবাসী পূর্বপুরুষদের অভিশাপ বর্ষিত হবে আমার মস্তকে। তবে প্রয়োজন হলে নসিবপুরের অন্য যে-কোনো অংশ থেকে ওই গ্রামের তিনগুণ জায়গা দয়া করে গ্রহণ করুন। প্রস্তাবটি যদি পছন্দ না হয়, শাহেনশা আপনার রুস্তম সদৃশ বীরত্ব প্রদর্শন করে ওই গ্রামখানি দখল করে নিন। আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে না পারার লজ্জা থেকে অধমকে মুক্তি দিন।

ব্যাস, দুই রাজ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। দুপক্ষই সাধ্যমতো সৈন্যসামন্ত জোগাড় করতে শুরু করল। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের জন্য নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ক্ষেত্র সমস্ত স্থির হয়ে গেল। ঠিক হল, সেই গ্রামটিই হবে রণক্ষেত্র।

দিনে দিনে গ্রামের দুপ্রান্তে দুই তরফের সেনা সমারোহ চলতে লাগল। সারি সারি তাঁবু পড়ল। পল্টনদের হাঁক ডাকে, রবে, বৃংহনে আকাশবাতাস সরগরম হয়ে উঠল। দুজনই ক্ষমতা মাফিক পরস্পরকে আপন আপন প্রস্তুতি দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যুযুধান দুপক্ষের মাঝে পড়ে ভীত গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে পালাল।

দুই তরফের তাঁবুতে মহা সমারোহ। অস্ত্রের ঝনঝনানির মধ্যে সেখানে গানবাজনা জলসার বন্দোবস্ত রয়েছে। আর এ সবের ফাঁকে ফাঁকে চলছে পরস্পরে আদবকায়দার আদানপ্রদান। একজন অপর নবাবের কাছে কুশল বার্তা পাঠান— শাহেনশা অখণ্ড পরমায়ু লাভ করুন। আপনার সেনাদলের শৌর্যবীর্য সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাক।

যুদ্ধের দু-দিন আগে নসিবপুরের নবাবের হঠাৎ মনে হল— এমন শুভকাজে ঠাকুর-ফকিরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হোক। তিনি তো কাছেই থাকেন।

ঠাকুর ফকির একজন সাধুপুরুষ। থাকেন পাহাড়ের এক গুহায়। মাঝে মাঝে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন, শহরে পা.দেন না। গ্রামে গ্রামে ঘোরেন। ভারি পণ্ডিত। ভালো ভালো উপদেশ দেন, আর গরিব-দুঃখীর সেবা করেন প্রাণপণে। তিনি হিন্দু না মুসলমান কেউ জানে না, কেউ মাথাও ঘামায় না এ নিয়ে। সবাই তাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। আগে হিন্দুরা তাঁকে বলত— বাবা ঠাকুর আর মুসলমানরা ডাকত— ফকির সাহেব। শেষে দুটো নাম মিলেমিশে দাঁড়িয়ে গেল— ঠাকুর ফকির। নসিবপুরের নবাবের একবার শিকারে বেরিয়ে ঠাকুর-ফকিরের সঙ্গে আলাপ হয়। কথাবার্তা বলে লোকটির ওপর খুব ভক্তি হয়

তাঁর। নবাব অনেকবার ঠাকুর-ফকিরকে নেমন্তন্ন করে রাজধানীতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু ঠাকুর-ফকির যাননি।

নবাবের চিঠি নিয়ে ঘোড়সওয়ার ছুটল ঠাকুর-ফকিরের উদ্দেশে। ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই ফিরে এল দূত। ঠাকুর-ফকির উত্তর দিয়েছেন চিঠিতে—

আমি সর্বদাই আপনার কল্যাণ কামনা করি। কিন্তু একটি কথা। আগামী যুদ্ধের খবর শুনে বড়ো ব্যথা পেলাম। আত্মরক্ষা ভিন্ন যুদ্ধের প্রয়োজন কী? যুদ্ধের ফলে যে কত অমূল্য প্রাণ নষ্ট হয়। এ যুদ্ধ কি কোনোমতে এড়ানো যায় না? আশা করি আপনার মতো ন্যায়বান ও দয়ালু বাদশাহ আমার এই অনুরোধটুকু বিবেচনা করে দেখবেন।

চিঠি পড়ে নবাব অস্থির হয়ে উঠলেন। ভাবলেন— ফকির তো হক কথা লিখেছেন। নবাব বাদশার সম্মান বজায় রাখতে নিরীহ লোকের কেন সর্বনাশ হয়? কিন্তু এখন যে পিছপা হওয়া চলে না। তাহলে ভাগ্যনগর কাপুরুষ বলে ধিক্কার দেবে। কী উপায়?

নবাবের সারা রাত ঘুম এল না। কখনো পায়চারি করেন, কখনো বসে বসে ফরসি মুখে ভুরু কুঁচকে তামাক খান। কাণ্ড দেখে তাঁর সঙ্গীসাথীরা থ। তারা রহস্য কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

ভোরবেলা নবাবের মাথায় এক বুদ্ধি এল। তিনি ভাগ্যনগরের নবাবকে এক চিঠি পাঠালেন— হুজুর, যুদ্ধ মানে তো বহু লোকের প্রাণহানি। তার চেয়ে বরং দুই রাজ্যের মালিক অর্থাৎ আমরা দুই নবাব যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে বিষয়টার ফয়সালা করে নিই কেমন হয়? যে জিতবে গ্রামখানি তার। আমি নিশ্চিত জানি এই দুর্বলকে পরাজিত করতে আপনার মতো বীরের কোনো মেহনতই হবে না। হুজুরের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম—

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এসে গেল— হুজুরকে শত সহস্র সেলাম। আপনার বুদ্ধি-বিবেচনায় তুলনা নেই। যথার্থ লিখেছেন। এত বড়ো যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই। দ্বন্দ্বযুদ্ধেই মীমাংসা হোক। আগামীকাল প্রত্যুষে লড়াইয়ের আকাঙ্ক্ষায় আপনার মুখোমুখি হব। তারপর তরবারির এক আঘাতে অনায়াসে এই বান্দার মস্তক ছেদন করে গ্রামটি লাভ করে নেওয়া তো হুজুরের কাছে নেহাত তুচ্ছ ব্যাপার।

পরদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে দুপক্ষের সৈন্যসামন্ত গ্রামের দুপ্রান্তে সার বেঁধে মুখোমুখি দাঁড়াল। ঘোর রবে বেজে উঠল তূরী-ভেরি কাড়ানাকাড়া। তারপর দুই

নবাব ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন পরস্পরের দিকে। পিছনে পিছনে চলল তাঁদের দুই সেনাপতি। নবাবদের গায়ে চকচকে বর্ম, মাথায় ঝকঝকে শিরস্ত্রাণ। একজনের ঘোড়ার রঙ কালো বার্নিসের মতো কুচকুচে, অন্যজনের ঘোড়া দুধের মতো সাদা। কাছাকাছি এসে তাঁরা ঘোড়া থামালেন, নামলেন মাটিতে।

প্রথমে নসিবপুরের সেনাপতি কয়েক পা সামনে এগিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন নবাবের আগমন বার্তা— 'আজ আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছেন সুবিখ্যাত খানদানি-বংশসম্ভূত নসিবপুরের নবাব বাহাদুর। এঁর পিতা পিতামহ ও অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কীর্তিকাহিনি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। আর বর্তমান বাদশাহ স্বয়ং তাঁর বীরপনার গুণে দুনিয়ার লোকের কাছে শের-ই-হিন্দুস্থান উপাধি লাভ করেছেন। নসিবপুরের নবাব বাহাদুর এখন তাঁর ভাগ্যনগরের প্রতিপক্ষের নিকট রণভিক্ষা করছেন।'

সিপাহসালার তার বক্তব্য পেশ করে পিছিয়ে দাঁড়াল।

এবার এগিয়ে আসে ভাগ্যনগরের সেনাপতি। ভাগ্যনগরের নবাব ও তাঁর পূর্বপুরুষদের বিদ্যাবুদ্ধি শক্তির এক মহিমোজ্জ্বল দীর্ঘ ফিরিস্তি শুনিয়ে সেও তার নবাবের পক্ষ থেকে নসিবপুরের নবাবের কাছে রণপ্রার্থনা করল।

এইবার আসল যুদ্ধ।

নবাবদের উৎসাহ দিতে দু তরফের রণবাদ্য বিপুল শব্দে বেজে উঠল। তারপর সব চুপ। রুদ্ধ নিশ্বাসে সবাই অপেক্ষা করতে লাগল— কী হয়, কী হয়?

দুই নবাব এলেন এক্কেবারে সামনাসামনি। খাপ থেকে টেনে বের করলেন দীর্ঘ তরবারি। রৌদ্রে ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁদের শাণিত অস্ত্র।

হঠাৎ নসিবপুরের নবাব প্রতিদ্বন্দ্বীকে এক মস্ত কুর্নিশ ঠুকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন— 'হুজুর আপনি আমার চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তাই আজকের যুদ্ধে প্রথম অস্ত্র চালনার গৌরব আপনারই প্রাপ্য। সুতরাং মেহেরবানি করকে আপ পহেলা চালাইয়ে।'

নসিবপুরের এই খানদানি চালে প্রথমটায় ভাগ্যনগর বেশ হকচকিয়ে গেল। প্রায় মাৎ হয় আর কি। শেষে নসিবপুরের কাছে সৌজন্যের প্রতিযোগিতায় ভাগ্যনগর যাবে হেরে? কভি নেহি।

ভাগ্যনগরের নবাবও অমনি দীর্ঘতর এক সেলাম জানালেন নসিবপুরের নবাবকে— 'বড়ো লজ্জা দিলেন জনাব। আপনার অতুলনীয় কীর্তি-খ্যাতির কাছে

এ গরিবের কি কোনো পাত্তা আছে? প্রথম অসি চালনার গৌরবে আপনারই একমাত্র অধিকার। অতএব মেহেরবানি করকে আপ পহেলা চালাইয়ে।'

ব্যাস, লেগে গেল দুই খানদানি নবাবের আদবকায়দার প্রতিযোগিতা। বিনয়ের পাল্লায় কেউ কম যায় না। দুজনেই পরস্পরকে আহ্বান জানাতে থাকেন প্রথম আক্রমণের সুযোগ নিতে।

মিনিটের পর মিনিট গেল কেটে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুপক্ষের সেনাবাহিনী রোদ্দুরে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে। কিন্তু দুই নবাব তখনও ক্রমান্বয়ে পরস্পরকে সবিনয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন— 'জী আপ পহেলা।'

—'জী আপ পহেলা।'

এমনিভাবে ঘণ্টাখানেক কাটার পর নবাবরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁরা নিজের নিজের সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। অবশেষে উভয় পক্ষ থেকেই ঘোষণা করা হল— দ্বিপ্রহরের খানাপিনার সময় হয়ে যাওয়ায় আমাদের নবাব বাহাদুর কিছুক্ষণের জন্য ছুটি ভিক্ষা করছেন। বিশ্রামের পর ফের লড়াই শুরু হবে।

দু তরফই সায় দিল— জরুর জরুর। এখন খানাপিনা হোক। তারপর—

বিকেলে ভাগ্যনগরের কাছ থেকে এক চিঠি এল নসিবপুরের নবাবের কাছে।

—'হুজুর, আমার সহস্র কোটি সেলাম নেবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সামান্য গ্রামটির জন্য যুদ্ধ করতে আপনার নিতান্তই শরম লাগছে। আপনাকে এরূপ বিপন্ন করার চেয়ে এ বান্দা জাহান্নামে যেতেও প্রস্তুত। তাই জনাবের পাদদেশে গ্রামটি সমর্পণ করলাম। আর একটি অনুরোধ— দয়া করে আমার গোটা রাজ্যটিও গ্রহণ করুন। হুজুরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে আমি মক্কা মদিনায় তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়ব বলে প্রস্তুত হয়ে মুহূর্ত গুনছি।

নসিবপুরও হটবার পাত্র নয়। বিনয়ে বিগলিত হয়ে নবাব জবাব দিলেন— তুচ্ছ গ্রামটির জন্য আপনার মনোকষ্টের কারণ হওয়ার চেয়ে আমি বরং পূর্বপুরুষদের অভিশাপ মাথা পেতে নেব। জনাব জানবেন, আজ হতে ওই গ্রামের মালিকানা একমাত্র আপনারই। আর হুজুর কেন তীর্থে যাবেন? সে সৌভাগ্য তো এই অধমের প্রাপ্য। দয়া করে আমার ক্ষুদ্র রাজ্যটিও এইসঙ্গে গ্রহণ করে গরিবকে ছুটি দিন।...

এইভাবে কয়েকবার চিঠি চালাচালির পর আপাতত নবাবরা তাঁদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

তারপর অনেক দিন, অনেক মাস, অনেক বছর গড়িয়ে গেল। কেতামাফিক নির্দিষ্ট সময় অন্তর একপক্ষের পত্রদূত হাজির হত অন্য তরফে। তারা পরস্পরকে সকাতরে নিবেদন জানাত— দয়া করে শীঘ্র আপনার আগমন হোক। এখনি গ্রহণ করুন এই রাজ্যপাট। আমি আপনার পথ চেয়ে আছি।

কিন্তু যুদ্ধ আর হয়নি। কোনো ফয়সালাও আর হয়ে ওঠেনি।

এখন সেই গ্রামটির কী হল? যে গ্রাম নিয়ে এত কাণ্ড উভয়পক্ষই তো এখন সেটি দান করে ফেলেছে অন্য পক্ষকে। কাজেই কেউ আর সেখানে খাজনা চাইত না। কোনো দলের সিপাইরা আর সেখানে জুলুম করত না। গ্রামের লোক তাই মহা আনন্দে দিন কাটাত।

কুমিউসি

এক

দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগ। প্রায় আটশো বছর আগেকার কথা।

মধ্য-এশিয়ার গোবি মরুভূমির এক জনহীন প্রান্তর। প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে এক চওড়া পায়ে-চলা পথ ধরে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে দুটি মানুষ। একটি মধ্যবয়সি পুরুষ, অন্যটি কিশোর। আধবয়সি লোকটির গায়ে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। তার মুণ্ডিত মাথায় এক টুকরো হলদে কাপড় জড়ানো।। পায়ে পথ-চলার মোটা পশমের জুতো। উচ্চতা মাঝারি। শীর্ণ মুখ। রোদে পুড়ে তামাটে রঙ প্রায় কালচে হয়ে গেছে। কিন্তু তার মুখে এক অতি চমৎকার প্রশান্ত ভাব। স্নিগ্ধ চোখ দুটি বুদ্ধি মাখানো, উজ্জ্বল। পথিককে দেখে বোঝা যায় তিনি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-ভিক্ষু।

কিশোরটির পরনে সাদা রঙের ঢোলা লম্বা জামা ও ইজের। মাথায় কালো চিনা টুপি! পায়ে জুতো। উচ্চতায় সে ভিক্ষুর মাথা ছাড়িয়েছে। ছিপছিপে গড়ন, ফরসা রুক্ষ, চোখা নাক, সুন্দর মুখশ্রী। দুজনের কাঁধে দুটি ঝুলি।

ভিক্ষু কোমল স্বরে বললেন, 'হর্ষ, ক্লান্তি লাগছে নাকি?'

কিশোর আগে আগে চলছিল। ঘাড় ফিরিয়ে হাসি মুখে উত্তর দিল, 'উঁহু।' তারপর যেন একটু উদ্‌বিগ্নভাবে বলল, 'বিকেল হয়ে গেল যে, সরাইখানা আর কদ্দূর? সন্ধের আগে পৌঁছতে পারব তো? রাত্রি হয়ে গেলে সরাইয়ের দরজা যদি বন্ধ করে দেয় তখন বাইরে ঠান্ডায় রাত কাটাতে হবে। উঃ, যা দেশ! দিনে যেমনি গরম, রাত্তিরে তেমনি ঠান্ডা। যেন হাড়ে কাঁপুনি ধরে।'

ভিক্ষু বললেন, 'সন্ধের আগেই তো পৌঁছবার কথা।'

'জল চাই। আমাদের খাবার জল ফুরিয়ে গেছে।' হর্ষ বলল। ভিক্ষু বললেন, 'ভয় নেই, সরাই আর বেশি দূর নয়। তারপর তিনি একটু থেমে বললেন, 'বাক্সটা ঠিক আছে তো?' হর্ষ বলল— 'আছে।'— 'মানে দুপুরে যখন আমরা পাথরের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করেছিলাম তখন তুই ওটা বের করেছিলি। ঝোলায় পুরেছিস তো?' কিশোর একটু জোরের সঙ্গে বলে— 'হ্যাঁ পুরেছি। তোমায় অত ভাবতে হবে না। আমি কি ছেলেমানুষ যে হারিয়ে ফেলব। দেখো, তোমার দেশে পৌঁছে বাক্স ঠিক তোমার হাতে তুলে দেব। ভিতরের কোনো জিনিস খোয়া যাবে না।

ভিক্ষু বললেন— 'বেশ বেশ।'

ভিক্ষু পথের ডানপাশে দেখতে থাকেন।— বহুদূর অবধি উঁচুনীচু পাথুরে জমি। আরও দূরে দেখা যাচ্ছে বালুরাশি। মরুভূমির প্রান্তরেখা। শেষ বিকেলের রাঙা রোদ পড়ে চকচক করছে বালুকণা। কী নীরস প্রান্তর। এতটুকু সবুজের ছোপ নেই কোথাও। নেই কোনো গাছ বা ঘাস। একটিও প্রাণীর চিহ্ন নেই প্রান্তরের বুকে। প্রাচ্যতুর্কিস্তান বা মধ্য এশিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চলেই এইরকম দৃশ্য চোখে পড়ে। শুধু আকাশে কয়েকটা শকুন পাক খাচ্ছে। তীক্ষ্ণ চোখে খুঁজছে শিকার। যদি কোনো হতভাগ্য মানুষ বা পশু মরুরাজ্যে পথ হারিয়ে খাবার ও জলের অভাবে প্রাণ হারায় ওরা তখন নেমে আসবে তাদের লক্ষ্য ক'রে।

বাঁ পাশে তাকালেন ভিক্ষু। এদিকে শুধু পাথর আর পাথর। ছোটো বড়ো অজস্র শিলাখণ্ড ছড়িয়ে আছে। জমি ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে এক পাহাড়ের দিকে। আরও পিছনে আকাশের গায়ে মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে এক বিশাল পর্বতমালার উঁচু উঁচু শিখরগুলি। তিনি কিশোরকে ডাক দিলেন— 'হর্ষ, ওই বাঁদিকে দেখ কুনলুঙ পর্বতমালা। জানিস ওই পাহাড়ে অনেক গুহা আছে। সাধু সন্ন্যাসীরা গুহায় নির্জনে তপস্যা করেন। একবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

কিশোর একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'তুমি ওই পাহাড়ে যাবে নাকি।'

ভিক্ষু হাসেন।— 'না রে, আমি এখন সোজা দেশে ফিরব। এই যে কুনলুঙ পর্বত ওর দক্ষিণে রয়েছে বিরাট দুই পর্বতমালা— হিমালয় ও হিন্দুকুশ। সেই দুই পর্বত প্রাচীরের ওপাশে হচ্ছে ভারতবর্ষ। হিন্দুস্থান। আর ভারতবর্ষের পূর্ব

কোণে আমার দেশ। দেখবি কী সুন্দর শ্যামল সে দেশ! কত গাছপালা নদনদী। চোখ জুড়িয়ে যাবে।'

হর্ষ বলল, 'আর কতদিন লাগবে তোমার দেশে পৌঁছতে?'

'আরও বছরখানেকের ওপর তো বটে। এখনও তো অর্ধেক পথ পেরোইনি। এই রাস্তা ধরে আমরা কাশগরে পৌঁছব। আর দুদিনের পথ। কাশগর থেকে যেতে হবে দক্ষিণ-পশ্চিমে। পৌঁছব হূনদের রাজ্য বাদাস্কান। সেখান থেকে গিরিপথের ভিতর দিয়ে কাবুল নদীর তীর বেয়ে ঢুকব ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় পরুষপুর (পেশোয়ার) নগরে। তারপর যাব ভারতের পূর্ব অংশে। এখনও অনেক পথ বাকি।'

—'বাপরে! আরও বছরখানেক।' হর্ষ মুখভঙ্গি করে বলে।

—'এক বছর ধরে তো হাঁটছি। সেই কবে চীন দেশ থেকে রওনা হয়েছি।' সে একবার চারদিক দেখে বলল, 'কী বিচ্ছিরি দেশ। কেবল ধূ ধূ মাঠ, মরুভূমি, নেড়া পাহাড়। যেন ফুরোয় না। পথে দেখল কতগুলো নগরকে মরুভূমি প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। লোকজন পালিয়ে যাচ্ছে নগর ছেড়ে।'

—'হুঁ।' বিষণ্ণভাবে ভিক্ষু জবাব দেন। সত্যি অনেক দূরে দূরে নদীতীরে বা মরূদ্যানে যে কটি জনপদ এখানে গড়ে উঠেছিল, সেগুলি ক্রমে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মরুভূমির আক্রমণে। অথচ হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণকাহিনিতে আছে তখন এই নগরগুলি কত সমৃদ্ধ ছিল। গাছপালা ফুলফলে সাজানো থাকত।

হিউয়েন সাং-এর কথা ভাবতেই ভিক্ষুর মনে হয় যে পথ দিয়ে তাঁরা চলেছেন, এই পথ ধরে হিউয়েন সাং হয়তো একদিন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। এই দুর্গম রাস্তা দিয়ে যুগযুগান্তর ধরে শুধু যে নানাদেশের বণিকরা যাতায়াত করছে তাই নয়, কত জ্ঞানী, গুণী ধর্মপ্রচারকও গিয়েছেন। কেউ চীনদেশ থেকে ভারতবর্ষে গিয়েছেন। কেউ বা ভারতবর্ষ থেকে মধ্য এশিয়া ও চীনদেশে এসেছেন।

বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা প্রচার হয়েছে এখানে। এ পথের ধূলিকণা পবিত্র হয়ে আছে তাঁদের পাদস্পর্শে।

নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন ভিক্ষু। হঠাৎ হর্ষের উৎফুল্ল কণ্ঠে চমক ভাঙে।— 'অভিরাম দাদা ওই দেখো সরাইখানা দেখা যাচ্ছে।'

চোখ তুলে ভিক্ষু দেখলেন পশ্চিম দিগন্তের বুকে একটি দুর্গের মতো বাড়ির মাথা জেগে উঠেছে। কালো পাথরে তৈরি উঁচু তোরণের পিছনে গোধূলির

রক্তিম আকাশ ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে। সারাদিন হাঁটার পর বিশ্রামের আশায় দুজনেরই চলার গতি বেড়ে যায়।

পথের পাশে সরাইখানা বাড়িটা প্রায় পনেরো হাত উঁচু পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রকাণ্ড সিংহদরজা হাট করে খোলা। মানুষ ও পশুর বহু কণ্ঠের কলরব ভেসে আসছে ভিতর থেকে। সরাইয়ের কাছেই কয়েকটি তাঁবু পড়েছে। তাঁবুগুলির আশেপাশে অনেক মেয়ে পুরুষ। সবাই বেশ শক্ত সমর্থ। মেয়েরা রান্নার জোগাড় করছে। পুরুষরা করছে গল্পগুজব। অনেক ভেড়া ও গাধা ঘুরছে কাছাকাছি। ভিক্ষু একটুক্ষণ দেখে বললেন— 'যাযাবর তুর্কি। ওরা সরাইয়ের ভিতরের চেয়ে বাইরে খোলা মাঠে থাকতে ভালোবাসে।'

হর্ষর ইচ্ছে যাযাবরদের সঙ্গে একটু ভাব জমায়। কিন্তু ভিক্ষু বারণ করলেন। 'চল, সরাইয়ে ঢুকি, সন্ধ্যা হয়েছে। এবার ফটক বন্ধ করে দেবে।'

দুজনে সরাইয়ের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

হঠাৎ মনে হল যেন দমবন্ধ হয়ে যাবে। কেমন চাপা ভ্যাপসা ভাব। বিচ্ছিরি গন্ধ। হট্টগোল। পিছন ও দুপাশের দেওয়াল ঘেঁষে সারি সারি ঘর। ইটের তৈরি। ঘরগুলির সামনে বারান্দা। ঘরগুলির মাঝে ও ফটকের সামনে অনেকখানি উঠোন। উঠোনের এক কোণে পাঁচিল ঘেঁষে হরেক রকম পশু গাদাগাদি করে রয়েছে। উট, ঘোড়া, গাধা, বলদ। তারা নিশ্চিন্ত মনে জাবর কাটছে। এরা ভারবাহী পশু, মরুপথের একান্ত দরকারি জীব। মানুষের ভিড় চত্বরের ভিতর দিকে— বারান্দায়। ছোটোছোটো ঘরগুলিতে। অনেক প্রদীপ জ্বলছে সরাইয়ের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে। কোথাও কোথাও আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসেছে লোকে। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছোটো বড়ো দলে অনেক লোক বসে বা দাঁড়িয়ে আছে। সবাই কথা বলছে। কেউ নীচুস্বরে। কেউ হই হই করে। বারান্দার ওপর বড়ো বড়ো মালের গাঁটরি থাক থাক করে সাজানো। উঠোনের মধ্যে একটি কুয়ো। অনেকে পাত্র হাতে তার চারপাশে ভিড় করেছে। একজন বালতি ডুবিয়ে জল তুলছে, তারপর মেপে মেপে জল দিচ্ছে। মরুরাজ্যে জল বড়ো মূল্যবান জিনিস।

হর্ষ বলল, 'শোবার জায়গা পাব তো?' ভিক্ষু বললেন, 'দেখি। চলো ভিতরে এগোই।'

উঠোনে দাঁড়িয়ে দুজনে এদিক-ওদিক চাইছে এমন সময় একটি লোক এগিয়ে এল। লোকটি জাতিতে চীনা। বলল— 'ভিক্ষু স্বাগত। আমি সরাইওলা। আপনাদের কী প্রয়োজন? ঘর? খাবার? আগুন?'

ভিক্ষু বললেন, 'ধন্যবাদ। ঘর দরকার নেই, বারান্দার এক কোণে একটু রাতের আশ্রয় চাই। খাবার সঙ্গে আছে।'

সরাইওলা বলল, 'ওই কোণটায় থাকতে পারেন। ওখানে বাতাস কম আসে। কোনো প্রয়োজন হলে জানাবেন।'

ঘুপসি কোণ। ভালোই। বেশ নিরিবিলি। ভিক্ষু কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রাখলেন। হর্ষ ধপ করে তার ঝোলা মেঝেতে ফেলল। ভিক্ষু চমকে বললেন— 'গেল বোধহয় বাক্সটা। তোর কাছে রাখতে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে।' হর্ষ একগাল হেসে বলল, 'কিস্‌সু হবে না। কম্বলে ভালো করে জড়িয়ে রেখেছি। পিঠে লাগছিল কিনা।'

ভিক্ষু জুতো খুলে একটি ভেড়ার লোমের মোটা আসন বের করে পেতে বসলেন। হর্ষকে বললেন, 'বস।' হর্ষ বলল— 'দাঁড়াও, জল আনি।' একটা ঘটি হাতে সে কুয়ো পারে গেল। একটু পরে জল নিয়ে এল। চমৎকার ঠান্ডা জল। ভিক্ষুর প্রাণ জুড়িয়ে গেল। এই সরাইয়ের নাম শুনেছিলাম— মিষ্টি-জল? সার্থক নাম।

হর্ষ বলল, 'আমি একটু ঘুরে আসি। তুমি জিরোও।' সে চত্বরের দিকে পা বাড়াল।

ভিক্ষু হাসেন। উঃ, কী ছটফটে ছেলে। সব সময় টগবগ করছে। ওকে দেখে নিজের ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায়। ভাবেন, 'আমিও এমনি অস্থির ছিলাম। দিনরাত হই হই। লেখাপড়ার বালাই নেই। কেবল বকুনি খেতাম।'

কিন্তু এ ছেলেটার কি আর পড়াশুনা হবে? অনেক চেষ্টা তো করছেন। এদিকে বুদ্ধি বেশ। ভারি সরল স্বভাব। সর্বদা হাসিখুশি। লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে ওস্তাদ। কিন্তু পড়ায় মন নেই। দুবছর আগে হর্ষকে নিয়ে চীনের পূর্বদিকে নিপ্পন দ্বীপপুঞ্জে (জাপান) গিয়েছিলেন। সেখানে থাকেন প্রায় এক বছর। হর্ষকে কিয়োতো শহরে এক নিপ্পনীর কাছে রেখে তিনি সারা দেশময় ঘুরে বেড়ান। মঠে মঠে তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পণ্ডিতদের সঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করেন। ভিক্ষু ভাবেন, অনেকদিন তখন কাছে ছিল না। এই ফাঁকে ছেলেটা কী করেছে কে জানে? যে কটি বই পড়তে বলে গিয়েছিলাম, তার একটিও পড়েনি সে।

সরাইখানার ফটক সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। সূর্য ডুবে গেছে। আকাশে তারা

ফুটছে। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। চাঁদ এখনও ওঠেনি। কয়েকটা মশাল জ্বলে উঠল উঠোনে। ভিক্ষু চুপচাপ বসে যাত্রীদের লক্ষ্য করতে থাকেন।

সরাইয়ের ভিতর আলো-আঁধারির জগৎ। কত জাতের, কত দেশের লোক এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের চেহারা বেশবাস দেখে ভিক্ষু তাদের জাতি বোঝার চেষ্টা করেন।— চীনা, মঙ্গোল, তুর্কি, পারসিক, তিব্বতী। আরও কিছু লোক রয়েছে, তাদের ঠিক চিনতে পারেন না। এরা সবাই প্রায় ব্যবসায়ী, ঘুরে ঘুরে বাণিজ্য করে।

নানা ভাষার টুকরো টুকরো কথা কানে আসে। ভিক্ষু চীনা ভাষা ভালো জানেন। তুর্কি আরবিও কিছু কিছু শিখেছেন। চত্বরের মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে একদল মঙ্গোল হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে। জোরে জোরে তাল ঠুকছে।

মাথায় চোঙা টুপি, ঝলমলে ঢোলা পোশাক গায়ে। ছুঁচলো দাড়ি। লিকলিকে ঢেঙা এক তুর্কি, হাত মুখ নেড়ে কী জানি বলছে। কয়েকজন চীনা মন দিয়ে শুনছে। ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে হর্ষ। মশগুল হয়ে গল্প গিলছে। ভিক্ষু কান পেতে শুনতে চেষ্টা করেন।— কোথায় জানি যুদ্ধ হয়েছে তার বর্ণনা। এমনি করেই এখানে লোকে দেশবিদেশের খবর পায়। এক দেশের খবর অন্য দেশে ছড়ায়।

কয়েকজন তিব্বতি মাটিতে অনেকগুলো পশুর চামড়া বিছিয়ে বসেছে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে এক লম্বা ফরসা সুপুরুষ ব্যক্তি। তার গায়ে দামি পোশাক। মাথার পাগড়িতে জরি চকচক করছে। মুখে লম্বা কালো দাড়ি। মৃদু স্বরে কথা হচ্ছে। তিব্বতিরা হাত নাড়ছে, ঘাড় দোলাচ্ছে। বোধহয় লোকটি চামড়া কিনতে চায়। দরদস্তুর চলছে। ভিক্ষু দেখলেন, দরাদরি শেষ হল। বণিক একটি থলি থেকে কিছু মুদ্রা বের করে দিল তিব্বতিদের হাতে। একজন লোক? বোধহয় বণিকের অনুচর এসে চামড়াগুলো গুছিয়ে তুলে নিয়ে গেল। বণিক সরে গেল। এবার তিব্বতিরা ঝুড়ি খুলে মোটা মোটা চাপাটি ও মাংসের কাবাব বের করে আনন্দে খেতে শুরু করল।

ভিক্ষুর এখনও খিদে পায়নি। হর্ষরও পাত্তা নেই। থাক, খানিক পরে খাওয়া যাবে। তার সঙ্গে আছে সামান্য খাদ্য— রুটি, শুকনো খেজুর ও নুন।

কিছুদূরে বারান্দায় চারজন সম্ভ্রান্ত চেহারার চৈনিক মুখোমুখি বসে। তারা ছোটো ছোটো বাটিতে কোনো গরম পানীয় আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে খাচ্ছে।

ভিক্ষু ভাবলেন— নিশ্চয় চা। এই পানীয় তিনি চীনদেশে কয়েকবার খেয়েছেন। বেশ খেতে। শীত কমে।

যে সদাগর চামড়া কিনেছিল, সে হঠাৎ কোথা থেকে এসে ভিক্ষুর সামনে দাঁড়াল। মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে আরবিতে বলল— 'ভিক্ষু, নমস্কার। আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম। আমার বাড়ি সমরকন্দ। পেশা বাণিজ্য। এ পথে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আর বড়ো দেখা যায় না। তাই কৌতূহল হল।'

ভিক্ষু বললেন, 'ভগবান তথাগত আপনার মঙ্গল করুন। আপনি কি বৌদ্ধ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'সমরকন্দে কত বৌদ্ধ আছেন?'

—'এখন খুব কম। তবে একসময় আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রভাব ছিল।'

ভিক্ষু বললেন, 'হ্যাঁ জানি। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন। একটা কম্বল পেতে দিই।' বণিক বলল, 'আমি বসছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না।' সে ঘাড় ফিরিয়ে ইঙ্গিত করতেই তার এক অনুচর একটি দামি আসন সামনে পেতে দিল। বণিক বসল। 'আপনি কোন দেশ থেকে আসছেন?' সে প্রশ্ন করল।

—'চীনদেশ থেকে।' ভিক্ষু বললেন।

—'কোথায় যাবেন?'

—'হিন্দুস্থান।'

—'আপনি কি হিন্দুস্থানের অধিবাসী?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম।' বণিক বলে। 'আচ্ছা হিন্দুস্থানের কোন প্রদেশে যাবেন?'

—'বঙ্গদেশ। গৌড়বঙ্গের নাম শুনেছেন?' ভিক্ষু বলেন। 'হিন্দুস্থানের পূর্বপ্রান্তে এই প্রদেশ। আমি বঙ্গদেশের লোক।'

—'বঙ্গদেশের নাম শুনেছি বইকি। গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত এই প্রদেশ। রাজধানী গৌড় নগরী নাকি অতি সুন্দর। বঙ্গদেশের রেশমের কাপড় কতবার কিনেছি। অমন রেশম চীনদেশেও তৈরি হয়নি। আচ্ছা গৌড়ের রাজা এখন কে?'

ভিক্ষু উত্তর দিলেন, 'আমি দেশ ছাড়ার সময় গৌড়াধিপতি ছিলেন রামপাল। অনেক বছর কেটে গেছে। দেশের খবর পাইনি। জানি না রামপাল এখনও রাজা আছেন কিনা।'

—'কতদিন দেশ ছেড়েছেন?'

—'প্রায় পনেরো বছর হল।'

—'ওঃ, এতদিন আগে। কী কাজে চীনদেশে গিয়েছিলেন? জানতে আগ্রহ হচ্ছে। ধর্মপ্রচার করতে?'

—'না। বিক্রমশীলা মহাবিহারে দুজন চীনা ভিক্ষুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁরা চীনদেশে বসে সংস্কৃত ভাষায় লেখা কিছু বৌদ্ধশাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করবেন। এ কাজে তাঁদের সাহায্য করতে একজন সংস্কৃত জানা ভারতীয় ভিক্ষুকে তাঁরা চীনদেশে নিয়ে যেতে চান। আমি যেতে রাজি হই। তারপর তাঁদের সঙ্গে চীনদেশে চলে যাই। কাজ শেষ হয়েছে, তাই এবার ফিরছি।'

—'যাবার সময় কি এ পথ দিয়ে গিয়েছিলেন?'

—'না। গিয়েছিলাম তিব্বতের ভিতর দিয়ে। কিন্তু এখন বয়স বেড়েছে। হিমালয়ের উঁচু উঁচু গিরিপথগুলি ডিঙোতে আর সাহস হল না। তাই এ পথে চলেছি। এ পথে সময় বেশি লাগবে। তবে এ দেশটি দেখারও ইচ্ছা ছিল মনে।'

কয়েকজনের তর্কাতর্কি শোনা গেল। তাদের গলা ক্রমে চড়ছে। ভিক্ষু একটু উদ্‌বিগ্নভাবে সে দিকে তাকালেন।— হুঁ, ঠিক যা ভেবেছেন। হর্ষ লোকগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে। একটা হুজুগের গন্ধ পেলেই ও সেখানে গিয়ে জুটবে।

বণিক বলল, 'ভয় নেই, তর্ক হাতাহাতিতে গড়াবে না। তেমন সম্ভাবনা দেখলে অন্যরা গিয়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেবে।' ভিক্ষু বললেন, 'তা হলেই ভালো। ছেলেটা আবার ওখানে গিয়ে জুটেছে।'

—'কে ছেলেটি?' বণিকের কণ্ঠে কৌতূহল। 'আপনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। দেখে তো ভারতীয় মনে হয় না।'

—'না, ভারতীয় নয়। বোধহয় ইরানি, ভিক্ষু বললেন, 'ওর সঠিক পরিচয় আমি জানি না। প্রায় দশ বছর আগে চীন থেকে মরুভূমির ভিতরে এক বৌদ্ধ বিহার দর্শন করতে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় ছেলেটাকে পথের পাশে কুড়িয়ে পাই, অজ্ঞান, মৃতপ্রায় অবস্থায়। অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে তুলি। তখন ওর বয়স মাত্র পাঁচ-ছয় বছর। তার পর থেকে আমার সঙ্গেই আছে।'

ভুরু কুঁচকে বণিক বলল, 'হয়তো ক্রীতদাস। মরে যাবে ভেবে কেউ ফেলে রেখে গিয়েছিল। যাক ভালোই হয়েছে, আপনার আশ্রয় পেয়েছে।'

ভিক্ষু বললেন, 'ভেবেছিলাম চীনদেশেই কারো কাছে ওকে রেখে আসব।

কিন্তু কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। তাই বাধ্য হয়ে নিয়ে চলেছি। বড়ো দুরন্ত স্বভাব।'

এই অচেনা বিদেশি সদাগরের সম্বন্ধে জানতে ভিক্ষুর কৌতূহল হচ্ছিল। পুঁথির রাজ্যে বাস করলেও তাঁর মন সরস আছে। দেশভ্রমণ করতে ভালোবাসেন। দেশবিদেশের লোকের কথা জানতে তাঁর ভালো লাগে। বললেন—'মহাশয়, নিজের কথাই কেবল বলছি। আপনার কথা তো কিছু শুনলাম না। আপনি কি প্রতি বছর এদিকে বাণিজ্য করতে আসেন?'

'হ্যাঁ প্রায় প্রতি বছর,' বণিক জবাব দেয়। 'দু-একবার হিন্দুস্থানেও গিয়েছি। একবার দিল্লি হয়ে মথুরা অবধি গিয়েছিলাম। আর একবার জাহাজে যাই পোরবন্দর, মুক্তো কিনতে।'

—'সাধারণত কী কী বাণিজ্য করেন?'

বণিক হাসে। 'শুনবেন? বেশ।— সঙ্গে নিয়ে আসি পারস্যের গালিচা, ইতালি ও গ্রিসের আয়না, দমস্কের তরবারি, বুখারা সমরকন্দের লোমওলা ভেড়ার চামড়ার জামা।— এই সব। আর এসব জিনিস বিক্রি করে, কিনে নিয়ে যাই— চীনা ও ভারতীয় রেশম, মসলিন। ভারতের হাতির দাঁত ও রত্ন পাথর, চীনা কাগজ, চীনামাটির পাত্র, খোটান কাশগরের কম্বল ও পশম, কাবুল কান্দাহারের কিসমিস, আখরোট, বাদাম। কখনো তিব্বতি ও মঙ্গোলদের কাছ থেকে কিনি পশুচর্ম। এমনি যখন যা যা সুবিধা পাই। এবার গিয়েছিলাম ইয়ারকন্দ অবধি। এখন দেশে ফিরছি।'

আবার গোলমাল শোনা গেল। লোকগুলোর মেজাজ যেন চড়ছেই। ভিক্ষু ব্যস্ত হয়ে তাকালেন। হ্যাঁ, হর্ষ ভিড়ের মধ্যে তখনো দাঁড়িয়ে আছে।

বণিক বুঝল। 'ছেলেটার জন্যে ভয় পাচ্ছেন। বেশ ডেকে দিচ্ছি।' সে ডাক দিতেই তার এক অনুচর দৌড়ে এল। হর্ষের দিকে আঙুল দেখিয়ে কী জানি বলল বণিক। লোকটি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে হর্ষকে কিছু বলতেই, সে তার সঙ্গে চলে এসে ভিক্ষুর সামনে দাঁড়াল।— 'আর্য, আমায় ডাকছেন?'

ভিক্ষুর হাসি পেল। ছেলেটার এই এক রোগ। বাইরের কারও সামনে ভিক্ষুকে সম্মান দেখাতে এমনি সাধু ভাষা বলবে। অথচ আড়ালে একা থাকলে দিব্যি অভিরামদাদা, তুমি, বলে। অভিরামদাদা বলে ডাকতে তিনিই শিখিয়েছেন। ছোটোছেলের মুখে ওই আর্যটার্য কেমন পাকা পাকা শোনায়। এসব পোশাকি ভদ্রতা তিনি পছন্দ করেন না। ভিক্ষু বললেন— 'এবার চুপ

করে বসো। অনেক ঘুরেছ।' হর্ষ সমরকন্দের বণিককে একবার দেখে নিয়ে ভিক্ষুর পাশে বসল।

একটি লোক কাছ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। বণিক তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল— 'আদাব আলিভাই। সব কুশল তো? তোমাকে একবারও দেখিনি। শুনলাম সরাইয়ে উঠেছ। কাবুল কান্দাহারের খবর কী?'

লোকটি দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে উত্তর দিল— 'আদাব শাহীভাই। ভালো আছ তো। তবিয়ত একটু গরবর করছিল তাই শুয়ে ছিলাম। কাবুল কান্দাহার এখন ঠান্ডা। আরবদের উৎপাত কমেছে। চললাম, ভাই।'

বণিক একটু ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, মাপ করবেন। আপনাদের রাতের খানা কি হয়ে গেছে?'

ভিক্ষু বললেন— 'না, এখনও হয়নি। কেন?'

—'যদি আমার সেবা গ্রহণ করেন তো কৃতার্থ হই। ইয়ারকন্দের তরমুজ। চিনির মতো মিষ্টি। সন্ন্যাসী তৃপ্তি পেলে আমার পুণ্য হবে।'

ভিক্ষু স্মিত মুখে বললেন, 'বেশ, দিন।'

বণিক তার এক অনুচরকে ডেকে কিছু বলতেই সে নিয়ে এল হলদে সবুজ রঙের বেশ বড়ো একটি তরমুজ। বণিক নিজের হাতে সেটি ভিক্ষুর পায়ের কাছে রাখল। হর্ষর চোখ চকচক করে উঠল তরমুজ দেখে।

বণিক বলল, 'এবার আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি যাই। আপাতত কাশগর যাবেন তো। ভোরে বেরবেন নিশ্চয়? আমিও সকালে বেরব। আচ্ছা সেলাম।' বণিক ভিক্ষুদের কাছেই একটি কুঠুরিতে ঢুকল।

ভিক্ষু ও হর্ষ খাওয়া সারল। তরমুজের বেশির ভাগই গেল হর্ষের পেটে। হর্ষ সমানে বকবক করছিল। আজ কোথায় কী কী শুনেছে, তার গল্প। কোন মরূদ্যানে নাকি পূর্ণিমা রাতে জিন পরিরা নাচগান করে। সেদিন রাতে কেউ বাইরে থাকে না। একজন বেরিয়েছিল। তারপর পরিদের পাল্লায় পড়ে সারারাত ধেই ধেই করে নেচেছে। পরদিন কোমরের ব্যথায় কুপোকাত। জোর বরাত তাই প্রাণে বেঁচে গেছে। পশ্চিম দেশে খুব যুদ্ধ হয়েছে আরব আর তুর্কিতে। আরবরা হেরে ভূত হয়ে গেছে। এমনি কত খবর।

ভিক্ষু কিন্তু আনমনে ভাবছিলেন সমরকন্দের বণিকের কথা। কী অদ্ভুত জীবন! সারা বছর পথে পথে ঘোরে। দেশের বাড়িতে থাকে আর কতটুকু।

হর্ষ হঠাৎ চাপা স্বরে বলল— 'জান, ওরা বলাবলি করছিল কতগুলো ডাকাত নাকি সৈন্যদের তাড়া খেয়ে এদিকে পালিয়ে এসেছে।'— 'তাই নাকি?' ভিক্ষু অন্যমনস্কভাবে জবাব দেন।

—'আচ্ছা কোনো দলের সঙ্গে কাশগর অবধি গেলে হয় না?'— 'নাঃ', ভিক্ষু ঘাড় নাড়েন। 'একগাদা লোকের সঙ্গে চলতে আমার ভালো লাগে না। একা একা বেশ দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে যাওয়া যায়। তাছাড়া দস্যুরা আমাদের কিছু বলবে না। তারা জানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে ধনরত্ন থাকে না। যদি বা ধরে, নেবে কী?'

—'কেন, যদি বাক্সটা কেড়ে নেয়?'

—'বাক্স? হুঁ।' ভিক্ষুর মুখে চিন্তার ছাপ পড়ে। একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন— 'দেখো আমার মনে হচ্ছে ভাবনার কোনো কারণ নেই। এতটা পথ এলাম। কোনো চোর ডাকাত তো কই আমাদের দিকে ফিরেও চায়নি। আমরা একাই যাব। নাও, কম্বল বের কর। শুই।'

বেশ ঠান্ডা পড়েছে। কালো আকাশপটে অজস্র জ্বলজ্বলে তারা। আধখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে! উঠোন প্রায় ফাঁকা। মাত্র কয়েকজন তখনও আগুনের ধারে বসে। বারান্দার এখানে-ওখানে লোকে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। কেউ শোয়ার আয়োজন করছে। ঘরের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাদের কয়েক হাত দূরে তিন-চারজন আপাদমস্তক ঢেকে শুয়েছে। মধ্যিখানের ফাঁকা জায়গায় খানিক কাঠ কয়লার আগুন জ্বলছে! ভালোই হল। তারাও একটু আগুনের তাত পাবে। যা শীত। মশাল ও প্রদীপগুলো প্রায় নিবিয়ে ফেলা হয়েছে। চাঁদের আলোয় যেটুকু দেখা যায়। ভিক্ষুদের উল্টোদিকে বারান্দার কোণে একটা লোক বসে আছে। ভিক্ষু নজর করেছেন, যখন তিনি সমরকন্দের বণিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন লোকটা এসে বসল। তারপর থেকে ও চুপচাপ ঠায় বসে আছে।

হর্ষ ভিক্ষুর ঝুলি থেকে দুটো কম্বল বের করল। একটা পাতল মেঝেতে। অন্যটা ভিক্ষু গায়ে দেবেন। তারপর সে নিজের ঝুলি থেকে টান মেরে একটা কম্বল বের করতেই খটাস করে ভারি কোনো জিনিস মেঝেতে পড়ল।

হর্ষ জিব কেটে আঁতকে ওঠে— 'ওই যা! বাক্সটা কম্বলে জড়ানো ছিল ভুলে গেছি।' সে তাড়াতাড়ি জিনিসটা কুড়িয়ে নিল।— 'দেখি ভাঙল কি না?' পাশে আগুনের আভায় হর্ষ সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

জেড পাথরের ভারি সুন্দর সবুজ রঙের একটি চৌকো বাক্স। প্রায় আধ হাত লম্বা, ছয় আঙুল মতো চওড়া।— 'নাঃ, ফাটে-টাটে নি।'

খুট করে শব্দ হল। বাক্সর ডালা একটু খুলে সে ভিতরে উকি মারল। তারপর সেটা বন্ধ করে ভিক্ষুর হাতে দিল।— 'দেখো, কিছু নষ্ট হয়নি।' ভিক্ষু বাক্স নিয়ে— 'এটা এখন আমার কাছে থাক' বলে সেটা নিজের ঝোলায় পুরে, ঝোলাটা মাথার নীচে গুটিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন। হর্ষ গোমড়া মুখে ব্যাপারটা দেখল। তারপর সেও পাশে শুয়ে পড়ল।

দুই

ভিক্ষুর যখন ঘুম ভাঙল, তখনও রাত কাটেনি। অন্ধকার একটু ফিকে হয়েছে মাত্র। সরাইয়ের জীবন সবে জাগছে। আবছা অলোয় দু-একজন চলাফেরা করছে। ভিক্ষু হর্ষকে ডেকে তুললেন। হাতমুখ ধুয়ে ঝোলাঝুলি গুছিয়ে প্রস্তুত হলেন। সরাইয়ের ফটক খুললেই বেরিয়ে পড়তে হবে।

সমরকন্দের বণিকও ভোরে বেরবে বলেছে। দেখা হলে যদি আবার একসঙ্গে যেতে অনুরোধ করে তো মুশকিল। খানিক পরে পুব আকাশ রাঙা হয়ে উঠল। উঠোনে লোকের আসা-যাওয়া বেড়েছে। উট-ঘোড়াদের সাজ পরিয়ে তৈরি করানো হচ্ছে। গাড়ি জোতা হচ্ছে। ক্যাঁচ কোঁচ শব্দে ফটক খুলে গেল। ভিক্ষু উঠে পড়লেন। এই সময় তাঁর চোখ পড়ল তাদের সামনে বারান্দার অন্য কোণে বসা সেই একটা লোকের দিকে। লোকটি উঠে বসে আছে। এক দৃষ্টিতে তাঁদের দেখছে। খুব জোয়ান চেহারা। দেখে মনে হয় মঙ্গোল। মুখের ভাব রুক্ষ। তার তাকাবার ভঙ্গিতে ভিক্ষুর কেমন অস্বস্তি লাগছিল। দুজনে সরাই থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

বাইরে চমৎকার ঠান্ডা বাতাস বইছে। আরামে গা জুড়িয়ে গেল। এখন প্রান্তরের দৃশ্যও বড়ো সুন্দর। পূর্বদিকে মস্ত থালার মতো টুকটুকে লাল সূর্যটা এখনও পুরোপুরি দিগন্তের আড়াল ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে পারেনি। দূর পাহাড়ের শিখরগুলি যেন আবির মেখে রাঙা হয়ে উঠেছে। ভিক্ষু দেখলেন সেই যাযাবরদের তাঁবুগুলি নেই। ওরা রাতেই কোথাও রওনা দিয়েছে।

দুজনে বেশ স্বচ্ছন্দে পা চালায়। হর্ষ কিছুটা এগিয়ে গেছে। সে গুনগুন করে গান ধরেছে। ভিক্ষু মৃদুকণ্ঠে তথাগত বুদ্ধের স্তব করতে করতে চলেছেন। প্রায়

এক দণ্ড চলার পর পথ ক্রমশ একটা পাহাড়ের দিকে বেঁকে যেতে থাকে। ওই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যেতে হবে।

পিছন থেকে খটাখট শব্দ এল ভেসে। কে আসে? দুজনে ফিরে তাকায়। একজন ঘোড়ায় চড়ে বেগে এই পথে আসছে। ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ধুলোর মেঘ উঠছে।

দেখতে দেখতে অশ্বারোহী কাছে এসে পড়ল। ভিক্ষুরা পথের ধারে সরে দাঁড়ায়। অশ্বারোহী ঠিক তাদের পাশে এসে ঘোড়ার রাশ টানল। তারপর লাফিয়ে নামল। ভিক্ষু দেখলেন আরোহী সেই দুশমন চেহারার মঙ্গোল, তাঁদের উল্টো দিকে বারান্দায় যে বসেছিল। লোকটি সত্যি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিরাট। মাথায় সে ভিক্ষুর চেয়ে অন্তত এক বিঘত উঁচু। নিরেট চওড়া শরীর। রঙচঙে পোশাক পরেছে। গলায় দুলছে একটা সোনার হার। কী ব্যাপার! লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে ভিক্ষুর সামনে এসে কর্কশ স্বরে চীনাভাষায় বলল— 'বাক্সটা দাও।'

'বাক্স!' ভিক্ষু অবাক। জানল কী করে।— 'হ্যাঁ, সেই সবুজ পাথরের বাক্সটা। বের করো শীগগিরি। নইলে—' মঙ্গোল একটা ভয় দেখানোর ভঙ্গি করে।

ভিক্ষু শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'কেন কী দরকার?'

'দরকার আছে। দাও।' লোকটা চাপা হুংকার দিল।

ভিক্ষু ঝোলা থেকে বাক্সটা বের করলেন। বললেন— 'এটা কী জন্যে চাইছ বুঝছি। কিন্তু এর মধ্যে কোনো দামি জিনিস নেই। মানে তোমার কাজে লাগবে না। এতে—'

ভিক্ষুর কথা শেষ হয় না। মঙ্গোল থাবা বাড়িয়ে খপ করে বাক্স ভিক্ষুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়।— 'আগে দেখি, পরে কথা শুনব।'

ভিক্ষু লক্ষ্য করলেন, তাঁর পাশে দাঁড়ানো হর্ষ কাঁধের ঝুলি মাটিতে নামাচ্ছে। তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। একটা হাঙ্গামা বাধাল বোধহয়। ভিক্ষু মৃদুস্বরে ধমক দেন— 'আঃ, শান্ত হও। ধৈর্য ধরো।'

হর্ষর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাক্স ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে লোকটা। তার মুখ উৎকট হাসিতে ভরে যায়। সে চাপ দিয়ে খুট করে বাক্সর ডালা খুলে ফেলল।

ভিক্ষু ব্যগ্রভাবে বলে ওঠেন, 'তুমি ভুল ভাবছ। আমার কথা শোনো—'

মঙ্গোল ভিক্ষুর কথায় কর্ণপাত করে না।

বাক্সর নীচের অংশে পাথর কুঁদে ছোটো ছোটো কৌটোর মতো কতকগুলি খোপ বানানো হয়েছে। প্রত্যেকটি কৌটোর মুখে রুপোর ঢাকনি লাগানো। মোট দশটি কৌটো।

মঙ্গোল একটা কৌটোর ঢাকনি আঙুলে চেপে টানল। বেশ শক্ত করে আঁটা। ঢাকনি খুলল না। সে আরও জোরে টানল। ঢাকনি খুলে এল। ঝাঁকুনি খেয়ে বাক্সটা একটু কাত হল।

কৌটো থেকে পাতলা ঝিরঝিরে কাঠির মতো কতগুলো কী জানি চারপাশে মাটি ও বালির ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

'ইস, একী করলে। কী করলে—' বলতে বলতে ভিক্ষু মাটি থেকে সেগুলি কুড়োবার চেষ্টা করে। কিন্তু মাত্র কয়েকটির বেশি খুঁজে পায় না। সব মাটিতে মিশে গেছে।

মঙ্গোল বোকার মতন চেয়ে আছে। ভিক্ষু বললেন, 'বললাম তুমি যা ভাবছ তা নয়। এগুলো ফুলের বীজ। আমার ভারি ফুলের শখ। আমার বাবা ছিলেন রাজ-উদ্যানের মালী।'

মঙ্গোলের চোখে এখনও সন্দেহ।

এমন দামি বাক্সে এমন একটা অতি সাধারণ জিনিস থাকতে পারে সেটা সে বিশ্বাস করছে না।

ভিক্ষু ব'লে চলেন, 'এ অতি মূল্যবান জিনিস। দুর্লভ সুন্দর সুন্দর ফুলের বীজ এগুলো। এসব ফুল আমাদের দেশে হয় না। তাই চীনদেশ থেকে বীজ নিয়ে চলেছি। আমার দেশের মাটিতে এই ফুলগুলি ফোটাতে চেষ্টা করব। একজনের কাছে একটা বাক্স চেয়েছিলাম। যাতে বীজগুলি পড়ে না যায়। শুকনো থাকে। লোকটি ধনী। এই চমৎকার বাক্সটা দিয়েছে।'

মঙ্গোলের মুখ রাগে কালো হয়ে যায়। তার কুতকুতে চোখের তীব্র দৃষ্টি ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে। এতক্ষণে সে কথা বলে।

—'এগুলো ফুলের বিচি নয়, এগুলো ওষুধ। জরিবুটি। হেকিমকে দেখাব যদি কেনে। আর কৌটোর মাল যেমন-তেমন হলেও বাক্সটা বিক্রি করলে ভালো পয়সা মিলবে মনে হয়।'

ভিক্ষু কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা বাক্স নাও। কিন্তু বীজগুলো আমায় দিয়ে যাও। আমার অনেক দিনের পরিশ্রম। কিন্তু ও জিনিস কেউ কিনবে না। আমি টুকরো টুকরো কাপড় দিয়ে বেঁধে নিচ্ছি। দাও ঢেলে নিই।'

তিনি মঙ্গোলের দিকে একটু এগোতেই সে হুংকার দিল— 'চোপ। তফাত যাও।'

হর্ষ এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একটিও কথা বলেনি। হঠাৎ সে এগিয়ে গিয়ে চট করে লোকটার হাত থেকে বাক্সটা কেড়ে নিয়ে কয়েক পা সরে গেল।

প্রথমে চমকে যায় মঙ্গোল। কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে থাকে হর্ষর দুঃসাহসে। তারপর গর্জন ছাড়ে-- 'অ্যাই ছোকরা। দে বাক্স।'

—'বীজ ঢেলে নিয়ে তবে বাক্স দেব।' হর্ষর স্বর দৃঢ় কঠিন। 'আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে বাক্সই পাবে না।'

ভিক্ষু প্রমাদ গোনেন।

—'তবে রে বেটা!' কিন্তু মঙ্গোল হিংস্র জানোয়ারের মতো লাফ দিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে হর্ষর কাঁধের কাছে জামা চেপে ধরে। আর সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের টানে কোমর বন্ধনী থেকে বের করে আনে এক মস্ত ছোরা। হর্ষর বুকের সামনে ঝকঝক করে ওঠে ছোরার তীক্ষ্ণ ফলাটা।

ভিক্ষুর গলা দিয়ে একটা আর্তরব বেরয়— 'মেরো না।' তিনি হাত তুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন দুজনের মাঝে। কিন্তু তখনি যেন এক ভেলকি খেলে গেল চোখের সমুখে।

পলকে হর্ষ বাক্স মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বিদ্যুৎ গতিতে সে এক হাতের মুঠোয় দস্যুর অস্ত্রধরা হাতের কবজি চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন কায়দায় জানি মোচড় দিল তার কবজিতে। 'আঁক'— কাতরে উঠল লোকটা। তার মুঠো থেকে ছোরা পড়ল খসে। পরক্ষণেই লোকটার ডানহাত হর্ষ দুহাত দিয়ে পেঁচিয়ে আটকে ধরে জোরে চাপ দিল। 'আঁ আঁ—' লোকটা যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে ওঠে।

সে বাঁ হাত তুলল হর্ষকে মারবে বলে। সঙ্গে সঙ্গে আবার তার হাতে চাপ দিল হর্ষ।

আর্তনাদ করে ওঠে মঙ্গোল। তার উদ্যত বাঁ হাত নেতিয়ে পড়ে।— 'খবরদার। বাঁ হাত তুলেছ কি এ হাতটা ভেঙে দেব।' হর্ষ শাসায়। তার মুখ তখন হিংস্র রক্তবর্ণ।

—'কী হে বাছাধন কেমন লাগে। বড়ো যে তেজ দেখাচ্ছিলে?' বিদ্রূপের সুরে বলতে বলতে হর্ষ আরও কয়েকবার চাপ দিল তার হাতে। দুর্দান্ত মঙ্গোল তখন অসহায়। ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। হর্ষ হঠাৎ একটু নীচু হয়। তারপর অদ্ভুত কৌশলে লোকটার পা নিজের পা দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে সজোরে

এক ঝটকা মারতেই লোকটার অতবড়ো বিরাট দেহ গোড়াকাটা কলাগাছের মতো দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। ভাগ্যে পাথরের ওপর পড়েনি। তাহলে নির্ঘাত হাড়গোড় ভেঙে যেত। হর্ষ চকিতে ছোরাটা কুড়িয়ে নিয়ে বাঘের মতো লাফ দিয়ে লোকটার মাথার কাছে দাঁড়াল— 'এইবার?'

চিত হয়ে অসাড় ভাবে লোকটা পড়ে আছে মাটিতে। ওঠার শক্তি নেই যেন। নেই আত্মরক্ষার ক্ষমতা। হর্ষর উদ্যত ছুরি ধীরে ধীরে তার কণ্ঠনালি লক্ষ্য করে নেমে আসে। ছুরির ডগা আলতো ভাবে তার গলা স্পর্শ করে। এবার এক হঠাৎ চাপ। ব্যস। হর্ষের ঠোঁটের কোণে, তীব্র চাউনিতে যেন চাপা রসিকতার ছোঁয়াচ। বেড়াল যেমন তার শিকারকে বাগে পেয়ে খেলিয়ে মারে তেমনি হর্ষ বুঝি খেলছে ওকে নিয়ে।— 'কী, ভগবানের নামটাম করবে নাকি? ঝটপট সেরে ফেলো।' হর্ষ বলল। দস্যু নিস্পন্দ। শুধু তার চোখ মৃত্যুর আতঙ্কে বিস্ফারিত। হর্ষ একবার আড়চোখে ভিক্ষুর পানে তাকায়। তারপর সহসা তার ছুরি ধরা হাত গুটিয়ে নেয়। বলে— 'যা পালা, ছুঁচো কোথাকার। আর কখনো আমার সঙ্গে লাগতে এলে তোর ঘাড় ভেঙে দেব। মনে রাখিস।'

লোকটা কিন্তু কিছুক্ষণ উঠতে পারল না। পরে কোনোরকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। বাঁ হাতে সে তার ডান হাতের কনুই ধরে আছে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। সে আস্তে আস্তে তার ঘোড়ার কাছে গেল। কাছেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঘোড়াটা। সে কয়েক বারের চেষ্টায় ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। তারপর ঘোড়া চালাল।

ধীর কদমে ঘোড়া চলল সোজা পাহাড়ের দিকে। একটু পরেই অশ্বারোহী পাথরের ঢিপির আড়ালে অদৃশ্য হল।

হতভম্ব দর্শক ভিক্ষু উচ্চারণ করেন— 'এ কী করে করলি? অতবড়ো জোয়ানটাকে খালি হাতে...'

হর্ষ মাটি থেকে বাক্স কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ওঃ, এ একরকম কুস্তির প্যাঁচ। নিপ্পনি প্যাঁচ। এ দিয়ে নিজের চেয়ে ঢের বড়ো জোয়ানকে খালি হাতে কাবু করা যায়। ছোরাছুরি আটকানো যায়। আমি ইচ্ছে করলে লোকটাকে দারুণ জখম করতে বা একদম শেষ করে দিতে পারতাম। নেহাত তুমি রয়েছ তাই—'

—'এ কোথায় শিখলি?'

—'নিপ্পন দ্বীপে।'

—'কে শেখাল?' ভিক্ষু জিজ্ঞেস করেন।

তার মনে একটা সন্দেহ দানা বাঁধছে। হর্ষ বলল, 'যে বাড়িতে আমি থাকতাম

তার পাশের বাড়িতে এক নিপ্পনি যোদ্ধা থাকত। প্রায়ই যেতাম তার বাড়ি। যোদ্ধার স্ত্রী আমায় খুব ভালোবাসত। এটা-ওটা খেতে দিত। আবিষ্কার করলাম সেই যোদ্ধা সকাল সন্ধ্যা তার দুই শাকরেদকে নিয়ে এ ধরনের প্যাঁচ অভ্যেস করে। ব্যস, ওস্তাদের পিছনে লাগলাম। আমায় শেখাতেই হবে এই প্যাঁচ। শেখাতে কি চায়! বলে, এ নাকি গোপন বিদ্যে। যাকে-তাকে শেখানো হয় না। আমি আবার বিদেশি। আমিও নাছোড়বান্দা। লেগে রইলাম ছিনেজোঁকের মতো। খোশামোদ চালিয়ে গেলাম। বললাম— অস্ত্রছাড়া শুধু হাতে দেশবিদেশে ঘুরি দুজনে। যদি দুষ্টু লোকের পাল্লায় পড়ি। আত্মরক্ষা করব কী করে। দয়া করে শেখাও দাদা। শেষে ওস্তাদ রাজি হল। অনেকটা তোমার কথা ভেবেই। মানে তোমায় আমি বাঁচাব। খুব ভক্তি যে তোমার ওপর। তবে শর্ত করে নিল— ভারতবর্ষে না পৌঁছে কাউকে জানাবে না এ কথা। শুধু খুব বিপদে পড়লে তবেই প্রয়োগ করবে এই প্যাঁচ। খুব গোপনে আমায় শেখাল। ভারি শক্ত! অনেক কসরত করতে হয়। মাত্র কয়েকটা প্যাঁচ শিখতে পেরেছি। ভাগ্যিস শিখিয়েছিল!'

ভিক্ষুর কাছে নিপ্পনের রহস্য এখন পরিষ্কার। কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বলেন— 'কই আমায় বলিসনি তো?'

'ভয় হচ্ছিল। যদি তুমি রাগ কর। এদিকে পড়া করিনি। যা করতে বলে গিয়েছিলে। তাছাড়া ওস্তাদ যে বারণ করেছিলেন কাউকে বলতে। এমনকী তোমাকেও না।'

ভিক্ষু কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'তুমি একটি আস্ত গুন্ডা।'

পিছনে অনেক দূর থেকে কতগুলো আওয়াজ ভেসে এল। মানুষের কথাবার্তা গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ। ভিক্ষু খুশি হয়ে বলে ওঠেন, 'হর্ষ, সরাইখানা থেকে কোনো যাত্রীদল আসছে এ পথে। চলো দেখি।'

হর্ষ ভিক্ষুর মনোভাব বুঝতে পেরেছিল। সে সায় দেয়। দুজনে ফিরে চলে।

তারা দেখে বেশ বড়ো একটা দল এগিয়ে আসছে। অনেক লোক। উট, গাধা, ঘোড়ায় টানা গাড়ি। উটের পিঠে আট-দশজন সশস্ত্র সৈনিকও আসছে সঙ্গে।

দুজনে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রমে দল কাছে এসে পড়ে। সৈনিকরা তাদের লক্ষ্য করছে সন্দিগ্ধভাবে। হঠাৎ তারা দেখল, একজন ঘোড়ার গাড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে উঠে তাদের দিকে হাত নাড়ছে। ভিক্ষু চিনতে পারেন— সেই সমরকন্দের বণিক।

বণিক ভিক্ষুর সামনে এসে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আচার্য, আমার সৌভাগ্য আপনার দেখা পেয়ে গেলাম। কাল রাতে ভাবছিলাম বলি— আমার সঙ্গে

কাশগর অবধি চলুন। পথে দুটো ভালো কথা শুনতে পাব। কিন্তু বলিনি, যদি আপনার অসুবিধা হয়। এখন যখন দেখা পেয়েছি আর ছাড়ছি না। আমার অনুরোধ কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গলাভ থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।'

ভিক্ষু মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ। চলুন তাই যাই।' ভিক্ষু উঠলেন বণিকের গাড়িতে। তারপর হর্ষের দিকে ফিরে বললেন, 'প্যাঁচের নামটা তো বললি না তুই?' হর্ষ একটা উটের পিঠে মহানন্দে জাঁকিয়ে বসেছে। সে অভিরামের দিকে চেঁচিয়ে বলল, 'কুমিউসি!'

এই কুমিউসি আরও প্রায় চারশো বছর পরে জাপানে যুযুৎসু প্যাঁচ নামে খ্যাতি লাভ করে।

১৩৮০

টোপ

তক্তপোশে বসে ক্যাশবাক্সের ওপরে রাখা খেরোর খাতাটায় একমনে হিসেব কষছিলেন নরহরি সামন্ত।

দুপুর প্রায় দেড়টা বাজে। চৈত্র মাস। অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি, তাই ভীষণ গরম পড়েছে। নরহরির পরনে হাতাওলা গেঞ্জি ও ধুতি। তার জামাটা টাঙানো রয়েছে দেওয়ালের হুকে।

পাশের ঘরে কল চলার একঘেয়ে ঘটঘট মাথা ভোঁ ভোঁ করানো শব্দটা এখন স্তব্ধ। সামন্ত মিলের সরষে ও গম ভাঙার মেশিন দুটির ছুটি থাকে দুপুর একটা থেকে সাড়ে তিনটে অবধি। ফের চলে রাত সাতটা পর্যন্ত। মিলের কর্মচারীরা প্রায় সবাই গেছে খেতে। খদ্দেরও নেই কেউ। নরহরিও উঠবেন এখন। মেশিনঘর এবং অফিসঘর ভালো করে বন্ধ করে, তালা মেরে।

নরহরি সামন্তর বয়স ষাট ছুঁয়েছে। স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ। মাথায় ছোটো করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুল। গলায় হরিনামের মালা। সামন্ত মিলের মালিক তিনি। এ ছাড়া মহাজনী কারবারও করেন। রীতিমতো ধনী লোক। বাইরে অতি ভদ্র বিনয়ের অবতার। তবে হাড়কিপ্টে। সারাক্ষণ চিন্তা কীভাবে দুটো বাড়তি পয়সা করা যায়, ছলে বলে কৌশলে।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ।

চশমার ওপর দিয়ে একবার টেরিয়ে দেখে নিয়ে নরহরির চোখ ফের খাতায় নামে।

আগন্তুক নেহাতই নগণ্য ব্যক্তি। শ্রীপতি দাস। খুব গরিব। পড়াশুনা শেখেনি বেশি। সামান্য চাষের জমি আছে। বাঁশ ও তালপাতা দিয়ে চাটাই মোড়া ঝুড়ি

ইত্যাদি বানিয়েও কিছু রোজগার করে। ছোটোখাটো রোগা চেহারা। বয়স বছর পঞ্চাশ। অতি নিরীহ ভালোমানুষ। শ্রীপতির গায়ে ময়লা পুরনো শার্ট ও খাটো ধুতি। পা খালি।

মিলের কর্মচারী রঘু বসেছিল টুলে। তাকে উদ্দেশ্য করে বলল শ্রীপতি, 'এক কেজি আটা দাও তো।'

—'ধারে হবে না।' মুখ না তুলেই গম্ভীর গলায় জানালেন নরহরি।

—'আজ্ঞে নগদই দেব।' পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে, যেন অতি অনিচ্ছায় শ্রীপতি সেটি এগিয়ে দেয় সামন্তকে। বুঝি-বা এই তার আপাতত শেষ সম্বল।

টাকা বেরুতে দেখে রঘু টুল থেকে ওঠে ব্যাজার মুখে। এমন ফালতু খদ্দেরের জন্যে বসে বসে ঝিমুনির সুখটা মাটি হল। সে আটা ওজন করতে যায়।

শ্রীপতি সামন্তমশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে উসখুস করতে করতে বলে, 'উঃ কী রোদ! জল হচ্ছে না মোটে। কী যে হবে?'

—'হুম।' মাথা না তুলেই দায়সারা সায় দিলেন সামন্ত।

রঘু এক ঠোঙা আটা এনে দিল শ্রীপতির হাতে।

নরহরি আটার দাম কেটে রেখে বাকি পয়সা ফেরত দেন শ্রীপতিকে। শ্রীপতি কিন্তু গেল না। সে ইতস্তত করে। তারপর বলে ওঠে, 'আমার কুয়োটা একবার সংস্কার করা দরকার। জল একদম নেমে গেছে। চৈত্রেই এই অবস্থা। বোশেখ-জষ্ঠিতে যে কী হবে? বিশেষ করে খাবার জলটা পাই কোথা?'

নরহরির চোখ খাতার ওপর। তিনি কোনো জবাব দেন না।

শ্রীপতি আপন মনেই বিড়বিড় করে : 'কুয়োটা মজে গেছে একবারে, সংস্কার হয়নি বহুকাল। বাবা এখানে ঘর করেছেন চল্লিশ বছর। এর মধ্যে হয়নি। তার আগে কবে যে হয়েছে কে জানে?'

নরহরি ভ্রূক্ষেপ করেন না শ্রীপতির কথায়।

শ্রীপতি ব'লে চলে, 'রায়বাবুরা কুয়োসুদ্ধই জমিটা দান করেছিলেন বাবাকে। বিরাট ইঁদারা। ওর মাটি তোলা কি সোজা কাজ! আমাদের সাধ্যে কুলোয়নি। অ্যাদ্দিন দরকারও হয়নি। ননীদের কুয়ো থেকে পানীয় জলটা আনতাম গরমকালে। তা ননীর ছেলের এখন আপত্তি। ওর বউ আমার বউমা আর নাতিকে দিয়ে হরদম বেগার খাটায়। নাতিটা ইদানীং করতে চায় না। তাই চটেছে।

আগে আমাদের কুয়োয় জল থাকত সারা বছর। পাড়া প্রতিবেশীরাও নিত। কিন্তু বছর পাঁচেক হল গ্রীষ্মে জল থাকছে না মোটে। বাসন মাজা, কাপড় কাচা চললেও, ঘোলা জল খাওয়া যায় না। এবার যে কী হবে? পুকুরে না হয় অন্য কাজগুলো সারা যাবে। কিন্তু খাবার জল? ননীর ছেলে বলেছে, নিজেদেরটা ঝালিয়ে নাও। কিন্তু করি কেমনে? খরচ কম?'

নরহরি সশব্দে খাতা বন্ধ করলেন। ভুরু কুঁচকে তাকালেন শ্রীপতির দিকে। ভাবে বোঝালেন যে এবারে তিনি বাড়ি যাবেন। এখন আপদটা বিদেয় হলে বাঁচি।

শ্রীপতি তবু নড়ে না। অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে তড়বড় করে বলে ওঠে, 'কিছু টাকা ধার দেবেন সামন্তমশাই। কুয়োটা তাহলে ঝালাই।'

—'ধার!' নরহরির ভুরু কপালে ওঠে।

—'আজ্ঞে বেশি নয়। এই শতখানেক টাকা। তাহলে দুটো মজুর লাগাই ইঁদারার মাটি তুলতে। নইলে গ্রীষ্মে তৃষ্ণার জল না পেয়ে ছাতি ফাটবে যে। আমার বাড়ির কাছাকাছি আর যে কুয়ো নেই, ননীরটা ছাড়া। অনেকদূর থেকে আনতে হবে পানীয় জল। বড়ো কষ্ট হবে।'

—'কেন, নিজে পার না?' নরহরি স্থির চোখে চেয়ে প্রশ্ন করেন, কৌশলটা মন্দ করেনি। জলের নামে ধার চাওয়া। তারপর যে সেটা কোথায় হবে ঈশ্বর জানেন।

শ্রীপতি বলল, 'আজ্ঞে চেষ্টা করেছিলুম। জ্বরে ভুগে আমার শরীরটা কাহিল। নাতি ইস্কুলে পড়ে, জোয়ান হয়নি। মাত্র চোদ্দ বছর বয়স। বাড়িতে এই দুজনই মাত্র পুরুষ। কাল ঘণ্টাখানেক মাটি তুলে একেবারে হাঁপ ধরে গেল। আজ সারা গা ব্যথা। নাতিটারও হাত কেটেছে। অনেক কালের পাঁক। এ কাজ আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। দুজন মজুর লাগাই যদি, সঙ্গে আমি আর নাতিটা খাটব, তাহলে খানিকটা পাঁক তোলা যাবে। তাই দয়া করুন।'

বাঁকা হাসেন সামন্ত, 'আগের বার ধার দিয়ে এক বছরের জায়গায় দেড় বছর লাগিয়েছিলি শোধ করতে। মনে আছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। বড্ড অসুবিধায় পড়েছিলুম। এবার আর হবে না।' মনে মনে ভাবে শ্রীপতি, বাড়তি সুদ যে গুনতে হয়েছিল তাকে সে কথাটি বেমালুম ভুলে গেলেন সামন্তমশাই।

—'বন্ধকি কী রাখবে?'-সোজা কাজের কথা পাড়েন সামন্ত।

—'আজ্ঞে তেমন কিছুই নেই। এক কণাও সোনা নেই বাড়িতে। আমার অসুখ, বউয়ের অসুখে সব গেছে। শুধু কটা থালা বাটি সম্বল। সেগুলি বাঁধা দিলে খাব কিসে? কুমড়ো লাগিয়েছি। জালি এসেছে খুব। ফসল উঠলেই তাই থেকে শোধ করে দেব ধার।' শ্রীপতি হাত কচলায়।

নরহরি ভাবেন, না বাবা, এত সহজে কথায় ভিজলে হরি সামন্তর ব্যাবসা কবে লাটে উঠত। তিনি নীরবে মাথা নেড়ে হাঁক দিলেন, 'ওরে রঘু দরজা লাগা।'

বিমর্ষ মুখে ফিরে যায় শ্রীপতি। দরজার কাছে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। আবার ফিরে আসে নরহরির সামনে।

আচ্ছা জ্বালালে। নরহরি শ্রীপতির দিকে দৃক্‌পাত না করে গায়ে শার্ট গলান।

—'আজ্ঞে এই পেতলের চাকতিটায় কী সব নকশা কাটা রয়েছে। কিছু বুঝতে পারেন এটা কী বস্তু?' শ্রীপতি পকেট থেকে একটা ম্যাড়ম্যাড়ে হলুদ রঙা টাকার সাইজের চাকতি বের করে সামন্তের সামনে ধরে।

একটু অবাক হয়ে নরহরি শ্রীপতির হাতের খোলা তালু থেকে তুলে নেন চাকতিটা। চোখের কাছে পরীক্ষা করতে করতে চমকে ওঠেন। উল্টেপাল্টে দেখেন চাকতিখানা। বুকের ভিতর তার হৃৎপিণ্ডটা তখন লাফাতে শুরু করেছে। আরে এটা যে মনে হচ্ছে মোহর! সোনার মোহর। দু পিঠের লেখাগুলো আরবি কিংবা ফার্সি ভাষায় অনেকদিন আগে একজনের বাড়িতে তিনি নবাবি আমলের মোহর দেখেছিলেন, অবিকল যেন সেই জিনিস। তবে রংটা জেল্লা হারিয়েছে। পেতলই মনে হয় দেখে।

নরহরি ক্যাশবাক্স খুললেন। একটা আতশকাচ বের করে চাকতির গায়ে আঁকিবুকি বা লেখাগুলি পড়তে চেষ্টা করেন। এটা স্রেফ ভান। কারণ তিনি আরবি বা ফার্সি জানেন না মোটেই। যা করলেন, তা হল, ওইরকম দেখার ফাঁকে বাক্সে রাখা একখণ্ড কষ্টিপাথরে লুকিয়ে ঘসে নিলেন চাকতিখানা। সরু সোনালি রেখা পড়ে পাথরের গায়ে।

সোনা! নির্ঘাত সোনার মোহর। নরহরির কলজের ধকধকানিটা আরও প্রবল হয়। বাইরে কিন্তু তিনি নির্বিকার। দীর্ঘ সাধনায় এই কায়দা রপ্ত। ওজনের মারপ্যাঁচে খদ্দের ঠকাবার সময় অথবা সুদের অঙ্ক বাড়িয়ে অজ্ঞ ঘাতককে ফাঁকি দেবার কালে তিনি এমনি ভাবলেশহীন থাকেন বাইরে। উচ্ছ্বাসহীন মৃদু ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পেলে এটা?'

—'আজ্ঞে কাদার মধ্যে। কুয়ো থেকে কাল যে কাদা তুলেছিলাম তার মধ্যে পেয়েছি। কী জিনিস বটে?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নরহরি জানালেন, 'পেতলের চাকতি নকশা কাটা। দেখতে মন্দ নয়। যাত্রার পোশাকে লাগানো ছিল কিংবা কোনো শৌখিন পেতলের জিনিসে।'

তখন নরহরির মগজে খেলছে চিন্তার ঢেউ।

শ্রীপতির বাড়ি যেখানে ঠিক ওর পিছনেই ছিল রায়দের একটা কাছারি বাড়ি। মাটির বাড়ি, তবে শান বাঁধানো মেঝে। রায়বাবুরা ছিল এই অঞ্চলের জমিদার। মস্ত ধনী। চারপাশে গোটা এলাকা ছিল রায়দের সম্পত্তি। সেকালের বর্ধিষ্ণু গ্রাম এখন দিনে দিনে শহরের রূপ নিচ্ছে। রায় বংশের অবস্থা কিন্তু পড়ে গেছে। বসতবাড়ি জরাজীর্ণ অট্টালিকাটি এবং কিছু দেবোত্তর জমি ছাড়া জমিদারির কিছুই প্রায় আজ অবশিষ্ট নেই। জমিজমা পুকুর বাগান সব গেছে। খানিক গেছে বিক্রি হয়ে অভাবের তাড়নায়। বাকিটা হাতছাড়া হয়েছে সরকারের জমিদারি বিলোপ আইনের কবলে পড়ে। রায়বাবুরা অনেক জমি দিয়েছেন তাঁদের পুরনো কর্মচারীদের নামমাত্র মূল্যে বা বিনি পয়সায়। শ্রীপতির বাবা এইভাবেই পায় ওই জমি, প্রাচীন কুয়োটি সমেত। রায়বাড়ির নহবতখানায় সানাই বাজাত শ্রীপতির বাপ-ঠাকুর্দা। রায়দের সেই কাছারি বাড়ি আজ ধূলিসাৎ। শুধু বড়ো বড়ো কয়েকখানা ঘরের ভিতের চিহ্নটুকু এখনও দেখা যায়। ওই ইঁদারা লাগত কাছারি বাড়ির ব্যবহারে। এখন শ্রীপতির আশেপাশ আরও কয়েকজন ঘর তুলেছে। সবই কাঁচা বাড়ি। তাদের কেউ কেউ কুয়ো খুঁড়ে নিয়েছে। যারা পারেনি তারা অন্যদের কুয়ো থেকে জল নেয়। অন্তত খাবার জলটা।

বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলে বর্গী আক্রমণ হয়েছিল। তাছাড়া ডাকাতের উপদ্রব ছিল ভীষণ। সিপাই বিদ্রোহের সময় একদল সিপাই এসে লুটপাটও চালিয়েছিল রায়দের জমিদারিতে। এমনি কোনো দুর্যোগের সময় নিশ্চয় কেউ আততায়ীর হাত থেকে বাঁচাতে ওই ইঁদারায় ফেলে দেয় সঞ্চিত সোনাদানা। তারপর আর উদ্ধার করতে পারেনি। মারা পড়েছে যে ফেলেছিল। অন্যরা জানত না এ খবর। অথবা যা ফেলেছিল সবটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি পরে। এখনও কিছু রয়ে গেছে কুয়োর কাদায়। ঠিক কী থাকতে পারে? প্রাচীন আমলের সোনার মোহর। রুপোর টাকা। সোনার গিনি। সোনা-রুপোর বাট। সেকালের সব খাঁটি সোনা-রুপোয় তৈরি। ওঃ!!

চাকতিটা দেখতে দেখতে নিরাসক্ত ভাবে নরহরি বললেন, 'এটা দাও আমাকে। খাসা দেখতে। এতে একটা ফুটো করে আমার ছোটো নাতনিকে পুঁতির হারে লকেট বানিয়ে দেব। খুব খুশি হবে। শ্রীপতি হাতজোড় করে, 'মাপ করবেন সামন্তমশাই। আমার নাতনিটা ওটা দখল করে বসেছে। পুতুল খেলার টাকা বানিয়েছে। অনেক কষ্টে চেয়ে এনেছি আপনাকে দেখাব বলে। ফিরে না পেলে কেঁদেকেটে একশা করবে।'

—'বেশ বেশ, পয়সা দিচ্ছি, তোমার নাতনিকে অন্য কোনো খেলনা কিনে দাও।'

—'আজ্ঞে না' শ্রীপতি অনুনয় করে। 'বাপ মরা মেয়ে, বড্ড জেদি। যেটার ওপর ঝোঁক ওঠে ছাড়বে না কিছুতেই। ওকে না বলে দিতে পারব না। দেখি বুঝিয়েসুঝিয়ে অন্য খেলনার লোভটোভ দেখিয়ে যদি পাই। নইলে এই সামান্য জিনিসটা দিতে আমার বাধা কী? এটা কী কাজে লাগবে? তবে কিনা নাতনিকে আগে দিই ফেরত। তারপর বলে কয়ে ঠিক আদায় করব। আপনি চাইছেন। আপনার কথা কি ফেলতে পারি? তবে বুঝছেনই আমার অবস্থা?'

—'এরকম চাকতি আর পাওনি কাদায়?'

—'আজ্ঞে না। তবে খোঁজাও হয়নি তেমন। হঠাৎ এটা দেখে ফেললাম। ঠেকল হাতে। ওই নোংরা পাঁক ঘাঁটতে ভালো লাগে?'

এ বিষয়ে আর কৌতূহল দেখাতে সাহস হয় না নরহরির। যদি সন্দেহ করে? এত আগ্রহ কেন? অন্যের কাছে নিয়ে যাবে দেখাতে। আরও কিছু প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরছিল। কুয়োর কাদায় ঘটি বা ঘড়া-জাতীয় কিছু মিলেছে কি? কারণ এমনি গিনি সোনার মোহর রত্নপাথর কুয়োতে পুকুরে বা মাটির নীচে লুকিয়ে রাখার রেওয়াজ মুখ-বন্ধ ধাতু পাত্রে। খবরটা জানালে আরও নিশ্চিত হতেন গুপ্তধন সম্পর্কে। কিন্তু পাছে শ্রীপতির সন্দেহ জাগে সেই ভয়ে আর কথা বাড়ালেন না। উদার হাসি ফুটিয়ে বললেন নরহরি, 'বেশ বেশ চেষ্টা করো, যদি পাও। নাতনিকে বোলো ওকে একটা ভালো খেলনা দেব বদলে। এই নাও চাকতি।'

—'নিশ্চয় নিশ্চয়,' চাকতিটা পকেটে রেখে শ্রীপতি নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয় একটু অপ্রতিভ ভাবে।

শ্রীপতি চলে যেতে খানিক গুম হয়ে বসে থাকেন সামন্ত। ইস এমন দাঁওটা

কি হাতছাড়া হবে? তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে চকিতে উদয় হয় একটা মতলব। নাঃ, দেরি করলে ঠকবেন। আজই করা চাই।

পড়ন্ত বিকেল।

নিজের বাড়ির সামনে উঠোনে খাটিয়া পেতে বসে ছিল শ্রীপতি। ছোটো মাটির বাড়ি তাদের। বাড়ির চারপাশে কাঠা পাঁচেক জায়গা। বাড়ির হাল ভালো নয়। চালে খড় চাপানো দরকার। দেয়ালে ফাটল ধরেছে। এককোণে গোয়াল ঘর। একটি দুগ্ধবতী গাভী রয়েছে বটে তবে সে শ্রীপতির মতনই অনাহারে শীর্ণ।

লেপা উঠোন তকতক করছে। বাড়িটির জৌলুস নেই, তবে শ্রীহীন নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অতি প্রাচীন এক তেঁতুল গাছ বাড়ির গায়ে ছাতার মতো হয়ে দাঁড়িয়ে। ইঁদারাটা উঠোনের মাঝে। বাঁধানো উঁচু পাড়ের আস্তরণ খসে পড়েছে। বিরাট গোল মুখ। গভীরও খুব। দেখে বোঝা যায় এ কুয়ো বহুকালের। উঠোনের একধারে ঢিপি করে রাখা অনেকদিন পাঁক মাটি।

শ্রীপতির সংসারে পাঁচটি প্রাণী। শ্রীপতি, শ্রীপতির স্ত্রী, বিধবা পুত্রবধূ ও দুটি নাতি নাতনি। বছর চারেক আগে একমাত্র সন্তান জোয়ান ছেলেটা হঠাৎ মারা যাবার পর শ্রীপতির শরীর মন ভেঙেছে। অভাবে জড়িয়ে পড়ছে। কী করে যে সামলাই? উদাস মনে এইসব ভাবতে ভাবতে সহসা শ্রীপতি দেখে সামন্তমশাই তার উঠোনে ঢুকছেন। সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আজ্ঞে আসুন। বসুন।' সে খাটিয়াটা দেখিয়ে দেয়।

সামন্ত বসেন না। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'বুঝলে শ্রীপতি, পরে ভেবে দেখলেম তোমার সমস্যাটা। হাজার হোক তৃষ্ণার জল। এ বিপদ উদ্ধার করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। দেখি ইঁদারার কী অবস্থা?'

কুয়োর মুখে গিয়ে তিনি উঁকি মারলেন ভিতরে। তারপর পাঁকের ঢিবি দেখিয়ে বললেন, 'এই কাদা তুলেছ কাল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

নরহরি কুয়োর কাদা এক খাবলা তুলে ভালো করে দেখেন। তারপর মাটিটুকু ফেলে দিয়ে এসে বসলেন খাটিয়ায়। গভীর ভাবে চিন্তা করছেন কিছু।

ভ্যাবাচাকা শ্রীপতি সামনে খাড়া। আশায় নিরাশায় দুলছে তার মন। তার সমস্যা মেটাতে কী উপায় ভাবছেন সামন্ত?

—'দেখো শ্রীপতি,' গম্ভীর গলায় বললেন নরহরি, 'তোমায় নগদ ধার আমি

দেব না। জানি তোমার অভাবের সংসার। সুদ সমেত ধার শোধ করতে পারবে না হয়তো। বন্ধকি রাখতেও পারছ না। টাকাটা জলে যাবে আমার। আমি ব্যাবসাদার মানুষ। এমন ধারে কারবার করি না।'

—'আজ্ঞে ঠিক ধার শোধ করে দেব, কথা দিচ্চি', কাতর আবেদন জানায় শ্রীপতি।

—'বেশ, ধার শোধ না হয় করবে, বিশ্বাস করছি। তখন তৃষ্ণার জল মিললেও দুবেলা আহারের যে টান পড়বে তোমাদের। সেটাও কাজের কথা নয়। আমি অন্য উপায় একটা ভেবেছি।'

—'আজ্ঞে?'

নরহরি রহস্যময় হেসে বললেন, 'নগদ ধার তোমায় দেব না বটে, তবে তোমার কুয়োর পাঁক আমি তুলিয়ে দেব নিজের লোক দিয়ে। আর সেই পাঁক আমি নিয়ে যাব সমস্তটা। ধরে নাও ওই পাঁকের বদলে তোমার কুয়ো ঝালাই হয়ে যাবে নিখরচায়, বিনা ধারে।'

শ্রীপতি থ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আরও বুঝিয়ে বলেন নরহরি, 'এসব পুরনো ইঁদারা বা পুকুরের পাঁক বড়ো সারবান। জান তো আমার বাগানের শখ। ওই পাঁক মাটি শুকিয়ে নিলে চমৎকার সার হবে। ফল ফুল দু-রকম গাছেরই। হয়তো যা মাটি পাব তার তুলনায় আমার মজুর খরচা একটু বেশিই পড়বে। তা হোক, ব্যাবসায় লাভ লোকসান দুই-ই আছে। তবে বিনা বন্ধকে ধার দিলে আমার ব্যাবসায় নীতি লঙ্ঘন হয়। তার চেয়ে এই ভালো। কী, রাজি আছ আমার প্রস্তাবে? পাঁক কিন্তু যা ওঠাবে পুরোটা চাই। অবশ্য যত বেশি মাটি উঠবে ততই ভালো সাফ হবে কুয়োটা। নয় কি?' উত্তরের আশায় তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকেন নরহরি।

—'আজ্ঞে এ তো উত্তম প্রস্তাব,' শ্রীপতি কৃতার্থ হয়ে বলল, 'ও কাদা নিয়ে আমি করবটা কী? ওর বদলে যদি কুয়োটা সাফ করে দেন, বড়ো উপকার হয়। যা পাঁক মাটি উঠবে সব আপনি নিয়ে নেবেন।'

টোপ গিলেছে। উল্লাসে নেচে ওঠে নরহরির বুক। তবে বাইরে ভড়ংটা বজায় রেখে আধবোজা চোখে মুখে একটু হাসি টেনে বললেন, 'আহা, উপকারের কথা তুলছ কেন? এ হচ্ছে ব্যাবসার লেনদেন। তোমার পাঁক আমি কিনব। তবে পয়সার বদলে দেব মজুর খরচা।'

—'আজ্ঞে একটু চা খাবেন?' খুশি হয়ে অতিথি আপ্যায়ন করতে চায় শ্রীপতি।

—'চা? না থাক অসময়ে। হ্যাঁ, সেই চাকতিটা বাগাতে পারলে নাতনির থেকে?'

শ্রীপতি খানিক সরে এসে খুব চাপা গলায় বলল, 'সে এক কাণ্ড করেছি। হারিয়ে ফেলেছি ওটা।'

—'অ্যাঁ সে কী।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার ওখান থেকে ফিরে আটটা নাগাদ পুকুরে গেলুম নাইতে। ভাবলেম জামাটা খুব ময়লা হয়েছে, একটু সাবান বুলিয়ে কেচে দিই। মনটা খারাপ ছিল। খাবার জলের সমস্যা। ননীর ছেলের কথায় ব্যথা পেয়েছি। সেইসব ভাবতে ভাবতে আনমনে জলে জামা ধুয়েছি। চান করেছি। মনেই নাই যে পকেটে চাকতিটা রেখেছিলাম। বাড়ি ফিরে যখন খেয়াল হল দেখি চাকতি নেই। কত খুঁজলাম পুকুরে ঘাটে রাস্তায়। পেলুম না। কোথায় যে পড়ল? এখনো বলিনি নাতনিকে। জানলে যে কী অনর্থ করবে, দুশ্চিন্তায় আছি। দুপুরে বার দুই চেয়েছে। কোনোরকমে এড়িয়ে গেছি।'

হতভাগা! মনে মনে গর্জে ওঠেন নরহরি। আমাকেও দিল না। নিজের ভোগেও লাগল না। মূর্খটা জানলই না কী সম্পদ ফস্কে গেল। এসব অভাগাদের কপাল ফেরাবে কে?

—'তোমার নাতনি কই?' জিজ্ঞেস করেন নরহরি।

—'ঘরেই আছে। বলেন তো ডাকি। তবে দোহাই, আজ ওই চাকতির কথা তুলবেন না। এখুনি বায়না জুড়ে দেবে। কাল পরশু, রয়ে সয়ে বলব। পছন্দসই কিছু দিয়ে ভোলাতে হবে।'

—'থাক। ডাকতে হবে না।' জানালেন নরহরি। মনে ভাবলেন এ ভালোই হল। মোহরটা ঘরে থাকলে ফের কাউকে গিয়ে দেখাত। শ্রীপতি না হয় বোকাসোকা লোক। মোহর কেমন দেখতে ধারণা নেই। ওই বস্তুটি যে আসলে কী কল্পনাও করেনি। আর কেউ দেখলে ঠিক সন্দেহ করবে। যাচাই করবে। তখন কি আর শ্রীপতি তাকে এই কাদা ছুঁতে দিত? নিজেরাই তুলত মোহরের লোভে।

মোহরটা শ্রীপতির ঘরে থাকলে পরে হয়তো কোনোদিন ও টের পেত নরহরির প্যাঁচ। এই নিয়ে হাঙ্গামা হুজ্জুত করত। বখরা চাইত। অন্য লোকে ওকে মদত দিত। নরহরির শত্রুর অভাব নেই। দিনে দিনে তার যে ধনসম্পদ বাড়ছে, এ নিয়ে বদলোকের কম হিংসে? তবে অবশ্য ওই কুয়োর গুপ্তধন একবার নরহরির খপ্পরে গেলে কারও সাধ্যি নেই তা ফেরত নেয়। তবু খানিকটা ঝামেলা

হত বৈকি। এখন আর কেউ টের পাবে না। নরহরির একান্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন ছাড়া। লুকনো সোনাদানার লোভেই যে নরহরি কাদা কিনেছে এ প্রমাণও মিলবে না। নরহরি সামন্ত হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'তবে কালই আমার লোক পাঠিয়ে দেব। উঠি এখন।'

পরদিন সন্ধ্যাবেলা নরহরির পাঠানো চারজন মজুর হাজির হল শ্রীপতির কুয়োর মাটি তুলতে। তারপর শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ।

কপিকলে ঝোলানো মোটা দড়ি বেয়ে কুয়োর তলায় নেমে গেল দুজন লোক। সঙ্গে নিল কোদাল। দড়ি বেঁধে মস্ত একটা বালতি নামানো হল কুয়োয়। বালতি বালতি ভর্তি করা হচ্ছে কুয়োর পাঁক মাটিতে। অমনি ওপরের লোকেরা হড়হড় করে তা টেনে তুলছে। ঢেলে দিচ্ছে কুয়োর পাশে ভ্যান রিকশায় বসানো পিচের ড্রামে। দুটো ভ্যানে দুটো ড্রাম মজুত। একটা ড্রাম ভর্তি হলেই রিকশাচালক নরহরির বাড়িতে। ফিরে আসছে খালি ড্রাম নিয়ে। ততক্ষণে অন্য ড্রাম ভর্তি হচ্ছে কাদায়। ঘণ্টাখানেক টানা কাজের পর বিশ্রাম নিচ্ছে শ্রমিকরা।

এইভাবে গোটা দিন চলল কাজ। কখনো নরহরি, কখনো বা তাঁর বড়ো ছেলে বলহরি (যাকে লোকে ডাকে হরিবোল। বাপের চেয়েও নাকি সে বেশি পয়সা চেনে) নিজে দাঁড়িয়ে তদারকি করতে থাকে পাঁক তোলা।

কত বিচিত্র জিনিস উঠল কাদার সঙ্গে।

দুটো লোহার কপিকল। অনেক ছোটো বড়ো পিতল কাঁসার থালা বাটি। পাঁচটা নানান সাইজের টিনের বালতি। তিনটে তলোয়ার। বর্শার ফলক দুটো। একটা বন্দুকের নল। নানা সাইজের ছুরি অন্তত ডজন খানেক। ধাতুর জিনিস সবই জংধরা ক্ষয়ে যাওয়া, রং চটা— বহুকাল জলকাদায় থাকার ফলে। মাটি তোলার সময় যা হাতে লেগেছে তাই এসব। এছাড়াও আরও কত কী যে লুকিয়ে আছে ওই বিপুল পরিমাণ পাঁক-মাটির ভিতরে।

একটা মাঝারি আকারের পেতলের ঘড়াও উঠল। তাই দেখেই নেচে ওঠে নরহরির মন। বোধহয় ওই ঘড়াটায় পুরোই মোহর। মুখ খুলে যেতে মোহরগুলি ছড়িয়ে গেছে পাঁকে। ঘড়া পেয়ে গুপ্তধন প্রাপ্তির ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হলেন নরহরি।

পাড়ার লোক ভিড় করে দেখে এই আদ্যিকালের ইঁদারা সাফাই। দুষ্টু ছেলেরা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে চায় ওই কাদায়। কী কী আশ্চর্য জিনিস বেরোয়? বকাঝকা করে তাদের তাড়ায় নরহরি ও বলহরি।

শেষ বিকেলে কাজে ক্ষান্তি দিল মজুররা। তখন ইঁদারার পাঁক-মাটি সাফ। তলায় চাপা ঝরনার মুখগুলো খুলে যেতে কলকল করে জল বেরুতে শুরু করেছে। কুয়োর মধ্যে যারা কাজ করছিল শশব্যস্ত হয়ে উঠে এল।

সন্ধ্যার সময় নরহরি যখন দলবলসহ বিদায় নিলেন, তখন শ্রীপতির উঠোনে এক মুঠোও কুয়োর কাদা নেই। শুধু বাতাসে ভাসছে পচা পাঁকের বোঁটকা গন্ধ।

শ্রীপতির কুয়োর সমস্ত কাদা রাখা হয়েছিল সামন্ত বাড়ির বাগানের এক কোণে বাঁধানো চাতালে, ঢিবির পর ঢিবি করে।

নরহরি ভাবলেন, দুদিন এখানে শুকোক কাদা, দুর্গন্ধ কমুক, তারপর নিজে এবং দুই ছেলে মিলে খোঁজ করবেন কাদার স্তূপগুলি।

পরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ। বাড়ির দাওয়ায় বসে ছিল শ্রীপতি। এমন সময় বছর ত্রিশ বয়সি এক যুবক এল।

যুবকটি লম্বা ছিপছিপে সুশ্রী। গৌরবর্ণ। পরনে পাঞ্জাবি পাজামা, পায়ে চটি। ধারালো চোখে বুদ্ধির ছাপ। মুখে চাপা কৌতুক।

শ্রীপতি উঠে সাগ্রহে আহ্বান জানাল, 'আরে আনোয়ার ভাই, এসো এসো। তোমার কথাই ভাবছিলেম।'

আনোয়ার হোসেন স্থানীয় স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক। শ্রীপতির হাতের কাজ সানাই বাদনের সে ভক্ত। তার নিজের গানবাজনার শখ আছে। ভালো অভিনয়ও করে।

—'কী কুয়ো সাফাই হল?' বলতে বলতে আনোয়ার কুয়োর ভিতর ঝুঁকে দেখে।

—'হয়েছে ভাই। চার-পাঁচ হাত জল উঠেছে। সকালে চুন ফেলেছি। আশা করছি কাল ঘোলা জলটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এবার গ্রীষ্মে আর জলের ভাবনা থাকবে না। ওঃ, আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি। ভাবতেই পারিনি যে সত্যি সত্যি তুমি যা বলেছিলে—'

আনোয়ার হেসে বলল, 'শ্রীপতিদা তুমি বড়ো সরল মানুষ। ওই সমস্ত টাইপের লোকেদের চরিত্র বোঝ না। আন্দাজ করেছিলাম যে টোপটা গাঁথবে। যাক আমার মোহরটি এবার ফেরত দাও। না, হারিয়ে ফেলেছ?'

'না না, হারাবে কেন? দিচ্ছি।' শ্রীপতি ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢোকে। একটু বাদেই বেরিয়ে এসে হলুদরঙা সেই চাকতিটা দেয় আনোয়ারের হাতে।

মোহরটা নিয়ে দেখতে দেখতে আনোয়ার বলল, 'সাধে কি ঠকেছে নরহরি?

কাদার ভেতর কদিন রেখে মোহরটার কেমন চেহারা দিয়েছি। এবার সামন্তগুষ্টি পাঁক ঘেঁটে মরুক গুপ্তধনের খোঁজে।' মোহরটা সে প্যান্টের পকেটে রাখে।

—'ওই মোহর তুমি পেলে কোথায়?' শ্রীপতি কৌতূহল চাপতে পারে না। আনোয়ার বলল, 'এটি আমার বাড়ির জিনিস। পারিবারিক সম্পত্তি নানির থেকে চেয়ে নিয়েছি লুকিয়ে, একজনকে দেখাব বলে। আমার এক পূর্বপুরুষ নবাব দরবারে চাকরি করতেন মুর্শিদাবাদে। তাঁরই অর্জিত ধন। এমনি মোহর আরও কটা আছে। সিন্দুকে। এবার এটা ঘষেমেজে চকচকে করে ফেরত দিতে হবে নানিকে।'

—'আচ্ছা বুদ্ধি তোমার!' শ্রীপতি উচ্ছ্বসিত।

—'তা ওই ঠকবাজ সামন্তকে ধোঁকা দিতে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি খরচা করতে হয় বৈকি। আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছিলুম শ্রীপতিদা তোমাকে। তুমি না কেসটা কেঁচিয়ে দাও। অ্যাকটিংটুকু ঠিকমতো পারবে কিনা! তুমি যা ভালো মানুষ।'

—'হেঁ হেঁ', সলাজ হাসে শ্রীপতি। 'এককালে যাত্রায় অ্যাক্টো করেছি যে। সব কি ভুলে গেছি? শিখিয়ে পড়িয়ে দিলে এখনও পারি। তবে ভাই সামন্তমশায়ের বাজের মতন চাউনির সামনে আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল। কেবলই ভয় হচ্ছিল এই বুঝি ধরা পড়ে গেলুম। আর বেশি জেরা করলে হয়তো শেষ রক্ষে হত না।'

—'আনোয়ার চাচা!' ছয়-সাত বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে বাড়ি ঢুকেই ডাক দিল। তারপর ছুটে এসে আনোয়ারের হাত ধরে মিষ্টি রিনরিনে গলায় নালিশ জানাল, 'জান চাচা, দাদু আমায় একটা হলুদ টাকা দিয়েছিল খেলতে। কুয়োর কাদায় পেয়েছিল। তারপর আবার চেয়ে নিয়ে গিয়ে হারিয়ে দিয়েছে।'

'অ্যাঁ! সত্যি! খুব অন্যায়। দাদুর সঙ্গে তুমি আড়ি করে দাও। আর আমি কাল তোমায় অনেকগুলো টফি এনে দেব। একটাও দিয়ো না দাদুকে।' মেয়েটির একমাথা রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে আদর করে আনোয়ার হেসে বলল, 'চলি।'

যেতে যেতে সে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'শ্রীপতিদা আমার শর্তটা মনে রেখো। একটা চমৎকার ডিজাইনের পাটি বুনে দিতে হবে। আর সামনের পূর্ণিমায় সানাই শোনাতে হবে আমাদের ছাতে বসে।'

ঘেঁচুমামার কল্পতরু

ঘেঁচুমামার চিঠিটা পেয়ে নাড়ু বেশ ঘাবড়ে গেল। ঘেঁচুমামা লিখেছেন—
'স্নেহের নাড়ু,

কেমন আছিস? ভালোভাবে বি. এ. পাস করেছিস জেনে খুশি হলাম। ডিসেম্বরে বড়োদিনের ছুটিতে কলকাতায় আড্ডা না দিয়ে বরং এখানে কদিন ঘুরে যা। এ যুগের এক আশ্চর্যতম আবিষ্কারকে স্বচক্ষে দেখতে চাস তো দেরি না করে চলে আয়।

ইতি তোর
ঘেঁচুমামা

পুঃ এখানে মুরগি বেজায় সস্তা।

ঘেঁচুমামা হচ্ছেন নাড়ুর ছোটোমামা। ঘোর বদরাগী ও খামখেয়ালি ঘেঁচুমামাকে আত্মীয়স্বজন যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। ঘেঁচুমামার এই খাপছাড়া স্বভাবের জন্য দায়ী তার একটি নেশা— গবেষণা।

ঘেঁচুমামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাঁর কলকাতার বাড়ির একফালি জমিতে ও টবে তিনি নানান ফুলফলের গাছ লাগাতেন। নিত্য নতুন গবেষণা চালাতেন।

বাড়িতে লোকজন বেড়াতে আসা তিনি মোটে পছন্দ করতেন না। সঙ্গে ছোটো ছেলে-মেয়ে আনা তো রীতিমতো নিষিদ্ধ ছিল। তারা নাকি ঘেঁচুমামার রিসার্চ স্টেশনে (অর্থাৎ বাগানে) ঢুকে পড়ত। ফুল-ফল ছিঁড়ত। এরপর মাথা ঠান্ডা রেখে ভদ্রতা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত।

এই গাছপালা নিয়ে রিসার্চের নেশা তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। নাড়ু শুনেছে, মাত্র বারো বছর বয়সে গ্রামের বাড়িতে বুনো মানকচুর কুটকুটুনি দূর করা নিয়ে ঘেঁচুমামা একটা এক্সপেরিমেন্ট করেন। সেই কচুর একটা বন্ধু মেধোকে দেন।

বলেন, একদম কুটকুটে নয়, খেয়ে দেখিস। ওই কচু ভাতে খেয়ে মেধোর বাড়ির সবার গলা ধরে একাক্কার। ঘেঁচুমামার বাবার কাছে নালিশ করা হয়। পিটুনি খাওয়ার ভয়ে ঘেঁচুমামা পালিয়ে গিয়ে হাওড়ায় তাঁর মাসির বাড়িতে সাতদিন লুকিয়ে ছিলেন। তখনই মেধোর পিসিমা খেপে গিয়ে তাঁর নামকরণ করেন— বেচু পালটে ঘেঁচু; অতঃপর তাঁর এই ডাকনামটাই চালু হয়ে গেল।

ঘেঁচুমামার মাথা ছিল খুব সাফ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে উতরে গিয়ে তিনি কলকাতার একটা কলেজে অধ্যাপনা নিলেন। তবে গবেষণার নেশা কমল না, বরং বেড়েই চলল।

একবার তিনি কালীঘাটে নাড়ুদের বাড়িতে পাঁচ-ছটা কাঁচালঙ্কা পাঠান। সঙ্গে চিরকুটে লেখেন— সাবধান। লঙ্কাগুলো সাধারণ লঙ্কা থেকে একশো গুণ বেশি ঝাল। তাই পড়ে নাড়ুর বাড়ির সবাই খুব হাসাহাসি করল। তার থেকে মাত্র একটি লঙ্কা মাছের ঝোলে পড়েছিল। ব্যাস, সেই ঝোলমাখা ভাত এক গরাসের বেশি কেউ মুখে তুলতে পারেনি। বাপ রে, কী আগুন ঝাল!

'উদ্ভিদ সমাচার'-এ ঘেঁচুমামা মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন। সেইসব নিতান্ত মৌলিক গবেষণামূলক রচনার আবির্ভাবে বিজ্ঞানীমহলে দারুণ হৈ-চৈ পড়ে যেত। বিরূপ সমালোচনাই হত বেশি। ঠাট্টা-বিদ্রূপ কানে আসত। শেষটায় ঘেঁচুমামা সক্কলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় তুলেই দিয়েছিলেন। প্রবন্ধও আর লিখতেন না। এর কিছুদিন বাদে তিনি কলেজ ছাড়লেন। তারপর কলকাতাও।

কলেজে একঘেয়ে পাঠ্যপুস্তক পড়ানো। ঘেঁচুমামার নিতান্ত অপছন্দ ছিল। বরং তিনি ছাত্রদের উদ্ভিদবিজ্ঞানের নানা জটিল রহস্যের সুলুকসন্ধান দিয়ে তাদের মনে জ্ঞানপিপাসা জাগাবার চেষ্টা করতেন। ফলে পরীক্ষার কোর্স শেষ হত না এবং ফি বছরই এই নিয়ে অভিযোগ উঠত। তাছাড়া সহকর্মীদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে অষ্টপ্রহর তর্কযুদ্ধ লেগেই থাকত। বিরক্ত হয়ে ঘেঁচুমামা কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি গবেষণায় মন দিলেন।

কিন্তু কলকাতায় থেকে শান্তিতে গবেষণা করা তাঁর বেশিদিন পোষাল না। কারণ পাড়ার লোকের সঙ্গে বেজায় খটাখটি লেগে গেল।

ঘেঁচুমামা তাঁর গাছপালার স্বাস্থ্যবিধির খাতিরে সকাল-সন্ধ্যা তাদের রাগ-রাগিণী শোনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাগানে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজত। দৈনিক ভোরে ও সন্ধ্যায় কটা একই রেকর্ড শুনতে শুনতে পাশের বাড়ির লোকদের কান তো ঝালাপালা। এদিকে প্রতিবেশী-বাড়িতে দুপুরবেলা রেডিওতে

সজোরে আধুনিক বা ফিল্মি গান চালানো বরদাস্ত করতে পারতেন না ঘেঁচুমামা। ওতে নাকি তাঁর গাছেরা চমকে যায়। তাদের শান্তি নষ্ট হয়। ফলে ঝগড়া বাধল। এবং ঘেঁচুমামার বাগানে অদৃশ্য হস্তে ইট-পাটকেল, ডিমের খোলা, তরকারির খোসা ইত্যাদি নিক্ষিপ্ত হতে থাকল।

তখন 'দুত্তোর' বলে ঘেঁচুমামা কলকাতা ছাড়লেন। বিহারের দুমকায় নিরিবিলিতে অনেকখানি জায়গা-ঘেরা একটা বাড়ি নিয়ে শহরের বিষাক্ত পরিবেশ থেকে দূরে তিনি নিশ্চিন্তে গবেষণায় মন দিলেন।

এসব হল বছর পাঁচেক আগেকার কথা। এরপর ঘেঁচুমামার খবর পাওয়া যেত কদাচিৎ। তবে মাঝে-মধ্যে তিনি নাড়ুকে এক-আধটা উটকো চিঠি ছাড়তেন। চিরকালই তিনি ভাগনে নাড়ুকে কিঞ্চিৎ লাই দিয়ে এসেছেন। বোধকরি নাড়ু তাঁর যুগান্তকারী বক্তব্যগুলো ধৈর্য ধরে শুনত বলে। নাড়ু কিছু বুঝত না ছাই। স্রেফ কিছু প্রাপ্তির আশায় ঘণ্টাখানেক কষ্ট করে চোখ বড়ো বড়ো করে শোনা এবং তালমাফিক মাথা নেড়ে সায় দেওয়ার পরে মামার কাছে ফুচকা আলুকাবলি মায় সিনেমার পয়সার জন্য আবেদন করলেও মঞ্জুর হয়ে যেত।

আপাতত চিঠিটা পেয়ে কী করা যায় ভাবতে থাকে নাড়ু। যাওয়াই যাক। নাড়ু মাকে ধরল। চিঠির কথাটা গেল চেপে। বলল, 'ঘেঁচুমামার কাছ থেকে কদিন ঘুরে আসি। অনেকদিন দেখিনি। দুমকা জায়গাটা শুনেছি খাসা।'

মা নাড়ুর বাবাকে বলে অনুমতি আদায় করে দিলেন।

নাড়ুকে দেখে ঘেঁচুমামা খুশি হয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এলি তাহলে। বেশ বেশ। এখন খা দা, ফুর্তি কর।'

চারটে দিন কাটল। ঘেঁচুমামার সংসারে মাত্র দুটি প্রাণী। ঘেঁচুমামা এবং তাঁর পুরোনো কাজের লোক গঙ্গারাম। ঘেঁচুমামা দিব্যি গল্পগুজব করেন। নাড়ুকে নিয়ে বেড়িয়ে এলেন পাহাড়ে, মাঠে, নদীর ধারে। কিন্তু সেই আশ্চর্যতম আবিষ্কারের কথাটা আর তোলেন না। নাড়ু ছটফট করছে। শেষে বলেই ফেলল, 'মামা, তোমার সেই আবিষ্কারটা?'

—'হবে হবে। তাড়া কীসের? আচ্ছা বেশ কাল দেখাব,' বললেন ঘেঁচুমামা।

পরের দিন বিকেলে চা খেতে খেতে ঘেঁচুমামা রহস্যময় আলাপ শুরু করলেন। 'আচ্ছা নাড়ু, তোর নিশ্চয় বাগান করতে ভালো লাগে?'

কোনোদিন বাগান করার উৎসাহ না হলেও মামাকে খুশি করতে নাড়ু তক্ষুনি সায় দিল, 'হ্যাঁ লাগে।'

—'তোদের বাড়িতে তো একটুখানি জমি। বেশি গাছ লাগাবার উপায় নেই।'

—'হুঁ।'

—'সত্যি ভারী মুশকিল।'

—'কলকাতা শহরে কটা বাড়িতে আর অনেক গাছ লাগাবার জায়গা আছে?' ঘেঁচুমামার ভাবনার মানে বোঝে না নাড়ু।

—'আচ্ছা, তোর আম খেতে ভালো লাগে?' জানতে চাইলেন ঘেঁচুমামা।

—'ভীষণ।' নাড়ুর তৎক্ষণাৎ জবাব।

—'কিন্তু এখন আম পাবি কোথায়? কোল্ড-স্টোরেজে রাখা বাসি আম নয়। টাটকা, ফ্রেশ। চাইলেও পাবি না।' হতাশভাবে মাথা নাড়েন ঘেঁচুমামা।

নাড়ু বলল, 'তা চাইব কেন? এখন বুঝি আমের সময়? ও তো গ্রীষ্মের ফল।'

—'অর্থাৎ তোকে সেই গ্রীষ্মকাল অবধি হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে। কী সব বেআক্কেলে বন্দোবস্ত বল দেখি?'

নাড়ু বলল, 'বাঃ, তাই তো নিয়ম।'

—'নিয়মটা পালটাতে হবে,' ঘেঁচুমামা দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন, 'শোনা যায় পুরাকালে মুনি-ঋষিরা তপস্যার বলে কল্পতরু নামে একরকম গাছ তৈরি করতেন। সেই গাছের কাছে যখন যা প্রার্থনা করা যেত তখনই নাকি তাই পাওয়া যেত। তা কলিযুগে সেরকম তপস্যার জোর আর নেই। কল্পতরুও তাই আর মেলে না। তবে হ্যাঁ, এখন হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের কিছুটা ইচ্ছাপূরণ করা চলে। আর এই বিজ্ঞান সাধনার হিম্মতেই আধুনিক যুগ লাভ করবে ব্যাচারাম চাটুজ্যের আশ্চর্যতম আবিষ্কার— কলির কল্পতরু দ্য ওয়ান্ডার।'

—'সে আবার কী?' নাড়ুর প্রশ্ন।

—'আয় আমার সঙ্গে।' উঠলেন ঘেঁচুমামা।

ঘেঁচুমামা নাড়ুকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে ঢুকলেন। প্রায় বিঘে দুই জমিতে নানা ফল-ফুলের গাছ। উঁচু পাঁচিল ঘেরা। এই এলাকায় ঘোরা ঘেঁচুমামার অপছন্দ জেনে এতদিন বাগানে পা দেয়নি নাড়ু।

বাগানের একধারে অনেকটা জায়গা তারের জাল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে পাশাপাশি তিনটে গাছ। তারে ঘেরা অংশটায় ঢোকার জন্য কাঠের ফ্রেমে জাল আটকানো দরজা। দরজায় তালা দেওয়া। চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘেঁচুমামা ভিতরে ঢুকলেন— পিছনে পিছনে নাড়ু।

থামলেন ঘেঁচুমামা। গাছ-তিনটের দিকে আঙুল দেখিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'এই। এই এরা হচ্ছে কল্পতরু। এদের কাছে কড়া পাকের সন্দেশ বা টেস্ট-ক্রিকেটের সিজন টিকিট আবদার করলে অবিশ্যি পাবি না। তবে ইচ্ছেমতো নানান ফল যখন-তখন খেতে পাবি। দেখ। ভালো করে দেখ—'

দেখতে দেখতে নাড়ু থ। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। এগুলো আবার কী গাছ? একটা গাছেই এক-একটা ডাল এক-একরকম। তাতে আলাদা রকম পাতা— ফল।

প্রথম গাছটা প্রায় দেড়মানুষ উঁচু। তাতে ফলছে হরেক রকম লেবু। কোনো ডালে কমলা। কোনোটায় বাতাবি। কোনোটায় মোসাম্বি। কোনো ডালে বা পাতিলেবু।

পরের গাছটা অনেক বেঁটে। তাতে ফলেছে টমাটো। নানা জাতের লঙ্কা। আবার কয়েকটা বেগুনও ঝুলছে।

তৃতীয় গাছটা প্রথম গাছটা থেকে উঁচু। সেটায় গুঁড়ি থেকে বেরিয়েছে আম, আমড়া এবং কী এক অচেনা গাছের ডাল। ফল ধরেছে ডালে ডালে।

নাড়ুর মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

ঘেঁচুমামা বললেন, 'ঘাবড়ে গেছিস? লজ্জা কী? আমার কল্পতরু প্রথমে দেখলে অনেক বীরপুরুষেরই চক্কর লাগবে।'

'কী করে বানালেন।' নাড়ু গোল গোল চোখ করে জানতে চাইল।

'প্লাস্টিক সার্জারির কায়দা,' বললেন ঘেঁচুমামা, 'নানান গাছের দেহ-কোষ জোড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে এক-একটা যৌগিক বৃক্ষ— মানে এই কল্পতরু। ব্যাপারটা জটিল। এত চট করে তোর মাথায় ঢুকবে না। তাছাড়া যাকে-তাকে বলে ফেলবি। এখুনি সব ফাঁস হয়ে যাবে। আগে পেটেন্ট নিই। তারপর এই বিষয়ে একখানা বই লিখব সোজা ভাষায়। তখনো পড়ে নিস। মোটকথা এখন থেকে আর আলাদা আলাদা গাছ লাগাবার ঝামেলা থাকবে না। প্রত্যেকটা গাছের জন্যে আলাদা আলাদা জমি, আলাদা তদবিরের দরকার নেই। বি. আর. চাটুজ্যের ফর্মুলা— ১০১ অ্যাপ্লাই করে যে যার পছন্দমতো হরেক রকম ফল একই গাছে ফলাতে পারবি। জমি বাঁচবে। সময় বাঁচবে। তাছাড়া ফলনের সময়গুলোও ইচ্ছেমতো পালটে দেব। গ্রীষ্মে আম তো এমনিই পাই। তখন বাজার থেকে আম কিনে খাওয়া যায়। আমার কল্পতরু ফলাবে শীতকালে আম। ওই দেখ।'

তৃতীয় গাছটার দিকে আঙুল দেখালেন ঘেঁচুমামা। 'আর এই লেবুগাছটা

দেখছিস? সব শীতে ফলবে। কমলা না হয় শীতের ফল। মোসম্বি, বাতাবি শীতে ফলাতে পারবি? আর-একটা কল্পতরু লাগিয়েছি, সব কটা লেবু গ্রীষ্মে ফলবে। তখন গরমকালে কমলা পাবি একেবারে টাটকা গাছপাকা। আবার কিছু-কিছু ফল বারবার খেতে পাবি। সাধারণত বছরে হয়তো একবার ফলে। আমার কল্পতরুতে ফলবে বছরে দুবার, তিনবার।

'তা বলে কি বাপু একই গাছে যা ইচ্ছে একসঙ্গে চাইলে পাবি? তা হয় না। মোটামুটি মিল আছে এমন সব গাছের মিশ্রণে এক-একটা কল্পতরু তৈরি সম্ভব। এই যেমন আপাতত তিনটে বানিয়েছি। কল্পতরু নাম্বার— ওয়ান, টু অ্যান্ড থ্রি। আরও কত কল্পতরু আবিষ্কার হবে। শুধু ফলের নয়, ফুলের, সবজির। যে-সব উদ্ভিদের মধ্যে এখনও মিশ খাওয়াতে পারিনি, পরে হয়তো পারব। আমি না পারলে তুই পারবি।'

—'আমি!' নাড়ু আঁতকে ওঠে।

—'হ্যাঁ। মানে তুই না হলেও অন্য কেউ। মানে যারা এই লাইনে রিসার্চ করবে আর আমাকে গুরুদেব বলে পেন্নাম ঠুকবে। হুঁ, এইবার দেখিয়ে দেব উদ্ভিদবিজ্ঞানের রথী-মহারথীদের ব্যাচারাম চাটুজ্যের দৌড় কদ্দূর। বুঝলি?'

ফূর্তির চোটে নাড়ুর কাঁধে ফটাস করে এক চাপড় কষিয়ে ঘেঁচুমামা বললেন, 'চ, এখন একটু বেড়িয়ে আসি। তাহলে রাতে খিদেটা বেশ চাগবে।'

রাতে খেতে বসে ঘেঁচুমামা দুহাত ছড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'নাড়ু, আজ তোর জীবনে এক মহৎ দিন। জেনে রাখ, তুই হচ্ছিস প্রথম মানব যে আমার কল্পতরু ফল টেস্ট করার সৌভাগ্য অর্জন করবে। এ গ্রেট গ্রেট অনার। তোর নাম ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে। গঙ্গারাম—'

অমনি গঙ্গারাম খাবার টেবিলে এনে সাজিয়ে রাখতে লাগল, রুটি মাংস টমাটো-স্যালাড, পুডিং এবং অনেক রকম ফল।

নাড়ু একখানা মুরগির ঠ্যাং তুলে কামড়ে দিতেই ঘেঁচুমামা বাধা দিলেন, 'ও-সব তো রোজই গিলছিস, আগে স্যালাড খা। টমাটোটা চাখ। কল্পতরু প্রোডাক্ট।'

টমাটো খেতে নাড়ুর ভালো লাগে না তাই এড়িয়ে যাচ্ছিল। নেহাত মামার কথায় বাধ্য হয়ে এক টুকরো মুখে পুরেই সে আর্তনাদ করে উঠল।

—'কী হল?' ঘেঁচুমামা ব্যস্ত হয়ে বললেন।

—'উরিব্বাস, কী ঝাল!'

—'ঝাল!' ঘেঁচুমামা অবাক। 'গঙ্গারাম কী ব্যাপার! স্যালাডে এত ঝাল কেন?'

—'আমি তো বাবু মাত্তর আধাখানা লঙ্কা কুঁচিয়ে দিইচি। ঝাল হবে কেন?' গঙ্গারাম ভেবে পায় না।

—'মামা, এ নিশ্চয়ই তোমার সেই স্পেশাল ব্রান্ড। সেই একশো গুণ ঝাল লঙ্কা,' নাড়ু বাতলায়।

—'না না, সে লঙ্কা দিই নাই। সে লঙ্কা আলাদা করা আছে।' গঙ্গারাম প্রতিবাদ জানায়।

'নিশ্চয়ই ভুল করে মিশিয়ে দিয়েছে,' ঘেঁচুমামা হুংকার ছাড়েন, 'দিন-দিন তোমার ভীমরতি হচ্ছে। ঠিক আছে নাড়ু, তুই বরং আমটা টেস্ট কর। মিষ্টি আম। জিভের জ্বলুনি কমবে।'

এক চাকলা আম মুখে দিয়েই নাড়ু মুখ ভেটকাল— 'এঃ, কী বিশ্রী খেতে।'

—'সে কী! ভালো জাতের ল্যাংড়া।'

ঘেঁচুমামা নিজে এক চাকলা আম তুলে কামড় দিয়ে নাড়ুর মতোই মুখ করলেন।

—'কেমন যেন আমড়ার টেস্ট, তাই না?'

—'এ কোথাকার ল্যাংড়া?' বলল নাড়ু।

—'আমড়া?' হুম।' ঘেঁচুমামা গম্ভীর।

কিছু ছাড়ানো কমলালেবু ছিল প্লেটে। তাই থেকে এক কোয়া মুখে ফেলেই থু-থু করে উঠল নাড়ু।— 'ইশ, কী টক!'

—'টক!'

—'হ্যাঁ, যেন পাতিলেবুর মতন।'

—'দেখি।' ঘেঁচুমামা নিজে এক কোয়া কমলা খেয়েই থু করে ফেলে দিলেন। বললেন, 'এই কমলা তো টক হবার নয়। আমার বাগানে আগেও ফলিয়েছি। চমৎকার মিষ্টি। কী ব্যাপার?' ঘেঁচুমামা থই পান না।

নাড়ুর মাথায় একটা আইডিয়া এল। সে এক টুকরো পাতিলেবু তুলে চুষে বলল, 'বাঃ, এতে যে কমলালেবুর টেস্ট।' তারপর সে একটা কাঁচালঙ্কা তুলে সাবধানে দাঁতে কেটে বলল, 'এঃ, কেমন টমাটোর মতো। দেখো খেয়ে।'

ঘেঁচুমামা লেবু ও লঙ্কা চেখে মাথা ঝাঁকালেন। 'হুঁ ঠিক।'

—'আমার কী মনে হচ্ছে জানো?' বলল নাড়ু।

—'কী?'

—'মানে, স্বাদগুলো বোধহয় ওলটপালট হয়ে গেছে।'

—'হুঁ, তাই। কিন্তু আমার এতদিনকার সাধনা? ওঃ সব গেল। ভেবেছিলাম কালই চিঠি ছাড়ব। ডেকে পাঠাব কয়েকজন সায়ান্টিস্ট আর কাগজের রিপোর্টারকে। দেখাব আমার আবিষ্কার। তাদের টেস্ট করাব আমার কল্পতরু প্রোডাক্ট। সব যে গুবলেট হয়ে গেল। ওফ!'

—'তাতে কী, এও তো দারুণ আবিষ্কার। নতুন রকম টেস্ট। বলা যায় নতুন ফল আবিষ্কার।' নাড়ু সান্ত্বনা দেয়।

—'না না, ওসব নতুন-ফতুন বোঝে না লোকে। সবাই তো আর তোর মতন নয়। জানিস, একবার একটা নতুন সবজি বানিয়েছিলাম। আলু আর বেগুন মিশিয়ে। ভাবলাম, লোকে আলু-বেগুন ভাতে খেতে ভালোবাসে। তা এই একটাতেই কাজ চলবে। কষ্ট করে আর আলাদা আলাদা সিদ্ধ করে মাখতে হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চলল না। আমার আলুবেগুন কোনো বেটার মুখে রুচল না। গঙ্গারামটা অবধি রিফিউজ করল। নাঃ, আবার আমায় নতুন করে ভাবতে হবে। রিসার্চ করতে হবে! স্বাদগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে।'

ঘেঁচুমামা হাঁড়িপানা মুখ করে উঠে গেলেন।

এরপর ঘেঁচুমামার ওখানে আর জমল না। ঘেঁচুমামার গল্পগুজব বন্ধ। সারাদিন তিনি ল্যাবরেটরিতে বা বাগানে কাটান। নিজের মনে পায়চারি করেন। বিড়বিড় করে বকেন। খাবার টেবিলে একসঙ্গে বসলেও আনমনা। দুদিন একা-একা এদিক-সেদিক ঘুরে কাটিয়ে নাড়ু বাড়ি ফিরে গেল।

প্রায় আড়াই বছর বাদে ঘেঁচুমামার চিঠি পেল নাড়ু। লিখেছেন— 'তোর সব কটা চিঠিই পেয়েছি। উত্তর দেবার সময় পাইনি। এক্সপেরিমেন্ট চলছে। দুটো নতুন কল্পতরু লাগিয়েছি। তাদের প্রথম ফলনটায় সামান্য গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কমলার টেস্ট বাতাবি লেবুর মতো আর টমাটোগুলো কেমন বেগুন-বেগুন খেতে হয়েছিল। কিন্তু এবার লঙ্কাগুলোয় এক্কেবারে খাঁটি লঙ্কার ঝাল। আর আমে আমড়ার স্বাদও অনেকখানি কমেছে। উপায় ভেবে ফেলেছি। খুঁতগুলো শুধরে ফেলব। আশা করছি শিগগিরি শিওর সাকসেস। তারপর গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন। এক্সপেরিমেন্ট সফল হলেই খবর দেব। পত্রপাঠ চলে আসিস।'

এরপর বহুদিন কেটে গেছে। ঘেঁচুমামার কাছ থেকে নাড়ু কিন্তু আর কোনো চিঠি পায়নি।

বটুকবাবুর ছুরি

চোরাবাজার থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোডে এসে দাঁড়ালেন বটুকবাবু। মাঝে মাঝে অফিস-ফেরতা তিনি এই বাজারে এসে ঢুঁ মেরে যান। এখানে বেশির ভাগই সেকেন্ড-হ্যান্ড জিনিস, কাজেই নতুনের চেয়ে দাম কম। অনেক সময় রীতিমতো সস্তাই মেলে। বটুকবাবু চোরাবাজারে এসে টুকিটাকি জিনিস দেখেন। কেনাকাটি করেন কদাচিৎ, তবে দাম-টামগুলো ধারণা করে রাখেন। ভবিষ্যতে সুবিধে হলে কেনা যাবে!

আজ কিন্তু সত্যি একটা জিনিস কেনার ইচ্ছে ছিল। একটা ছুরি। একখানা ছুরি ছিল তাঁর; বহু বছর ব্যবহারে ক্ষীণ হয়ে গতকাল সেটি একখণ্ড শক্ত পিচবোর্ড কাটতে গিয়ে দেহরক্ষা করেছে। একেবারে মাঝখান থেকে দু-আধখানা।

কয়েকটা ছুরি দরদস্তুর করলেন বটুকবাবু; কিন্তু কেনা হয়ে উঠল না শেষপর্যন্ত। যেটা পছন্দ হল, দামে পোষাল না। আর কম দামি জিনিস যা দেখলেন তা মনে হল টিকবে না বেশিদিন।

বড়োরাস্তার ফুটপাথ বেয়ে বটুকবাবু অল্প কিছুদূর এগিয়েছেন এমন সময় কে একজন খাটো গলায় তাঁর খুব কাছ থেকে ডেকে বলল, ‘ছুরি নেবেন স্যার? ভালো ছুরি আছে।’

বটুকবাবু চমকে তাকালেন।

বছর ষোলো-সতেরোর একটা ছেলে। পরনে নীল রঙের হাল-ফ্যাসানি ফুলপ্যান্ট এবং চকরা-বকরা হাওয়াই শার্ট। শার্টের অর্ধেক বোতাম খোলা। পায়ে রবারের চপ্পল, চুলে বাহারের টেরি। শীর্ণ মুখে পানের ছোপ ধরা একসারি এবড়োখেবড়ো দাঁত বের করে ধূর্ত হাসল ছেলেটা।

একদম বখাটে টাইপ। ছোকরা পকেটমার গোছের কিছু হওয়া আশ্চর্য নয়। বটুকবাবু আড়ষ্ট হয়ে থতমত খেয়ে আওড়ালেন, 'হ্যাঁ মানে ছুরি... একটা... আছে ছুরি?'

ছেলেটা আরও কাছে ঘেঁষে এল। সে দুহাত জোড়া করে বটুকবাবুর বুকের কাছে তুলল এবং প্রায় ম্যাজিকের মতো তার হাতের চেটোর মধ্যে আবির্ভূত হল একখানা ছুরি। সে তার দেহ নিয়ে ছুরিটা আড়াল করে দাঁড়াল, যাতে চলমান পথচারীর কৌতূহলী দৃষ্টি সেটা সহজে না দেখতে পায়! তারপর নীচু গলায় বলল, 'দারুণ চাকু স্যার। দেখুন—'

ছুরিখানা একনজরে দেখেই বটুকবাবুর ধারণা হল— চমৎকার জিনিস। অন্তত ছয় ইঞ্চির বেশি লম্বা ফলাটা চকচকে করছে। পিতলের চওড়া হাতল। এ বস্তুর ঢের দাম তবু জিজ্ঞেস করলে, 'কত?'

—'দশ টাকা।'

ছেলেটা ইতিমধ্যে মুঠোর ভিতর দিয়ে ছুরি লুকিয়ে ফেলেছে। কেমন সন্ত্রস্তভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক চাইছে।

দশ টাকা দেওয়ায় সংগতি নেই বটুকবাবুর, কিন্তু এ ছুরির দাম ওর চেয়ে খুব কমবে বলে মনে হয় না। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'নাঃ, থাক।'

—'কত দেবেন?' অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল ছেলেটা। যেন তার ভারি গরজ, ছুরিখানা বিদায় করতে পারলে সে বাঁচে।

বটুকবাবু দুম করে বলে বসলেন, 'দুই।'

ছেলেটা হাঁ হয়ে গেল। বলল, 'সে কী? জিনিসটা দেখুন, বাজারে কী দাম হবে জানেন?'

—'না ভাই, পারব না।'

ছেলেটা হতাশভাবে বলল, 'আচ্ছা আর দু-টাকা দিন।'

—'আর একটা টাকা দিতে পারি। তার বেশি নয়।'

—'তাই দিন।'

বটুকবাবু পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করামাত্র ছেলেটা ছোঁ মেরে নিয়ে তাঁর হাতে ছুরিটা গুঁজে দিল।

বটুকবাবু কেমন দ্বিধায় পড়লেন। এত সস্তায় দিয়ে দিল— জিনিসটা সত্যি ভালো তো? না ভুল করলাম? আমতা আমতা করে বললেন, 'ছুরিটা ভালো হবে তো? বেশ কাটা-টাটা যাবে তো? টিকবে তো?'

ছেলেটি যাবার জন্য মুখ ঘুরিয়েছিল, এবার সে ফিরে দাঁড়াল। তার মুখে বাঁকা হাসি। সে চাপা স্বরে বলল, 'জরুর কাটা যাবে স্যার। কার হাতের চাকু জানেন?'

কথাটা বলে সে এক বিচিত্র ভঙ্গি করল এবং পরক্ষণেই ঘুরে দ্রুত মিলিয়ে গেল ভিড়ের মাঝে।

বটুকবাবু কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কী বোঝাতে চাইল ছেলেটা? যাকগে ভেবে লাভ নেই। ছুরিখানা পকেটে ফেলে তিনি তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলেন।

অনেকখানি হেঁটে খানিক বাসে চড়ে, অবশেষে বটুকবাবু যখন কালীঘাটে তাঁর বাসায় পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা নেমেছে।

একটা প্রকাণ্ড পুরানো আমলের ইট-বের-করা বাড়ি। একগাদা ভাড়াটে, পায়রার খোপের মতো টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে আছে। নীচের তলায় একটা দরজায় তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন বটুকবাবু। সুইচ টিপতে একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বলে উঠল।

খুপরি ঘর। দেয়াল ও ছাদের জায়গায় জায়গায় পলস্তরা খসে পড়েছে। ঘরে একখানা তক্তপোশ, একটা টেবিল, একটা টুল ও একটি আলনা, ব্যাস শুধু এই আসবাব। বেশি কিছুর জায়গাও নেই। ঘরের কোণে ট্রাঙ্ক ও বাক্স, আর কয়েকটি বাসনপত্র।

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস ওরফে বটুকবাবু একা থাকেন। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। বিয়ে থা করেননি, কিন্তু দায়দায়িত্ব আছে। মেদিনীপুর জেলার গ্রামে তাঁর দেশের বাড়িতে থাকেন বিধবা দিদি তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে। তাদের ভার বটুকবাবুর, মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়। বৌবাজারে এক সওদাগরি অফিসে সামান্য মাইনের চাকরি করেন তিনি, গোবেচারি ভালোমানুষ লোক, কারো সাতে পাঁচে নেই। গোলমাল হাঙ্গামা দেখলে সভয়ে এড়িয়ে চলেন। অফিস করে ফিরে সোজা নিজের কুঠুরিতে ঢোকেন। পারতপক্ষে বের হন না।

তবে মাঝে মাঝে অফিস থেকে বাসায় ফিরতে দেরি হয়। বটুকবাবু বই বাঁধাইয়ের কাজ জানেন। অফিসের ফেরত কোনো কোনো দিন চলে যান এক দপ্তরির কাছে। সেখানে বই বাঁধাই করেন। কোনোদিন তাঁর সাহায্য দরকার হলে দপ্তরিই খবর পাঠায়। দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার হয়। অবসর সময়ে ঘরে অর্ডার নিয়ে বইখাতা বাঁধান।

এমনি বটুকবাবুর জীবন একঘেয়ে। খুবই টেনেটুনে চালান। বেশি পয়সা খরচ করে কোনো ফুর্তি করা বা শখ মেটানোর ক্ষমতা তাঁর নেই।

কিন্তু মানুষটি কল্পনাবিলাসী।

বাইরে যখন সূর্য অস্ত যায়, নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে হরেক রকম কল্পনা করেন, যা করতে সাধ হয় কিন্তু সাধ্য নেই। সুখের বিষয় এর জন্য পয়সা লাগে না। কেবল মনের রুদ্ধ দ্বারগুলি খুলে দাও। নাগালের বাইরে জগতের কত অজানা দেশ, অজানা অদেখা মানুষজন দৃশ্যকল্পনার রঙে বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠে। কল্পনায় কত আমোদ। কত আনন্দের স্বাদ নেয় মন। প্রাণটা হালকা হয়ে যায়। রঙিন হয়ে ওঠে। দিনগত একঘেয়েমি থেকে খানিক মুক্তি পায়।

একটি পুরনো গাইডবুক আছে বটুকবাবুর।

ভারতের দর্শনীয় স্থানগুলির বিবরণ আছে তাতে। সময় পেলে তিনি বইখানি পড়েন। ওই অপূর্ব জায়গাগুলিতে কী ভাবে যাবেন? কী কী দেখবেন? কোথায় কোন ধর্মশালা বা হোটেলে থাকা যায়— ইত্যাদি সম্বন্ধে যা যা লেখা আছে— সব তাঁর মুখস্থ! প্রতিবার পুজোর সময় ভাবেন— এবছর আর হয়ে উঠল না। সামনের বছর সুবিধে হলে বেরিয়ে পড়ব। অন্তত একটিবার ঘুরে আসব। আবার নিভৃতে এও জানেন, সামনের বছর কেন, কোনোকালেই হয়তো তাঁর বেড়ানোর সাধ মিটবে না! এই কলকাতা শহরেই কাটাতে হবে বছরের পর বছর। বড়ো জোর দু-চার বছর অন্তর একবার কয়েকদিনের জন্য দেশে যাওয়া। ব্যাস।

বটুকবাবুর দেশের বাড়িখানা বিশাল। অট্টালিকা বলা চলে। তবে এখন জরাজীর্ণ। বহু শরিকে ভাগ হয়ে গেছে। মাত্র দুটি পরিবার ছাড়া এখন আর কেউ থাকে না ও বাড়িতে। ঠাকুর্দার আমল অবধি বটুকবাবুদের অবস্থা ভালো ছিল। তারপর পড়ে যায়।

দেশের বাড়িতে একটা ভারি সুন্দর মোমবাতিদান পেয়েছিলেন বটুকবাবু। ঠাকুমার সিন্দুকে ছিল। নকশাকাটা কুচকুচে কালো কাঠের স্ট্যান্ড। তার মাথায় বিলিতি কাচের ঘেরাটোপ। কলকাতায় ঘরের তাকে সাজিয়ে রেখেছেন জিনিসটি। মোমবাতিটিও লাগিয়ে রেখেছেন। তবে সে মোম জ্বালেন না কখনো। ইলেকট্রিক আলো না থাকলে বরং লণ্ঠন ব্যবহার করেন।

মোমবাতিদানটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পূর্বপুরুষের কত বিচিত্র বিলাস, ঐশ্বর্যগরিমা কল্পনায় ভাসে। বটুকবাবু শুনেছেন, তাঁর বাবার এক ঠাকুরদা ছিলেন

দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। তিনি নাকি ডাকাতিও করতেন লুকিয়ে লুকিয়ে। ওই দুর্দান্ত পুরুষটির রক্তধারা কি আমার ধমনীতে বইছে? ভেবে তিনি রোমাঞ্চিত হন। আবার হাসিও পায়।

বটুকবাবু একবার একটা চমৎকার সেকেন্ডহ্যান্ড ফাউন্টেন পেন কিনেছিলেন। একেবারে জলের দরে। পেনটা হাতে নিয়ে ভাবতে বসেন— কে ব্যবহার করত এই কলম? হয়তো কোনো সাহিত্যিক। কী লিখেছেন এটা দিয়ে? কেমন দেখতে ছিলেন? বরাত মন্দ! পেনটা কয়েকদিন বাদেই পিকপকেট হয়ে যায়।

বাঁধাইয়ের জন্যে যেসব বই আসে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার বা ঐতিহাসিক কাহিনি থাকলে বটুকবাবু তা পড়ে ফেলেন। কল্পনার খোরাক জোটে।

বটুকবাবু বাইরের ধুতি শার্ট গেঞ্জি ছেড়ে লুঙ্গি পরলেন। হাত মুখ ধুলেন। উনুন ধরিয়ে বারান্দার কোণে রান্নাঘরে ভাত চাপালেন। তারপর শোবার ঘরেতে এসে পিচবোর্ড, কাগজ, আঠা, ছুঁচ সুতো ইত্যাদি বাঁধাইয়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে মেঝেতে বসলেন। এইবার তিনি কেনা ছুরিটা হাতে নিয়ে মন দিয়ে দেখতে বসলেন।

নাঃ, ঠকিনি। অতি উত্তম জিনিস। খুব মজবুত ইস্পাতে তৈরি। ছুরির একটা খাপ বানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু এ বস্তু যেন বটুকবাবুর হাতে মানায় না।

ছুরিখানা কার ছিল? ছেলেটা অমনভাবে বলল কেন— কার হাতের চাকু জানেন? কে ছিল এর ভূতপূর্ব মালিক? ছুরি না বলে একে বরং ছোরা বলাই উচিত।

ছোরা! শব্দটি উচ্চারণ করতেই এর ভূতপূর্ব মালিকের চেহারা নিয়ে একটা কল্পনা দানা বাঁধে। সে চেহারা, সে মুখ নিষ্ঠুর। যেখানে যত গুণ্ডা বা খুনি জাতীয় লোক দেখেছেন বটুকবাবু বা শুনেছেন যাদের কথা— যারা অনায়াসে ছোরা-ছুরি চালায়— তাদের মূর্তি একের পরে এক মনে ভেসে ওঠে। আর সব কজনকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা নৃশংস বীভৎস রূপ খাড়া করার চেষ্টা করেন।

এ ছুরিতে কি মানুষের রক্ত লেগেছে কখনো? বোধ হয় লেগেছে। বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই লেগেছে। হয়তো বারবার।

মানুষের ভিতরকার আদিম পশুটা যখন লোভে উন্মত্ত হয়ে আক্রমণ করেছে অন্য মানুষকে— এই ছুরি ছিল তার হাতিয়ার। হয়তো বটুকবাবুর মতো অনেক নিরীহ লোককে আঘাত করেছে এই ছুরি। আবার হয়তো গুণ্ডাদের নিজেদের মধ্যে হানাহানির সময় তপ্ত নররক্তের স্পর্শ পেয়েছে এই শাণিত ইস্পাত ফলা!

ভাবতে ভাবতে গরম হয়ে উঠল বটুকবাবুর শরীর। ডানহাতের পাঁচ আঙুলে শক্ত করে চেপে ধরলেন ছুরির বাঁটটা। বোধহয় এমনিভাবেই বাগিয়ে ধরা হত ছুরিখানা! আর অমনি করে— ঝুঁকে হাত চালালেন বটুকবাবু।

খ্যাঁচ।

সামনে একটা প্যাকিং বাক্স ছিল। শিশি বোতল কৌটো কাঠের টুকরো— এমনি টুকিটাকিতে ঠাসা। বটুকবাবুর ছুরি বাক্সের পাতলা কাঠের গায়ে আমূল বিঁধে গেল। ফের হ্যাঁচকা টানে খুলে এল ছুরি।

বাঃ। নিজের তৎপরতায় অবাক হয়ে গেলেন বটুকবাবু। এখনও এত তাড়াতাড়ি হাত চালাতে পারি। ফলাটায় কী ভীষণ ধার! কিন্তু ফুটো হয়ে গেল যে বাক্স? ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। তীব্র চোখে তিনি খুঁজতে থাকেন অন্য কোনো নিশানার সন্ধান।

হঠাৎ বটুকবাবুর মনে হল, মুঠোর মধ্যে ছুরিটা যেন নড়েচড়ে উঠল। যেন এটা জীবন্ত বস্তু। বুঝি ওর ঘুম ভেঙেছে। অস্থির হয়ে উঠেছে।

তিনি শিউরে উঠে ছুরিটা ফেলে দিলেন। ঠং আওয়াজ তুলে সেটা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে মেঝেয়।

বটুকবাবু একটুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলেন ছুরিখানার দিকে। তারপর হেসে উঠলেন জোরে।

স্রেফ অতিরিক্ত কল্পনার ফল।

ওই জড় বস্তুটিতে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই, থাকতে পারে না। অসম্ভব।

ঝকঝকে ফলাটা কেমন অসহায়। যেন এক হিংস্র শ্বাপদ বন্দী হয়ে আছে।

মৃদু হেসে বিড়বিড় করে ছুরিটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন— 'ওহে, তোমার জারিজুরি খতম! আগের জীবন ভুলে যাও। এবার থেকে শুধু বোর্ড কাটো, কাগজ কাটো, আলু কাটো, বেগুন কাটো। ব্যাস, তার বেশি নয়।'

বটুকবাবু সত্যি সত্যি পিচবোর্ড কাটতে শুরু করলেন বইয়ের মলাটের জন্যে। কচকচ করে আলু কাটলেন কয়েকটা। তবে তিনি অনুভব করলেন ছুরিখানা হাতে নিলেই বেশ চনমনে লাগে। দেহে মনে কেমন উত্তেজনা ছড়ায়। অনেকক্ষণ ক্ষিপ্রগতিতে কাজ করলেন। কাজ মানে প্রধানত ছুরি দিয়ে এটা সেটা কাটাকাটি। অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে উঠে গিয়ে রান্নাটা সেরে নিলেন। রাত হয়ে যাচ্ছে। বটুকবাবু কাজ বন্ধ করলেন। তারপর খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন।

ছুরিটার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর ঘুম আসতে সময় নিল। পরদিন রাত প্রায় নটা। বটুকবাবু বাসায় ফিরছেন।

অফিসের পর গিয়েছিলেন দপ্তরির দোকানে। কিছু কাজ করেছেন। তাই ফিরতে দেরি হল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন। পাড়াটা ভালো নয়। কাছেই একটা বস্তি। সেখানে কিছু খারাপ ধরনের লোকের বাস। রাতে প্রায়ই বস্তিতে চেঁচামেচি হল্লার আওয়াজ ওঠে। ওখানকার গুণ্ডাদের জোরজুলুম সইতে হয় পাড়ার ভদ্র বাসিন্দাদের। ছিনতাইও হয় কখনো কখনো।

সরু রাস্তা। জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে। তার ওপর লোডশেডিং চলছে। চারিদিক অন্ধকার। কেবল মেঘে ঢাকা এক ফালি চাঁদের আবছা আলোয় সামান্য নজর চলে।

রাতে এমনিতেই লোক চলাচল কম। আজ একেবারে জনহীন। রাস্তার একপাশে কারখানা। তার লম্বা লম্বা টিনের শেড। অন্যদিকে উঁচু উঁচু বাড়ির খাড়া দেয়ালের সারি।

কারখানায় এখন ছুটি। অন্ধকার বাড়িগুলোয় কারো সাড়াশব্দ নেই। শুধু রেডিও-নিঃসৃত এক তীক্ষ্ণ গানের সুর ভেসে আসছে ওপরের কোনো জানালা দিয়ে।

বটুকবাবুর গা ছমছম করতে লাগল। পথটুকু পেরতে পারলে বাঁচি!

বহুদিনের চেনা রাস্তা। তবু সাবধানে পা টিপে টিপে হাঁটতে হচ্ছে। খোয়া-ওঠা পথে জল জমেছে জায়গায় জায়গায়। পা পড়লে মচকাবে।

এই রাস্তা সিধে গিয়ে এক আড়াআড়ি রাস্তায় মিশেছে। বটুকবাবু বাঁ ধারে ঘুরবেন। তেমাথার মোড়ে পৌঁছে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। কার চাপা আর্তস্বরে কথা কানে এল। কী ব্যাপার?

মোড়ের ঠিক মুখোমুখি, আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়ে একখণ্ড ফাঁকা জমি। রাস্তা ও জমির সীমানা দিয়ে গেছে একটা নোংরা জলের নালা। বটুকবাবু কারখানার পাঁচিলের গায়ে ঘেঁসে এলেন। একটু আড়ালে থাকা ভালো। তারপর উঁকি মেরে অন্ধকার ফুঁড়ে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেললেন।

রাস্তার ওপারে হাত পনেরো দূরে নালার ধারে দুটো ছায়ামূর্তি। চেনা যাচ্ছে না। কান খাড়া করলেন বটুকবাবু।

—'দোহাই বাবা, আমি গরিব মানুষ।'

—'চ্যাপ। দাও ব্যাগ। বের করো। এই তো'— কাতর কণ্ঠে যে কথা বলল তাকে চিনতে পারলেন বটুকবাবু। হারান ঘোষ। এই পাড়াতেই থাকেন। বাজারে আলাপ হয়েছিল। ভবানীপুরে এক কাপড়ের দোকানে কাজ করেন।

আর এই কর্কশ কণ্ঠের মালিককেও চিনতে ভুল হল না। ওর নাম ছক্কু। মানে লোকে ওই নামে ডাকে। লোকটা ষণ্ডা— ভয়ংকর স্বভাব। অনেক খুন জখমও নাকি করেছে। সবাই ওকে ভয় পায়। মাত্র মাসখানেক আগে এই ছক্কু বটুকবাবুর কাছ থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে নিয়েছিল। হুঁ, জোর করেই। অবশ্য মুখে বলেছিল ধার।

সন্ধে নাগাদ বাসায় ফিরছিলেন বটুকবাবু। বস্তির কাছে অতর্কিতে ছক্কু তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল— 'দেখি দাদু, আপনার মানিব্যাগটা।'

বটুকবাবু বাধ্য হয়ে ব্যাগ বের করে দিয়েছিলেন।

ব্যাগে পাঁচটি টাকাই মাত্র সম্বল ছিল। নোটখানা পকেটে পুরে গম্ভীর মেজাজে বলেছিল ছক্কু— 'ধার নিলুম। শোধ দিয়ে দেব। তবে একটু মনে করিয়ে দেবেন মশাই। নইলে ভুলে যাই। বড্ড ঝুটঝামেলায় ব্যস্ত থাকি কি না।'

ফলে বটুকবাবুকে মাসের শেষ সপ্তাহে স্রেফ ডাল ভাত খেয়ে কাটাতে হয়েছিল। তরকারি কেনার সামর্থ্য হয়নি।

ছক্কুর কাছে টাকা ফেরত চাইতে তাঁর সাহসে কুলোয়নি। চাইলেও দিত না নির্ঘাত। উল্টে ফ্যাসাদে পড়তেন।

—'বাঃ, এ যে অনেক টাকা। বহুত আচ্ছা।' ছক্কুর কণ্ঠে বিকট উল্লাস শোনা গেল।

—'সব নিয়ো না বাবা। আজ মাইনে পেয়েছি। ঘরে যাব। অনেক ছেলেপুলের সংসার।' অসহায় মিনতি জানালেন হরেনবাবু।

—'আঃ ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ধার নিচ্ছি। শোধ দিয়ে দেব। তবে একটু খেয়াল করিয়ে দেবেন।'

—'দোহাই বাবা—'

—'ফের কাঁদুনি। ঘড়িটা খুলে নিইনি তোর বাপের ভাগ্যি। আর এট্টা কতা বললে দেব নালায় চুবিয়ে! যা ভাগ।'

একটা ধাক্কা মারার আওয়াজ হল।

একটি ছায়া শরীর হোঁচট খেয়ে পড়ল মাটিতে।

কড়া সুরে ছক্কুর শাসানি শোনা গেল— 'খবরদার, থানায় রিপোর্ট করলে জানে মেরে দেব কিন্তু'—

হারানবাবুর খর্বকায় মূর্তি প্রায় দৌড়ে চলে গেল বটুকবাবুর সামনে দিয়ে। হয়তো আরও নির্যাতনের আশঙ্কায় পালিয়ে গেলেন।

বটুকবাবু রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছেন।

নিরীহ শান্তিপ্রিয় ভদ্রজনের এমন দৃশ্য চোখে দেখাও বিপদ। সাক্ষী হলে গুণ্ডার কোপে পড়ার সম্ভাবনা। মানে মানে সরে পড়াই কর্তব্য। অন্যদিন হলে তাই করতেন বটুকবাবু, নিঃশব্দে পিছিয়ে যেতেন গলির ভিতরে। অনেকখানি ঘুর হলেও অন্যপথে বাসায় ফিরতেন। কিন্তু আজ তিনি নড়তে পারলেন না।

বটুকবাবুর মনে আজ কিন্তু লেশমাত্র ভয় জাগেনি। বরং কী এক প্রচণ্ড উত্তেজনায় মাথায় যেন আগুন ছুটছে। বিস্ফারিত চক্ষু। নিজের অজান্তে কখন তিনি বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরেছেন নতুন ছুরির বাঁটটা। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছুরিটাও ছিল কাঁধের ঝুলিতে।

হরেনবাবু চলে যাওয়ার পর ছক্কু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়।

ফস করে জ্বলে উঠল একটা দেশলাইকাঠি।

ছক্কু সিগারেট ধরাচ্ছে।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পটভূমিতে সেই ক্ষুদ্র আলোকশিখা অতি উজ্জ্বল দেখাল। আগুনের আভায় স্পষ্ট হয়ে উঠল ছক্কুর রুক্ষ কঠিন মুখের খানিকটা। তার কোঁচকানো তামাটে গাল, মোটা গোঁফ, পুরু ঠোঁটের মাঝে লাগানো সিগারেট। আর দেখা গেল তার লালরঙা গেঞ্জির বুক ও পেটের খানিক অংশ।

সহসা বটুকবাবুর মুঠোর মধ্যে ছুরিখানা মোচড় খেয়ে ছটফট করে উঠল। তাঁর সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। দুরন্ত রাগ ও ঘৃণায় যেন চৌচির হয়ে গেল হৃৎপিণ্ড।

চকিতে তিনি গুঁড়ি মেরে অল্প নীচু হলেন। সঙ্গে তাঁর ছুরিকাবদ্ধ ডানহাত বেরিয়ে এল ঝুলির ভেতরে। হাতটা উঁচু হল। পিছনে হেলল। এবং পরমুহূর্তে আকর্ণটানা ছিলা থেকে তীর যেমন আকর্ষণমুক্ত হওয়া মাত্র ছিটকে এগোয় তেমনি লাফ দিল সম্মুখে—

তীরের মতো সাঁ করে উড়ে গেল ছুরিখানা।

হেঁচকি তোলার মতো একবার আওয়াজ হল এবং জ্বলন্ত দেশলাইকাঠিটা হঠাৎ ছক্কুর হাত ফসকে পড়তে পড়তে গেল নিভে।

ছক্কুর দীর্ঘ ছায়া শরীর কুঁকড়ে গেল। এলোমেলো ভাবে কয়েক পা ফেলে হেঁটে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মিশে গেল পথের আঁধারে।

কিছু অস্পষ্ট আওয়াজ। ব্যাস, তারপর সব নিস্তব্ধ।

থরথর করে কাঁপছেন বটুকবাবু। কী যে ঘটল ঠাহর করতে পারছেন না। সমস্ত তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝি স্বপ্ন, অলীক। আচ্ছন্নের মতো তিনি পা চালালেন।

বটুকবাবু টলতে টলতে ঘরে ঢুকলেন। কোনোরকমে ঘামে ভেজা জামাটা টেনে হিঁচড়ে খুলে ছুড়ে দিলেন আলনায়। রাতে ফিরতে দেরি হলে রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করেন না। মুড়ি-টুড়ি যাহোক খেয়ে নেন। আজ কিন্তু খেতে রুচি হল না। দারুণ অবসাদ ও ক্লান্তিতে তখুনি মূর্ছিতের মতো লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়।

মুখে রোদ্দুরের তাত লেগে বটুকবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানলা দিয়ে বেশ রোদ আসছে। বেশ বেলা হয়ে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানায়।

উঃ! মাথাটা যেন পাথরের মতো ভারী। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। ডান কাঁধ টনটন করছে ব্যথায় আর গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। গলা শুকিয়ে কাঠ। হাতড়ে হাতড়ে খাটের পাশে কুঁজো থেকে গড়িয়ে একগ্লাস জল খেয়ে আবার তিনি শুয়ে পড়লেন। এমনকী গত রাত থেকে ঠায়-জ্বলা ঘরের বাল্‌বটা নেবানোর শক্তিও পেলেন না।

এরপর তিনদিন তিনরাত কোথা দিয়ে যে কেটে গেল বটুকবাবু ভালো করে টের পেলেন না। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী শ্যামবাবু কখন তাঁর ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকেছেন— জ্বর দেখে ডাক্তার ডেকে এনেছেন— ওষুধ এনে দিয়েছেন— শ্যামবাবুর স্ত্রী তাঁর সেবাযত্ন করেছেন— কিছুই প্রায় খেয়াল নেই।

চতুর্থ দিনে বটুকবাবুর জ্বর ছাড়ল।

সকালবেলা তিনি ধীরে ধীরে কলতলায় গেছেন, আর একজন ভাড়াটে বিষ্টুবাবু সেখানে দাঁতন করছিলেন। বটুকবাবুকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন— 'কী দাদা জ্বরে পড়েছিলেন? এখন কেমন?'

—'ভালো। জ্বর ছেড়েছে।'

—'হুঁ, বেশ কাহিল দেখাচ্ছে।'

বিষ্টুবাবু কাছে সরে এলেন। সতর্ক চোখে চারপাশ দেখে নিয়ে ফিসফিস করে, 'মশাই শুনেছেন কাণ্ড?'

—'কী?'

—'সেই যে গুন্ডা, ছক্কু খুন হয়ে গেছে। আপনি জ্বরে পড়লেন— সেই রাতে।'

—'কে মারল?' বটুকবাবু অবাক ভাবে বললেন।

—'কে জানে। ছুরি মেরেছিল। নালার ভিতর পড়েছিল মুখ থুবড়ে। সকালে আবিষ্কার হল। পুলিশ এসে নিয়ে গেল বডি। এক্কেবারে ডেড। পাড়ায় খুব হৈ চৈ। কে মেরেছে ধরা পড়েনি। ওই আর কি! আর কোনো গুন্ডার কীর্তি। বেটারা এইভাবেই মরে। উঃ, বাঁচলুম মশাই! আপদ গেছে!'

—'ছক্কু লোকটা আস্ত শয়তান। আমার পাঁচ টাকা কেড়ে নিয়েছিল ও মাসে। লোকটাকে কবে জানি দেখলাম? খুব শিগগিরি।' বটুকবাবু ভাবতে চেষ্টা করেন।

নাঃ, মনে পড়ছে না। রগের কাছে টিপটিপ করে ওঠে।

যাকগে। যত্ত সব গুন্ডা বদমাইশ। মরেছে ঠিক হয়েছে। বটুকবাবু ছক্কুর চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

দিন চারেক বাদে কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বাঁধাইয়ের কাজ করতে গিয়ে নতুন কেনা ছুরিটার খোঁজ পেলেন না বটুকবাবু। ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। নেই। দপ্তরির কাছে খোঁজ করলেন। সেখানেও নেই।

দপ্তরি বলল, 'হ্যাঁ, সেদিন একখানা নতুন ছুরি এনেছিলেন বটে, কিন্তু এখানে তো ফেলে যাননি।'

ইস, অমন খাসা ছুরিখানা হারাল বুঝি? দপ্তরির দোকান থেকে বেরিয়ে আর কোথাও গিয়েছিলাম কি? কোথায় যে ফেললাম?

বটুকবাবু কিছুতেই তা মনে করতে পারলেন না।

শারদীয়া ১৩৮৭

বেটুদার ফেয়ারওয়েল

নভেম্বর মাসের শেষাশেষি।

বেটুদা বুধবার অফিস থেকে ফিরলেন। প্যান্ট-শার্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরে, হাত মুখ ধুয়ে, চা জলখাবার খেলেন। তারপর শোয়ার ঘরের খাটের নীচ থেকে খবরের কাগজে জড়ানো ক্রিকেট বুট দুটো টেনে বের করলেন।

এখনও বলতে আসেনি কেউ, তবে কানে এসেছে সামনের রোববার খেলা। বলবে ঠিকই। যদি খেলতেই হয়— সীজন-এর প্রথম ম্যাচ— একটু ফিটফাট হয়ে মাঠে নামা উচিত।

মিনিট পনেরো বাদে বেটুদার স্ত্রী মিনু বউদি শোয়ার ঘরে ঢুকে দেখলেন, মেঝেতে উবু হয়ে বসে বেটুদা। তাঁর বাঁ হাতে একখানা ক্রিকেট বুট। ডান হাতে ভেজা ন্যাকড়া। সামনের বাটিতে চকখড়ি গোলা। একমনে বুটে রং লাগাচ্ছেন।

বউদি থমকে দাঁড়ালেন। বললেন— 'কী ব্যাপার?'

বেটুদা একটু থতমত খেয়ে মুখ তুলে বোকা বোকা হেসে বললেন, 'না মানে বড্ড ময়লা হয়েছিল।'

—'বুঝেচি। এ বছরও আবার। গেল বছর না শপথ করলে, আর নয় এই শেষ।'

—'না না এখানে আসেনি কেউ ইনফর্ম করতে। আমি কোনো কথাই দিইনি।'

—'দেবার জন্যে তো তৈরি হয়ে বসে আছ। ডাকলেই ছুটবে। ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব'— দুম দুম করে মেঝে কাঁপিয়ে বউদি সরবে বেরিয়ে গেলেন।

মনটা খিঁচড়ে গেল বেটুদার। ডান পায়ের বুটের ভোঁতা নাকটা সবে মাত্র

কলি ফিরিয়ে ধবধবে হয়েছে। 'ধুত্‌তেরি'— বুট দুটো ছুড়ে দিলেন খাটের তলায়। খড়ি-গোলা জল দিলেন ফেলে। তারপর বারান্দায় গিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন চেয়ারে।

মিনু বউদির দোষ নেই। এর আগে পর পর দু-বছর প্রতিজ্ঞা করেও বেটুদা কথা রাখেন নি। এটা থার্ড ইয়ার। দু-দুবছর সীজন শেষে বেটুদা বাড়িতে ঘোষণা করেছেন— ব্যাস আর নয়। এবার রিটায়ার করব। কিন্তু ফের পরের শীতে খেলতে নেমেছেন।

বেটুদা ক্রিকেট পাগল। ক্রিকেট খেলতে ডাকলে আর থাকতে পারেন না। তেমন উঁচু দরের খেলোয়াড় হতে পারেন নি। নিজের স্কুল এবং কলেজের হয়ে খেলেছিলেন ক্রিকেট। কিছুদিন ময়দানে ঘোরফেরা করেছিলেন বড়ো টিমে খেলবার আশায়। সুবিধে হয় নি। একটা ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবে খেলেছিলেন বটে দুবছর। তবে সীজন-এর অর্ধেকই বসিয়ে রাখত। সে এক যন্ত্রণা। অতঃপর উচ্চাশা ত্যাগ করে সাউথ-ক্যালকাটায় নিজের পাড়ার ক্লাব ইয়াং বেঙ্গল স্পোর্টিং-য়েই বরাবর খেলে আসছেন। ইয়াং-বেঙ্গল খেলে সেকেন্ড ডিভিশনে।

বড়ো প্লেয়ার হতে না পারার জন্য বেটুদার দুঃখ নেই। ক্রিকেট খেলেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু না, এবার একটা ফাইনাল ডিসিশন নিতেই হবে।

বেটুদার বয়স চৌত্রিশ বছর। সেটা ব্যাপারই নয়। বডি পারফেক্টলি ফিট। গত বছরেও বেশ ভালো ফর্মে খেলেছেন। আসল ঝঞ্ঝাট বেধেছে সংসার নিয়ে। বাড়িতে তিনি একা পুরুষ। আর আছে— স্ত্রী, মা এবং চার বছরের ছেলে বিল্টু। বিয়ে হয়েছে সাত বছর। প্রথম প্রথম মিনু বউদি বেটুদার এই ক্রিকেট প্রীতি মেনে নিলেও ক্রমেই বেঁকে বসেছেন। কারণ ক্রিকেট সীজন পড়লেই ডিসেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল অবধি বেটুদাকে ছুটির দিনে কোনো কাজে পাওয়া যায় না।

বেটুদার ক্রিকেট নিয়ে বাড়িতে অভিযোগ সবারই। মিনু বউদি বলেন— 'শীত বসন্তই হচ্ছে বেড়াবার টাইম। শ্যামবাজার, মানিকতলা, সল্টলেক, বজবজ, সুখচর, বদ্যিবাটি ধারে ধারে আমাদের কত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব। কোথাও আমার যাওয়া হয় না। কি না মশায়ের ব্যাট-বল খেলা আছে। নেহাত ওরা যদি কেউ নিয়ে যায় দয়া করে। এই ভিড়ের বাসে ট্রেনে কি আমি একা একা ছেলে নিয়ে যাওয়া আসা করতে পারি!

'গত বছর ডিসেম্বরে তোমার মামাতো ভাই শিবুর বিয়ে হল। দিন ফেলল

রোববার। যাতে আত্মীয়রা সবাই সকাল সকাল আসতে পারে। আর তুমি কি না খেলা সেরে আমাদের নিয়ে হাজির হলে সন্ধে ছটায়। লজ্জার এক শেষ। আমোদটাই মাটি হল।

'শীতকালে ছুটির দিনে মার্কেট গিয়ে একটু দেখে শুনে কেনাকাটা করার উপায় নেই। কে নিয়ে যাবে?'

বিল্টুর অভিযোগ— গত শীতে বাবলু খুব চিড়িয়াখানা দেখেছে। গোটা দিন ধরে। ওর বাবা মা নিয়ে গেছিল। আর আমায় কেউ নিয়ে যাচ্ছে না। বাবাকে এত করে ধরলাম, কিছুতেই নিয়ে গেল না। বলল, পরের শীতে ঠিক নিয়ে যাব।

পর পর দুবছর ধরে মা বলছেন— জয়দেব কেঁদুলির মেলা দেখতে যাব পৌষ সংক্রান্তিতে। সংক্রান্তির দিন অজয় নদীতে স্নান ভারি পুণ্য কাজ। কী চমৎকার বাউল গান হয় মেলায়। বোলপুরে উঠব রাজুদার বাড়িতে। ওরা বারবার লিখছে আসতে। ওরাই দেখবার ঘোরবার সব ব্যবস্থা করে দেবে। বক্রেশ্বরে গরম জলের কুণ্ডে চান করব। আমার বাতের ব্যথার উপকার হবে। তুই শুধু আমায় পৌঁছে দিয়ে আয়— পরের হপ্তায় নিয়ে আসবি।

কিন্তু ওই সময় ক্রিকেটের ফুল-সিজন। ছুটির দিনে ম্যাচ। অন্যদিন সকালে জোর নেট প্র্যাকটিস। সময় কই? বেটুদা তাই এড়িয়ে গেছেন— 'এবার নয় পরের বছর।'

মা আক্ষেপ করেন, 'আর আমার যাওয়া হয়েছে।'

বেটুদা মানেন যে তিনজনের অভিযোগই খাঁটি। আত্মীয়স্বজন, শ্বশুরবাড়ির লোক, দূরের বন্ধুবান্ধব বিরক্ত। ডিসেম্বর টু মার্চ-এপ্রিল বেটুদার পাত্তা পাওয়া যায় না ছুটির দিনে এলে— নিজে যাওয়া তো দূরে থাক। মনকে শক্ত করলেন বেটুদা। বুট জোড়া দিয়ে দেব তপনকে। ছেলেটা খাসা ব্যাট করে। ফিউচার আছে। বুট কিনতে পারে না। ফুটো কেডস পরে খেলে। তবে কাউন্টি-ক্যাপটা রেখে দেব। হয়তো একদিন বিল্টু পরে মাঠে নামবে। বিল্টুকে নিজে হাতে ধরে খেলা শেখাব— এমনি কত কী ভাবনা আসে? হঠাৎ হাঁক শোনা গেল— 'বেটুদা! ও বেটুদা! বেটুদা আছেন?' শার্টটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে বেটুদা সদর দরজা খুলে বললেন, 'ও হাবুল?'

হাবুল তড়বড়িয়ে বলল, 'বেটুদা রোববার খেলা। বান্ধব সংঘের সঙ্গে। মন্টুদা বলে পাঠাল। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। বান্ধবের গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে নটায়। আপনি ঠিক যাবেন।'

বেটুদা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন, 'না রে পারব না। বলে দিস।'

'না না, খেলতেই হবে। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বলে লাইটলি নেবেন না, মন্টুদা বলেছে। পরের হপ্তা থেকে লিগ ম্যাচ শুরু। আর ম্যাচ প্র্যাকটিসের সুযোগ নেই। তাছাড়া বান্ধব গতবার আমাদের হারিয়েছিল। এবার বদলা চাই।' হাবুল বোঝায়।

গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে আবার মাথা দোলায় বেটুদা, 'না রে, লিগ, ফ্রেন্ডলি কোনো ম্যাচই আর খেলব না। মন্টুকে বলে দিস, আমি রিটায়ার করছি।'

হাবুল থ হয়ে খানিক চেয়ে থেকে বলল, 'সেকী! কেন?'

—'অসুবিধা হচ্ছে। বাড়িতে কাজ থাকে ছুটির দিনে।'

—'কী কাজ?' হাবুলের বাড়িতে গাদা লোক। সে দেখে, বাবা কাকারা ছুটির দিনে বাইরে থাকলেই বাড়ির মেয়েরা খুশি। কারণ ঘরে থাকলেই বারবার চা এবং নানান ফরমাস।

কী কী কাজের জন্য অসুবিধা তার লিস্ট দিতে যাচ্ছিলেন বেটুদা, হঠাৎ খেয়াল হল স্ত্রী হয়তো পাশের ঘরে কান খাড়া করে আছে। তাই সামলে নিয়ে বললেন, 'সে অনেক কাজ। আমি একা। মন্টুকে বলে দিস।'

হাবুল চলে গেল। দশ মিনিটের মধ্যে এল ক্যাপ্টেন মন্টু স্বয়ং— 'বেটুদা, কী ব্যাপার? খেলবেন না কেন?' বেটুদা বললেন, 'ভাই, রিটায়ার করলাম। অনেকদিন তো খেলছি।'

—'তবে যে দুদিন নেট প্র্যাকটিস করলেন?'

বেটুদা লুকিয়ে দুদিন নেট প্র্যাকটিস করেছেন অন্যের কেডস ধার করে। বাড়িতে জানে না। চট করে ঘরের দিকে একটা সন্ত্রস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেটুদা বললেন, 'ও এমনি। বডি ফিট রাখতে। এবার নতুনদের চান্স করে দিই। সিনিয়াররা সরে দাঁড়াই।'

মন্টু কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত স্বরে বলল, 'নতুনরা নিজের জোরে চান্স পেতে হয় পাবে। আপনি ক্লাবের কথাটা একটু ভাবুন। আচ্ছা হাবুল বলছিল, আপনার বাড়ির কাজে কী সব অসুবিধা হচ্ছে?'

—'হ্যাঁ। কাজটাজ আছে। গোটা ক্রিকেট সিজনে ছুটির দিনগুলো বরবাদ হয়ে যায়।'

—'কী কাজ?'

—'সে অনেক। তোমরা বুঝবে না।'

মন্টু সত্যিই বোঝে না, সে এখনও বিয়ে-থা করেনি। ঝাড়া হাত পা। চাকরি

বাদে বাকি সময়টুকু খেলা নিয়েই মেতে থাকে। মন্টু বোঝায়, 'কেসটা আর একবার কনসিডার করুন বেটুদা।'

বেটুদা মাথা নাড়েন— 'নাঃ।'

হতাশ হয়ে চলে যায় মন্টু। পাছে ফের কেউ অনুরোধ জানাতে আসে, সেই ভয়ে বেটুদা বাজারের থলি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বাজার সেরে ফেরার পথে গলির মোড়ে বেটুদাকে ধরলেন শ্যামানন্দবাবু। শ্যামানন্দবাবু ওরফে শ্যামবাবু ইয়াং বেঙ্গলের ক্রিকেট সেক্রেটারি। নিজের বাড়ির বাইরে ব্লকে তিনি ওৎ পেতে বসেছিলেন।

শ্যামবাবু মানুষটি ছোটোখাটো শুকনো চেহারা। অন্য সময় ধুতি পাঞ্জাবি পরলেও ম্যাচের দিন মাঠে গেলে ক্রিকেটের মর্যাদা রাখতে ধারণ করেন ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট, শার্ট, একটা ছাইরঙা কোট এবং পায়ে কালো বুট জুতো। সব কটি জিনিসই আদ্যিকালের। ভদ্রলোক হাতে-কলমে ক্রিকেট কদ্দূর খেলেছেন বলা মুশকিল। তবে ক্রিকেট জগতের সমস্ত খবর তাঁর কণ্ঠস্থ। তারই জোরে ক্লাবের ক্রিকেট সেক্রেটারিরর পোস্টটা প্রায় একচেটিয়া করে রেখেছেন। শ্যামবাবু বললেন, 'এই যে বেটু কী শুনছি, তুমি নাকি খেলা ছেড়ে দিচ্ছ?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকদিন তো দেখলাম।'

—'তোমার বয়স কত হে?' শ্যামবাবু চোখ পাকান।

—'আজ্ঞে চৌত্রিশ পুরেছি।'

—'ওনলি থার্টিফোর। জ্যাক হবস-এর নাম শুনেছ? ইংল্যান্ডের ফেমাস ক্রিকেটার। হবস কদ্দিন অবধি টেস্ট খেলেছিলেন জান? আটচল্লিশ। আপ টু ফর্টিএইট ইয়ারস।'

বেটুদা মাথা চুলকান।

শ্যামাপদবাবু বললেন, 'মন্টু কী সব বলছিল। তোমার নাকি বাড়ির কাজে ডিফিকাল্টি হচ্চে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। গোটা সিজন, একটাও ছুটির দিনে সময় দিতে পারি না। বাড়িতে কত কাজ থাকে।'

'তাই নিয়ম,' দার্শনিক ভাবে ঘোষণা করলেন শ্যামবাবু 'দশের কাজ করলে ঘরের কাজে একটু টান পড়েই। এই আমাকেই দেখো না। ক্রিকেট সেক্রেটারি, দুগ্গা পুজো আর রবীন্দ্রজয়ন্তী কমিটির মেম্বার— এত সব সামলাতে গিয়ে ঘরের কাজে কি আর অবহেলা হয় না? খুব হয়। উপায় কী? পাবলিক ডিমান্ড।'

বেটুদা ভাবলেন, শ্যামবাবুর বিপুলকায়া গৃহিণী সংসার সামলাতে একাই যথেষ্ট। চাকরি ছাড়া শ্যামবাবুর সংসারে আর কী কাজ? তবে মুখে বললেন, 'তা বটে। কিন্তু—'

—'আর একবার দেখো ভেবে। এ সেকেন্ড থট।'

—'আজ্ঞে মাপ করবেন। আমি স্থির করে ফেলেছি।' বেটুদা দৃঢ়চিত্ত।

বেটুদা বৃহস্পতিবার অফিস গেলেন। বাড়ি ফিরলেন। পাড়ায় ঢুকে ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন না। চা-টা খেয়ে খবরের কাগজখানা নিয়ে বসলেন। সকালে সময় পাননি ভালো করে পড়ার। প্রথম পৃষ্ঠাটা সবে শুরু করেছেন, বাইরে ডাক শোনা গেল— 'বেটুদা আছেন?'

মন্টুর গলা। গম্ভীর মুখে বেটুদা দরজা খুললেন।

মন্টু ভজা এবং আরও দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে।

মন্টু বলল, 'বেটুদা, আমাদের কেসটা কিছু ভাবলেন?'

বেটুদা ঘাড় নাড়লেন, 'বলেছি তো ভাই, আর খেলব না।'

—'তাই হবে,' হাতের চেটো উল্টে হতাশ ভাবে বলল মন্টু, 'কিন্তু এই রোববার আপনাকে খেলতেই হবে। মানে ওটা হবে আপনার ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। আমরা অ্যারেঞ্জ করছি।'

—'না না, ওসব কী দরকার?' বেটুদা আপত্তি তোলেন।

—'কে বলল দরকার নেই? আলবৎ দরকার আছে,' ভজা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আপনি অ্যাদ্দিন সার্ভিস দিলেন আর ক্লাব আপনার জন্যে এটুকু করবে না? আমরা সেক্রেটারি শ্যামবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। উনি খুব এনকারেজ করেছেন। এই একটু সামান্য ঘটা। আমাদের সাধ্যমতো।'

মন্টু বলল, 'বান্ধবকে জানিয়ে দিয়েছি অকেশনটা। লাঞ্চটা যেন স্পেশাল দেয়। এবার ওদের লাঞ্চ দেওয়ার কথা। বাকি অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের।'

বেটুদা অভিভূত হয়ে বললেন, 'বেশ তাই হবে। তোমরা বলছ যখন?'

মন্টুর দল ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। বেটুদা ক্রিকেট বুট জোড়া টেনে বের করে সযত্নে খড়ি লাগাতে বসলেন। শুক্র শনি নেটে যাবেন। একটু তৈরি হয়ে নামা ভালো। হাজার হোক ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। যা তা খেললে মান থাকবে না। গলা তুলে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে জানালেন, 'বলে গেল রবিবার খেলতেই হবে। সেদিন আমার ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। ব্যাস, দি এন্ড।'

ওপক্ষ থেকে কোনো সাড়াশব্দ এল না।

বেটুদা পাড়ায় বিশেষ ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। শুক্র শনি পাড়ায় বেরতেই নানান সম্ভাষণ জোটে—

—'বেটুদা আপনি নাকি রিটায়ার করছেন? সত্যি এখনো কিন্তু ফাস্টক্লাস ফর্মে ছিলেন।'

'কী হে বেটু, এবার নাকি খেলা ছাড়ছ? তা অনেক দিন চালালে বটে। ক্রেডিট আছে।'

পাড়ার গদাইদা আর বেটুদা সমবয়সি। একই সঙ্গে ক্রিকেট শুরু করেছিলেন। কিন্তু গদাইদা খেলা ছেড়েছেন পাঁচ বছর আগে।

দেখা হতেই গদাইদা বললেন, 'কনগ্রাচুলেশন বেটু। এ ওয়াইজ ডিসিশন। ঠিক সময় খেলা ছাড়া একটা মস্ত জাজমেন্ট। এই আমাকেই দেখো। এক্কেবারে কারেক্ট সময় রিটায়ার করেছি।'

ঘোড়ার ডিম করেছিস। মনে মনে ভাবলেন বেটুদা। ভুঁড়ি হয়ে গিছল। দৌড়তে পারতিস না। টিমে চান্স না পেয়ে বাধ্য হয়ে ছেড়েছিস। বেটার ভারি হিংসে। দেখা হলেই ফুট কাটত— 'কীরে বেটু আর কদ্দিন চালাবি, শিং ভেঙে বাছুরের দলে?' এখন খুব খুশি।

যাহোক মুখে একটু হাসি টেনে বেটুদা বললেন, 'মন্টুরা ছাড়ছিল না। কিন্তু বড্ড অসুবিধে হচ্ছে। বাড়িতে আমি একা। কত কাজ। ছুটির দিনগুলো নষ্ট হয়।'

—'কারেক্ট। আমরা এখন ফ্যামিলিম্যান। আমিও তো ঠিক এইজন্যেই ছাড়লুম।'

বেটুদা ভাবলেন, ফের গুল। বাড়িতে তুই কুটোটি নাড়িস না। স্রেফ খেয়ে ঘুমিয়ে দিন দিন মুটোচ্ছিস।

রবিবার। লেক মাঠে বান্ধব সংঘের গ্রাউন্ড। সকাল নটার মধ্যে দুইপক্ষই মাঠে হাজির। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটায় ম্যাচ শুরু হবে। দুদলই তিন ঘণ্টা করে ব্যাট করার সুযোগ পাবে। মাঝখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাঞ্চ ব্রেক। অবশ্য তিন ঘণ্টা ব্যাট করার আগেই কোনো দল অল ডাউন হয়ে গেলে অন্য দল ব্যাট করতে নামবে। ঠিক হয়েছে যাদের মোট রান বেশি হবে তারাই জিতবে।

মাঠে বেশ ভিড়। প্রচুর দর্শক। বেটুদার পাড়ার অনেকে এসেছে, বান্ধব সংঘেরও অনেক সভ্য। দুই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ইত্যাদির পদের কিছু গণমান্য ব্যক্তি উপস্থিত। সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। তার নীচে সারি সারি

ভাড়া-করা চেয়ার পাতা। একটা টেবিলও রয়েছে। তার ওপর একটা ঝকঝকে পিতলের ফুলদানি। এইখানেই খেলার পর ইয়াং বেঙ্গলের পক্ষ থেকে ফেয়ারওয়েল জানানো হবে বেটুদাকে। দু-চারটে বক্তৃতা হবে! একটা প্রেজেনটেশনও নাকি দেওয়া হবে। ভজা খুব খাটছে। সে নিজে তেমন খেলে-টেলে না। কিন্তু ইয়াং বেঙ্গলের সবচেয়ে উৎসাহী সভ্য। একটা হুজুগ পেলেই মেতে ওঠে।

ধোপদুরস্ত সাদা শার্টপ্যান্ট, ধবধবে বুট, নেভি-ব্লু ব্লেজার কোটে দারুণ স্মার্ট লাগছিল বেটুদাকে! ইয়াং বেঙ্গলের অন্য প্লেয়াররাও আজ যথাসাধ্য ফিটফাট। শ্যামবাবুর জুতোয় তিন বছর বাদে পালিশ পড়েছে। বান্ধব সংঘের কয়েকজন হ্যান্ডশেক করে গেল বেটুদার সঙ্গে।

বান্ধবের ক্যাপ্টেন অভয় দত্ত বলল, 'বেটুদা আমি ছবছর খেলছি আপনার এগেনস্টে। এরপর মিস করব আপনাকে।'

বান্ধবের ক্রিকেট সেক্রেটারি শিবদাস মুখুজ্যে বললেন, 'বেটুবাবু, ম্যাচ খেলা ছাড়ছেন বলে মাঠ ছাড়বেন না। বাচ্চাদের কোচিং-এর ভার নিন। আমি বলি খেলার চেয়েও সেটা বড়ো কাজ।'

বেটুদা হাসি হাসি মুখে সবার হাতে হাত মেলাচ্ছেন। সবার কথা শুনছেন।

আম্পায়ার দুজন মাঠে নামল, তারপর দুদলের দুই ক্যাপ্টেন। টস্ হল। বান্ধব টসে জিতে ব্যাটিং নিল। ইয়াং বেঙ্গলের ফিল্ডিং।

বোলিংয়ে বেটুদার বিশেষ সুনাম নেই। মোটামুটি অফস্পিন করতে পারেন। তবে লেংথ থাকে না, তাই দু-চার ওভারের বেশি বোলিং জোটে না। আজ কিন্তু বেটুদাকে দিয়ে অনেকক্ষণ বলা করানো হল— ফেয়ারওয়েলের অনারে। আট ওভারে বল করে একটা উইকেটও পেলেন। বেটুদাকে বল করতে ডাক দিতেই দর্শক হাততালি দিল। তার বলে একজন ক্যাচ আউট হতেই এমন হাততালি পড়ল যে বেটুদা নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

লাঞ্চ অবধি বান্ধব করল আট উইকেটে একশো বাহান্ন রান।

লাঞ্চের সময় বেটুদাকে মাঝখানে রেখে দু দলের প্লেয়াররা খেতে বসল। স্পেশাল গেস্ট হিসেবে বেটুদাকে জোর করে একটার বদলে দুটো কমলালেবু গছালেন বান্ধবের প্রেসিডেন্ট।

লাঞ্চের পর ইয়াং বেঙ্গল ব্যাট করতে নামল। পনেরো মিনিট বাদে তাদের প্রথম উইকেট পড়ল বারো রানে। এবার বেটুদার পালা।

পায়ে প্যাড, বাঁ বগলে ব্যাট, ডান হাতের মুঠোয় ধরা জোড়া ব্যাটিং গ্লাভস, মাথায় গাঢ় লাল কাউন্টি ক্যাপ। একটু সামনে ঝুঁকে ভারিক্কি চালে হেঁটে বেটুদা মাঠে ঢুকতেই প্রবল হাততালি। বান্ধব সংঘের খেলোয়াড়রাও হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল বেটুদাকে।

বেটুদার মনটা হালকা। দুদিন ধরে নিজের খেলার প্রশংসা শুনতে শুনতে মনে বেশ আত্মবিশ্বাস। ইচ্ছে কয়েকটা ভালো স্ট্রোক দেখাই। একটা বড়ো স্কোর করতে পারলে চমৎকার হয়। মনে রাখবে লোকে। না করলেই বা কী? ডন ব্র্যাডম্যান তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে কত করেছিলেন? শূন্য। তাতে কি ব্র্যাডম্যানের খ্যাতি কিছু কমেছে? শুধু কি সেই স্কোরটাই মনে রেখেছে লোকে? তাঁর আগের খেলা ভুলে গেছে?

সতর্কভাবে গার্ড নিলেন বেটুদা। বল করছে বাদল সাহা। বেশ জোরে বল করে। বাদল ইচ্ছে করেই বলের পেসটা একটু কমালো। ওভারের বাকি তিনটে বল করল অফস্টাম্পের খানিক বাইরে। যাতে বেটুদা চোখ সেট করার সুযোগ পান। একটা ভদ্র গোছের রান পান বিদায় দিনে। বাদলের তৃতীয় বলে বেটুদা খাসা একখানা স্কোয়ার কাট মারলেন। সোজা চার। খুব হাততালি পড়ল।

দেখতে দেখতে বেটুদার স্কোর এগিয়ে চলে। বেটুদার স্কোর কুড়ি না পেরনো অবধি বান্ধবের প্লেয়াররা তাঁকে আউট করার মোটেই চেষ্টা করেনি। বরং নেহাত সাদামাটা বলই দিয়েছে। কিন্তু তারপর তারা শঙ্কিত হল। এ ব্যাপার চললে যে বান্ধব হারবে। হোক একজিবিশন ম্যাচ তা বলে ইয়াং বেঙ্গলের কাছে হারা চলবে না। প্রেস্টিজ যাবে। বেটুদাকে ফেরত পাঠানো দরকার। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা শুরু করে।

কিন্তু তখন বেটুদাকে রোখে কার সাধ্যি! জড়তা কেটে গেছে। ওইটাই বেটুদার দুর্বলতা— প্রথমদিকে বড্ড নার্ভাস থাকেন। ফলে প্রায়ই টপ করে আউট হয়ে যান। এখন হাত খুলে মারছেন। সামান্য লুজ বল পেলেই পিটুনি। একখানা ছয়ও হাঁকালেন।

উল্লাসে ফেটে পড়ছে দর্শকরা। হাততালির ঝড় বইছে। বান্ধবের প্লেয়াররাও তারিফ জানাতে বাধ্য হয় বেটুদাকে। পঞ্চাশে পৌঁছে বেটুদা একটা চান্স দিলেন। তাঁর ব্যাট ছুঁয়ে বল বুক সমান উঁচু হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল ফার্স্ট এবং সেকেন্ড স্লিপের মধ্যে দিয়ে— বেশ জোরে। ফার্স্ট স্লিপ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ক্যাচটা রাখতে পারল না হাতে। বেটুদা তাতে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালেন না। যথারীতি খেলে

চললেন। ইতিমধ্যে তিনবার পার্টনার বদলেছেন বেটুদা। অর্থাৎ ইয়াং বেঙ্গলের আরও তিনটে উইকেট পড়েছে। তবে বেটুদা অবিচল।

ইয়াং বেঙ্গলের পঞ্চম উইকেট পড়ল। এবার বেটুদা আউট— এল. বি. ডবলু। স্কোর বোর্ড দেখাল, লাস্ট ব্যাটসম্যান— ৭৮। মোট রান তখন একশো সাঁইতিরিশ। আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে হাতে। অর্থাৎ ম্যাচ ইয়াং বেঙ্গলের হাতের মুঠোয়।

বেটুদা দৃপ্ত ভঙ্গিতে ফিরে চললেন। তিনি উইকেট থেকে বাউন্ডারি লাইনে পৌঁছানো অবধি বেজে চলে করতালি। টুপিতে হাত রেখে বেটুদা এই অভিনন্দনের উত্তর জানান। মাঠের বাইরে আসতেই আরও একদফা করমর্দন ও অভিনন্দন। প্যাড-ট্যাড খুলে রেখে এসে বেটুদা চেয়ারে বসে হাসি হাসি মুখে খেলা দেখতে লাগলেন। আর মাত্র দু ওভারে ষোলো রান তুলে ফেলে ইয়াং বেঙ্গল ম্যাচ জিতে গেল।

খেলা শেষ হবার পর আধঘণ্টা কেটে গেছে। বেটুদা বসে বসে গল্প করছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, তাঁর কাছাকাছি ইয়াং বেঙ্গলের কেউ নেই। পাশে যারা রয়েছে সবাই বান্ধব সংঘের লোক। তিনি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখেন, কিছু দূরে মন্টু, ভজা, শ্যামানন্দ বাবু এবং ইয়ং বেঙ্গলের আরও সাত-আটজনের জটলা। হাতটাত নেড়ে ওরা খুব কথা বলছে।

বেটুদা ভাবলেন, নিশ্চয়ই আমার বিদায় সভা নিয়ে আলোচনা চলছে। আর দেরি না করে লাগিয়ে দিক। সভার পর চা-টা আছে। কতক্ষণ বক্তৃতা চলবে কে জানে? খিদে পেয়ে গেছে।

মিনিট পাঁচ বাদে মন্টু এসে ডাকল, 'বেটুদা একবার আসবেন। এই দিকে। একটু দরকার।'

বেটুদাকে নিয়ে মন্টু ইয়াং বেঙ্গলের সেই জটলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অমনি সবাই তাদের ঘিরে ধরল। মন্টু ঘুরে দাঁড়িয়ে অতি বিনীতভাবে বলল, 'বেটুদা আমাদের একটা রিকোয়েস্ট মানে দাবিও বলতে পারেন, আপনার এখন রিটায়ার করা চলবে না।'

—'মানে!' বেটুদা থ।

—'মানে এবার আমাদের লিগ চ্যাম্পিয়ান হবার খুব চান্স। আপনি না খেললে হবে না।'

—'তোমরা যদ্দিন না চ্যাম্পিয়ান হবে তদ্দিন আমায় খেলে যেতে হবে।? বলছ কী!' বেটুদা উত্তেজিত।

—'না না তা বলছি না, কেবল এই সিজনটা। আর একটা বছর। প্লীজ।'

শ্যামবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'রাইট। বী রিজনেবল বেটুদা তোমার আর কী বা বয়স— ওনলি থার্টিফোর। মনে রেখো গ্রেট জ্যাক হবস—'

—'না না তা হয় না। লোকে কী ভাববে? অ্যানাউন্স করে ফেলেছি। ফেয়ারওয়েল ম্যাচ অবধি হয়ে গেল।'

বেটুদার আর্তনাদকে থামিয়ে দিলেন শ্যামবাবু, 'কিস্‌সু ভাববে না। আমরা আবার অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি— তোমার রিটায়ারমেন্ট পোস্টপোন্ড। সামনের বছর ফের তোমার ফেয়ারওয়েল ম্যাচ হবে। প্রেজেনটেশনটা তো রইলই। ইতিহাসে এমন ঢের হয়েছে।'

—'লোকে যে হাসবে,' বেটুদা খুঁত খুঁত করেন।

—'তা বটে,' বেটুদাকে ক্ষীণ সমর্থন জানায় গদাইদা। এই একমাত্র সমর্থন পেলেন বেটুদা।

ভজা আস্তিন গুটিয়ে বলল, 'কোন বাপের বেটা হাসবে শুনি? দাঁত ছটকে দেব না। হাসবে নয় বেটুদা, কাঁদবে। আপনি এই সিজনে খেলছেন শুনলে ওই বান্ধবের চোখেই জল এসে যাবে। ভাবছিল আপনি না খেললে ওদের খুব মওকা। নির্ঘাত চ্যাম্পিয়ানশিপটা মেরে দেবে।'

—'তা বটে।' গতিক বুঝে তৎক্ষণাৎ মত পালটালেন গদাইদা।

—'তাছাড়া আমার যে আরও অনেক অসুবিধে। বাড়িতে কত কাজ। গোটা সিজন কিচ্ছু করতে পারি না।' বেটুদা প্রাণপণে বোঝান।

—'দশের কাজ করলে ঘরের কাজে একটু টান পড়ে। আচ্ছা শুনি কী কাজ? তারপর না হয় ঠিক করা যাবে,' বললেন শ্যামবাবু।

—'হ্যাঁ হ্যাঁ'— সবাই সায় দেয়।

বেটুদা মন্টুর দিকে তাকিয়ে রেগে বললেন, 'গোটা ক্রিকেট সিজন তোমাদের বউদির কোথাও বেড়ানো হয় না। মার্কেটিং হয় না। বজবজ সুখচর বদ্যিবাটি— কত জায়গায় তার যাবার সাধ। ছুটির দিন মানেই আমার খেলা। কে নিয়ে যাবে?'

—'আমরা' উত্তর দিল ভজা, 'ননপ্লেয়িং মেম্বাররা পালা করে ডিউটি দেব। বউদিকে সব জায়গায় ঘুরিয়ে আনব। বজবজ বদ্যিবাটি কি? দিল্লি বম্বে হলেও কুছপরোয়া নেই।'

—'নেক্সট?' শ্যামবাবুর গলা।

—'বিল্টুকে চিড়িয়াখানা দেখাব বলেছি এই শীতে। সারাদিন কাটাবে। তার কি হবে?'

—'যাবে আলবৎ যাবে। এই হাবুল এটা তোর ডিউটি। আসছে রোববারই প্রোগ্রাম কর। তোর ভাইপো দুটিকেও সঙ্গে নিবি। বিল্টুর ফ্রেন্ড!' সমাধান দিল ভজা।

শ্যামবাবু বললেন— 'নেক্সট।'

—'আর তোমাদের মাসিমা মানে আমার মাকে বোলপুর নিয়ে যাবে কে? জয়দেবের মেলা দেখবেন। দিয়ে আসতে এবং নিয়ে আসতে হবে।'

—'আমি,' নিজের বুকে টোকা মেরে জানাল ভজা, 'বোলপুরের কাছেই শান্তিনিকেতনে আমার এক দাদা থাকে। ওসব রুট আমার চেনা।'

বেটুদার মুখে আর কথা সরে না।

—'ব্যাস, প্রবলেম সলভড।' শ্যামবাবুর মন্তব্য।

—'না না মন্টু,' আগে আমার বাড়ি থেকে পারমিশন নিয়ে এসো। তোমাদের বউদিকে রাজি করাও। তবে ফাইনাল কথা দেব।' বেটুদা শেষ চেষ্টা করেন।

—'ভজা মন্টু কুইক,' তাড়া দিলেন শ্যামবাবু, 'চট করে একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যা। তোরা ফিরে এলেই টি পার্টি শুরু হবে।'

আধঘণ্টার মধ্যেই মন্টুরা ফিরে এল। মুখে একগাল হাসি। অর্থাৎ বেটুদার ফেয়ারওয়েল এ বছর হচ্ছে না।

১৩৯০

মঙের চুনি

লীর দোকানে ঢুকে মঙ এক কোণে দাঁড়াল। আর একজন খদ্দের ছিল। ছোকরা কর্মচারীটি তাকে জিনিস দিয়ে বিদায় করে মঙের দিকে ফিরল।— 'কী চাই?'

—'চাল।'

ছোকরাটি চাল দেওয়ার বদলে মঙকে একবার তির্যক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সোজা মালিক লীর কাছে হাজির হল। লী টেবিলে খাতার ওপর হিসেব করছিল। কর্মচারীটি তাকে কী জানি বলতে মুখ তুলে মঙকে দেখল। তারপর হেঁড়ে গলায় হেঁকে উঠল— 'কী ব্যাপার মঙ? আবার কী চাই! পয়সা আছে?'

মঙ কাঁচুমাচু ভাবে বলল, 'না পয়সা আনিনি। লিখে রাখো। পরে সব শোধ করে দেব।'

—'উঁহু, আর ধার হবে না। এক সপ্তাহ ধারে ধারে চলছে। তোমার মতো খদ্দেরের সঙ্গে বেশিদিন কারবার করলে বাপু আমার ব্যাবসা লাটে উঠবে। ব্যাবসা করতে এসেছি আমি। দানছত্র তো খুলিনি। নেহাত পুরোনো খদ্দের বলে অ্যাদ্দিন চুপ করে ছিলাম।'

মঙ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। আস্তে আস্তে বলল— 'তোমার ধার আমি কবে শোধ করিনি, লী?'

—'হুঁ— তা করেছ। তবে এবার আর আশা দেখছি না।' লী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গোদা গোদা হাত দুটো টেবিলের উপর রেখে বেলুনের মতো ফুলো মুখটা সামনে বাড়িয়ে খুব মিহি সুরে বললে, 'বুঝলে বুড়ো, একটা ভালো পরামর্শ দিচ্ছি শোনো। কেন মিছামিছি সময় নষ্ট করছ? তোমার বরাতে আর

পাথর-টাথর নেই। তাই বলি এবার দেশে ফিরে যাও। কাজকম্ম করো। বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে নিজে মরছ। অন্যদেরও জ্বালাচ্ছ। গত দুবছর ধরে তো দেখছি। হ্যাঁ, যাবার আগে আমার ধারটারগুলো শোধ করে যেয়ো কিন্তু।'

মঙ কোনো উত্তর না দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। লীয়ের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তাকে যেন ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। ক্ষোভে দুঃখে সে দিশেহারা বোধ করছিল। বয়স ও দারিদ্র্যে জীর্ণ তার শরীর ধনুকের মতো নুইয়ে পড়েছিল। তার শীর্ণ তোবড়ানো মুখে অজস্র ভাঁজ। এলোমেলো ভাবে পা ফেলে মঙ ভাবতে ভাবতে পথ চলল।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে সে প্রথম এই অঞ্চলে এসেছিল। এই রত্নের দেশে। সত্যি, এমন দুরবস্থা তার কখনও হয়নি। খারাপ সময় আগেও অনেকবার এসেছে। কয়েকমাস যাবৎ কিছু পায়নি। কিন্তু তারপর আবার সৌভাগ্যের মুখ দেখেছে। কয়েকটি দামী পাথর পেয়ে গেছে। কিন্তু এবার যেন ভাগ্যদেবী আর মুখ তুলে চাইছেনই না। গত দু'বছরে যে কটা পাথর পেয়েছে তা অতি খেলো। বিক্রি করে কয়েকমাসের রসদ কেনার পয়সাও জোটেনি। মাঝে মাঝে পাথর খোঁজা বন্ধ করতে হয়েছে। এই গ্রামের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে গায়ে গতরে খেটে তিল তিল করে পয়সা জমিয়ে, আবার ফিরে এসে কাজে নেমেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই পয়সা শেষ হয়ে গেছে। ভাগ্য ফেরেনি। ফের অভাব দেখা দিয়েছে। ধার জমেছে।

শুধু লী কেন? কিছুদিন হল অনেকেই তাকে দেখলে ঠাট্টা করছে। গায়ে পড়ে উপদেশ দিচ্ছে। 'যাও হে বুড়ো, এবার ফিরে যাও। কোনোদিন রাস্তায় পড়ে বেঘোরে মরবে। খালি পেটে পাথর ভাঙা কি এই বয়েসে পোষায়!'

গ্রামের প্রায় সীমানায় কোম্পানির আমলে তৈরি ভাঙাচোরা দোতালা পাকা বাড়িটায় ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা। কোম্পানির বাড়িটা ছাড়িয়ে কিছু দূরে মঙের ছোট্ট কুটির। একটি মাত্র ঘর। বাঁশের দেয়ালের ওপর খড় ছাওয়া। মঙের মতো তার বাসস্থানটিরও চরম দুরবস্থা। এবার বর্ষা বুঝি কাটে না!

কুটিরের সামনে বেদির মতো পাথরটায় বসে পড়ল মঙ। ক্লান্ত পা দুটোকে ছড়াল। পরনের প্যান্টটার সর্বাঙ্গে তালি মারা। শার্টটা ঘাড়ের কাছে ফেঁসে গেছে। দুটোই চিরকুটে ময়লা। এক টুকরো সাবান পেলে কেচে পরিষ্কার করে নেওয়া যেত। কিন্তু সাবান কেনার পয়সা কই? পেটের ভাত জোটে না তো সাবান!

হ্যাঁ, লোকেরা ঠিকই বলে, তাকে নেশায় ধরেছে। রত্নের নেশা। চল্লিশ বছর আগে যখন বর্মা-রুবি মাইনস্-এ কাজ করতে আসে তখন কি মঙ জানত উত্তর

বর্মার মগোক প্রদেশে এই বনজঙ্গল পাহাড় রাজ্যে ঘুরে ঘুরে তার বাকি জীবনটা কেটে যাবে! তার দেশ এখান থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে। সেখানে তার নিজের বাড়ি আছে। বাড়ি যেত বছরে অন্তত একবার। এখন পাঁচ বছর যায়নি। খালি হাতে ফিরতে তার লজ্জা করে।

পাথরের রহস্য জানতে তার কম দিন লাগেনি, একটু একটু করে জেনেছে। ক্রমে নেশা ধরেছে। বর্মা-রুবি মাইনস্-এ কাজ করার সময় সে প্রথম পাথর চিনতে শুরু করে। জানে, এই দেশের মাটির তলায় আছে মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার। নানান জাতের মূল্যবান কোরাণ্ডাম পাথর। চুনি, নীলা, চন্দ্রকান্তমণি। মাটি খুঁড়ে পাথর ভেঙে বের কর। আর চিনতে শেখ পাথরের জাত। কোনটা দামী কোনটা খেলো।

কোম্পানিতে সে ছিল মজুর। মাটি পাথর কাটার কাজ। রত্নপাথর ঘাঁটাঘাঁটির তেমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু আর পাঁচজনের মতো সেও কাজের ফাঁকে কিছু কিছু করে পাথরের জাত বিচারের বিদ্যে রপ্ত করেছিল। বছর দশেক পরে কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল। অনেক কর্মচারী কিন্তু গেল না। লাইসেন্স নিয়ে নিজেরাই প্রসপেকটিং শুরু করে দিল। মঙও থেকে গেল। তখন থেকে তার ভাগ্যের ওঠানামার ইতিহাসের শুরু।

মঙ মাথা নেড়ে বিড় বিড় করতে লাগল। 'পেয়েছি, অনেকবার পেয়েছি। রাখতে পারিনি টাকা।'

মঙ চিরকাল বেহিসেবি। উড়নচণ্ডী যখনই দামি পাথর বেচে মোটা টাকা হাতে পেয়েছে দুহাতে উড়িয়েছে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেদার ফুর্তি করেছে। ব্যাস দুদিনে ফতুর, আবার যে কে সেই পাথর ফাটানো। প্রাণান্ত পরিশ্রম করা।

উদাস চোখে গ্রামের ঘরবাড়ির দিকে চেয়ে মঙ ভাবতে লাগল। এক সময় কী জমজমাটই না ছিল এই গ্রাম। পুরনো দিনের সেই ছবি মঙের মনে ভাসে। বড়ো বড়ো বাড়ি। সুন্দর দোকানপাট। কত লোকজনের আনাগোনা। ইরাবতী নদীর কূলে ঘাটে সর্বদা নৌকোর ভিড়। লঞ্চও বাঁধা থাকত দু-একটা। বর্মা-রুবি মাইনস্-এর দিন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অনেককাল বাড়বাড়ন্ত ছিল এই গ্রাম। তারপর ক্রমে অবস্থা খারাপ হতে থাকল। কেবল এই গ্রাম নয়। এই অঞ্চলের আরও অনেক গ্রাম যারা রত্নপাথরের খনিগুলির দৌলতে ফেঁপে উঠেছিল সবারই ভাগ্যরবি যেন অস্ত গেল।

মাটির তলায় লুকোনো মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার যেন ফুরিয়ে গেল। দামি পাথর

আর তেমন পাওয়া যায় না। খাটুনি পোষায় না। বেশির ভাগ অনুসন্ধানকারী চলে গেল। শুধু মঙের মতো কয়েকজন মাটি কামড়ে পড়ে রইল। রক্তে যাদের নেশা লেগেছে। রত্নপাথর খোঁজার সর্বনাশা নেশা।

পুরোনো লোক, মঙের বন্ধুবান্ধবেরা আজ কেউ নেই। তবে এখনও প্রতিবছর কিছু কিছু নতুন লোক আসে এ অঞ্চলে। কয়েক বছর খোঁজে। কেউ কিছু কিছু পায়। কেউ কিছুই পায় না। তারপর তারা চলে যায়। বেশিদিন থাকে না কেউ।

মঙ ভাবে, আর না। এবার ফিরে যাই। দেশে তার দুমুঠো ভাতের অভাব হবে না। কিন্তু হতাশ মনে পরাজিত হয়ে ফিরতে তার আঁতে লাগে। যদি তেমনি কিছু পাই তো ফিরব, নইলে নয়।

মঙ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। রোদ বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। পাথর তাতছে। ঘরে ঢুকে সে কৌটো, হাঁড়িকুড়িগুলো নেড়েচেড়ে দেখল চারমুঠো চাল অবশিষ্ট আছে আর এক ফালি কুমড়ো। অর্থাৎ মাত্র একবেলার আহার। থাক, এখন রান্না করব না, রাতে খাব। আসছে দিনের ভাবনা মঙের মাথায় আসে না। যা হয় হবে। শুধু লী কেন, অন্য কোনো লোক তাকে আর ধার দেবে না। অনেকের কাছেই তার প্রচুর ধার জমেছে। শেষ ভরসা ছিল লী, তাও গেল। বাধ্য হয়ে আবার হয়তো তাকে মজুরি খাটতে হবে। কিন্তু বুড়ো বয়সে হাড়ভাঙা খাটুনি আর শরীরে সয় না।

খাবার চিন্তায় লীর ঠাট্টা মনে পড়ল। তার কাছে কটা টাকাই বা ধার? অথচ মঙের কৃপায় তার কম লাভ হয়নি এতদিনে। বোকা মঙকে অনেকে ঠকিয়েছে। তার অংশীদাররা। দোকানদাররা। যখন সে পাথর ভালো চিনত না, দাম জানত না, অংশীদাররা প্রায়ই ভালো ভালো পাথরগুলো ঠকিয়ে নিয়েছে। ওই লী কতবার দামী পাথর নামমাত্র দামে কিনেছে তার কাছ থেকে। আবার টাকা হাতে পেয়ে ওই লীর দোকানেই সে ফুর্তি করেছে। জিনিস কিনেছে।

মাসের শেষে মোটা বিল দিয়েছে লী। একবার চোখ বুলিয়েও দেখেনি হিসেবটা। তৎক্ষণাৎ মিটিয়ে দিয়েছে সব পাওনাগণ্ডা। বন্ধুরা বলেছে ও বেটা জোচ্চোর। ঠকায়। মঙ কিন্তু কখনো লীকে কিছু বলেনি। আর আজ সেই লী কী অপমানটাই-না করল! এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই লোকটার।

মঙ উঠে দাঁড়াল। খনি খোঁড়ার দরকারি যন্ত্রপাতি ভরা থলিটা কাঁধে নিয়ে সে কুটিরের বাইরে বেরুল।

গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে মাইল খানেক দূরে পাহাড় জঙ্গলের শুরু। বনের কাছে

এক গভীর গর্ত। খনির খাদান এখন ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা। বড়ো বড়ো গাছ গজিয়েছে চারপাশে। প্রচুর রুবি ও নীলা পাওয়া গেছিল এই খাদে। মঙ বনের ভিতর ঢুকল। বনের মধ্যেও এমনি অনেক পরিত্যক্ত খনি ছড়িয়ে আছে। এক জায়গায় সে দেখল কয়েকজন লোক একটা খাদে কাজ করছে। এরা বছরখানেক হল খাদানটা খুঁড়ছে। কিছু কিছু পাথরও পেয়েছে। তবে রুবি কম, বেশির ভাগই নীলা।

এ-রকম দলবেঁধে কাজ করলে অনেক সুবিধে। কিন্তু মঙের দুর্ভাগ্য কেউ তাকে এখন অংশীদার নিতে চায় না। পয়সা নেই, বুড়ো। কাজেই মঙকে একা একাই কাজ করতে হয়।

তবে একা কাজ করার চেয়ে ইদানীং তাকে সবচেয়ে মুশকিলে ফেলেছে তার চোখ। তার দৃষ্টিশক্তি বেশ কমে গেছে। পাথর বাছতে অসুবিধা হয়। হয়তো বাজে পাথরের সঙ্গে দু-একটা ভালো দামি পাথরও ফেলে দেয়। কিন্তু শহরের ডাক্তারকে চোখ দেখানো বা চশমা নেবার ক্ষমতা তার নেই। তাই খুব ধীরে সাবধানে পাথর পরীক্ষা করে।

কাছে কোনো বড়ো পাহাড় নেই। নীচু পাহাড় বা টিলা। পাহাড়ের গায়ে ও উপত্যকায় নানারকম গাছগাছড়া। লম্বা লম্বা সেগুন গাছ। ঘন বাঁশের ঝাড় আর কাঁটা ঝোপই বেশি। শক্ত মাটির তলায় চুনাপাথরের স্তর। কোথাও বা কালচে কঠিন গ্রানিটের ঢিপি।

মঙ একটা পুরোনো খাদের পাশে থামল। কিছুদিন ধরে সে এই খাদানটার মধ্যে খুঁজছে। খাদানটা ভালো করে খোঁড়া হয়নি। যারা এখানে আগে কাজ করেছিল কোনো কারণে অনুসন্ধান শেষ না করেই চলে গেছিল। ঝোপ ও লতায় অনেকটা ঢেকে গেছে গর্ত।

খাদের দেয়ালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে মঙ সাবধানে নীচে নামল। প্রায় তিরিশ ফুট গভীর খাদ। এক জায়গায় অনেকগুলো বড়ো বড়ো পাথরের চাঙড় ছড়ানো। এগুলো ভাঙতে হবে। ওপর থেকে এক ফালি রোদ এসে পড়ছে। তবে আলো বেশিক্ষণ থাকবে না। মঙ তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দিল।

খস্ খস্ করে একটা আওয়াজ হতেই মঙ সতর্ক হল। কীসের শব্দ? শেয়াল, বুনো কুকুর না সাপ? ক্ষীণ দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে ওপরে চাইল। চারপাশে দেখল। একটা ছোটো পাথরের টুকরো হাতে তুলে নিল। দরকার হলে ছুড়বে।

নাঃ, শব্দটা থেমে গেছে। পাথরটা ফেলে দিতে গিয়ে সে চমকে উঠল। পাথরের গায়ে সন্তর্পণে আঙুল বোলাল। একটা ছোট্ট নুড়ি। পাথরের গায়ে

আটকে রয়েছে। তার চোখ দুটি মাঝে মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তার অভিজ্ঞ আঙুলের স্পর্শ কখনো ভুল করে না। সাধারণ নুড়ি নয়, কেমন মসৃণ। নিশ্চয় দামি পাথর। তাড়াতাড়ি সে হাতুড়ি ঠুকে পাথর ভেঙে নুড়িটা বের করল।

সুপুরির মতো ছোট্ট গোল নুড়ি। হুঁ, রঙটা যেন লালচে! একটু ঘষে পরিষ্কার করে সে ভালো করে দেখল। বাঃ, গাঢ় লাল রঙ যেন ফুটে বেরচ্ছে। রোদের আলোয় সে নুড়িটা পরীক্ষা করল। উত্তেজনায় ধক ধক করে উঠল তার হৃৎপিণ্ড। হ্যাঁ, যা ভেবেছে ঠিক। টুকটুকে লাল স্বচ্ছ পাথর। পায়রার রক্তের মতো গাঢ় লাল রঙা চুনি। যাকে বলে পিজিয়ন ব্লাড রেড রুবি। পৃথিবীর সেরা মণি। হীরের চেয়েও দামি। অতি দুর্লভ বস্তু। মনে হচ্ছে পাথরটির ঘনত্বও নিখুঁত। এখন অবশ্য তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। কিন্তু মঙ জানে কেটে পালিশ করলে এই পাথরের টুকরোটি অঙ্গারের মতো জ্বলবে। আলো পড়লে ঝিলিক দেবে।

এই রক্তরঙা চুনি কেবল উত্তরবর্মার মগোক অঞ্চলে ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাও আজকাল অতি দুষ্প্রাপ্য। সৌখিন ধনীর জগতে একটি পিজিয়ন ব্লাড রেড রুবির জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। অস্বাভাবিক দর ওঠে। ডান হাতের তেলোয় রাখা চুনিটি দেখতে দেখতে মঙের সারা শরীর কাঁপতে থাকে। দরদর করে ঘাম ঝরে। যেন বিশ্বাস হয় না ব্যাপারটা। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে চুনিটা। না, কোনো ভুল নেই।

কত ওজন হবে? মঙ আন্দাজ করল প্রায় কুড়ি ক্যারেট। সময় নষ্ট না করে সে চুনি পকেটে পুরে যন্ত্রপাতি থলিতে ভরে গ্রামের পথে রওনা দিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল।

মঙ সোজা বা-থিনের দোকানে এসে ঢুকল। লীর মতো বা-থিনেরও হরেকরকম ব্যাবসা। মশলাপাতি, মণিহারি জিনিস সাজানো রয়েছে দোকানে। সঙ্গে লাগোয়া একটি ঘরে পান-ভোজনের ব্যবস্থাও আছে। তাছাড়া লীর মতো বা-থিনও মণিরত্ন কেনাবেচা করে। গটগট করে এসে বা-থিনের সামনে টেবিলের ওপর চুনিটি রেখে মঙ বলল— 'ওজন করো।'

পাথরটি দেখে বা-থিন চমকে উঠল।

খপ করে তুলে নিয়ে আইগ্লাস বের করে চোখে লাগিয়ে গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করল। উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু ইতস্তত করে সে যেন অভ্যাসবশেই বলতে যায়— উঁহু, তেমন ভালো জাতের বলে মনে হচ্ছে না তো। কমদামি মাল।

কিন্তু মঙের ভাবলেশহীন মুখ দেখে সে নিজেকে সামলে নিল। মঙের মতো ঝানু পাথর খুঁজিয়েকে এসব ভাঁওতায় ভোলানো যায় না বা-থিন জানত। বরং সে হাত বাড়িয়ে মঙের হাত চেপে ধরে বলল— 'অভিনন্দন মঙ। খুব ভালো জিনিস পেয়েছ। খাঁটি মাল।'

মঙ আবার নিস্পৃহ স্বরে বলে, 'ওজন করো।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ করছি।' বা-থিন চটপট দাঁড়িপাল্লা বের করে।

হুঁ, যা ভেবেছিল ঠিক। 'একুশ ক্যারেট।'

—'দাম কত?' মঙ একই সুরে বলল।

বা-থিন কাগজ কলম বের করে নানারকম অঙ্ক কষতে লাগল। কিন্তু মঙ ততক্ষণে মনে মনে একটা হিসেব কষে ফেলেছে।

—'পনেরো হাজার টাকা।' বা-থিন বলল।

মঙ হাত বাড়াল। 'পাথর দাও।'

—'সে কী।' বা-থিন আঁৎকে ওঠে।— 'ভাবছ বুঝি ঠকাচ্ছি। বেশ আরও দুহাজার দিচ্ছি।'

—'না। পাথর দাও। এখন বিক্রি করব না।'

—'বেশ বেশ তাড়াহুড়োর কী আছে। পাথর দিচ্ছি। তা দুদণ্ড বসো তো। ওরে কে আছিস। দুটো মাংসের চপ নিয়ে আয়, আর চর্বির বড়া। গরম গরম আনবি।'

মঙ নির্বিকার ভাবে চা ও চপ খেল। তারপর চুনি পকেটে পুরে বেরিয়ে এল। বা-থিন পিছন পিছন আসে।— 'দেখো মঙ আমি তোমার কদ্দিনকার খদ্দের। কখনো ঠকিয়েছি তোমায়? জানি তুমি অন্য দোকানে যাবে দর যাচাই করতে। বেশ, অন্যরা যা বলে আমিও ঠিক তত দিতে রাজি। মনে রেখো কথাটা।'

লী হঠাৎ মাথা তুলে টেবিলের সামনে মঙকে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল। প্রায় মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল— আবার কী? বললাম তো ধারটার হবে না। কিন্তু মঙের হাবভাব দেখে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মঙ গম্ভীরভাবে চুনি বের করে টেবিলে রাখল— 'ওজন করো। কত দাম হবে।'

পাক্কা জহুরি লী পাথরটি এক নজরে দেখেই চিনতে পারল। একটু পরীক্ষা করেই কোনো সন্দেহ রইল না তার। উত্তেজনায় তার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল— 'অ্যাঁ, আজই পেলে বুঝি এটা?'

—'হুঁ।' মঙের সংক্ষিপ্ত জবাব।

অনুশোচনায় লীর নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়। ওঃ, এই লোকটাকে সে আজ সকালে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন? যদি মঙ প্রতিশোধ নেয়? যদি তাকে এই চুনি বিক্রি করতে না চায়? ইস, বহুদিন এমন ভালো লাভের সুযোগ আসে নি তার ভাগ্যে। এই রক্তরঙা চুনি বিদেশি ধনীর কাছে বিক্রি করে মোটা দাঁও মারা যাবে।

লী তৎপর হয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছোকরা কর্মচারীটির উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল— 'এই ব্যাটা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? ভদ্রলোককে বসার টুল দে। আর দেখ কী কী খাবার পাওয়া যায়। যা যা টাটকা পাবি আনবি।'

তারপর বলল, 'হেঁ হেঁ বুঝলে মঙ। তোমার সৌভাগ্য উপলক্ষে একটু খাওয়াদাওয়া না করলে কি চলে?' লী দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

মঙ প্লেটভর্তি খাবারের সদ্‌গতি করতে করতে বলল, 'কই, ওজন করলে না? দামটা হিসেব করো।'

—'হ্যাঁ করছি। তাড়া কীসের! আগে খাও।'

—'সতেরো হাজার টাকা।' দামটা বলে ফেলে লী আড়চোখে মঙকে লক্ষ্য করে। উঁহু, মনে হচ্ছে পছন্দ হয়নি দামটা। তাড়াতাড়ি বলল— 'আচ্ছা, আঠারো হাজার দেব। কী, চলবে?'

মঙ মুখ মুছতে মুছতে হাত বাড়ায়— 'আমার পাথর দাও।'

লী শশব্যস্ত হয়ে বলে, 'কী! পোষাল না? বেশ আর এক হাজার দিচ্ছি— উনিশ। এর বেশি কেউ দেবে না। তুমি যাচাই করতে পার। আরে! তোমায় কি আমি ঠকাব? আমাদের কি কেবল লাভ-লোকসানের সম্পর্ক। অ্যাঁ? তুমিই বলো?'

মঙ মাথা নাড়ল।— 'পাথর দাও, এখন বেচব না।'

লী হতাশ ভাবে বলল, 'বেশ, আর এক হাজার দিচ্ছি। এবার খুশি?'

মঙ কথা না বাড়িয়ে চুনি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

লী হাত কচলাতে কচলাতে রাস্তার মোড় অবধি সঙ্গে সঙ্গে চলে। মনে করিয়ে দেয় তাদের কত দিনের বন্ধুত্ব। কতদিনের কারবার। 'হ্যাঁ, সকালের ব্যাপারটা— ভাই রাগ কোরো না। মাথার ঠিক ছিল না আমার। একটা মোটা লোকসানের খবর পেলাম আজ সকালেই। সর্বনাশ হয়ে গেছে ব্যাবসার। নইলে কি ওই সামান্য কটা টাকার জন্যে তোমায় তাগাদা দি ? অ্যাদ্দিন তো দেখছ আমায়। তুমিই বলো।'

মঙ উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল।

গ্রামের পথে যার সঙ্গে মঙের দেখা হয় সেই সেধে সেধে কথা বলে। যারা

এতদিন, 'কী হে বুড়ো' ইত্যাদি ভাষায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলেছে, তারাই 'আজ্ঞে মশাই' বলে সম্বোধন করতে লাগল। মুখে তাদের সমীহ। প্রথমটা মঙ অবাক হয়ে গেলেও একটুক্ষণ পরে রহস্যটা ধরতে পারল।— অর্থাৎ খবরটা রটে গেছে।

মঙ তার কুটিরের ভিতর ঢুকে স্থির হয়ে বসল। হুম, এখন কী করা যায়? নাঃ খিদে নেই। লী ও বা-থিনের কল্যাণে পেট ভর্তি। ঘুম পাচ্ছে। সারাদিনের খাটুনি ও উত্তেজনায় শরীর অবসাদে জড়িয়ে আসছে। কিন্তু এই নির্জন ভাঙা ঘরে ঘুমনো কি ঠিক হবে? এখানে দুষ্টু লোকের অভাব নেই। সে বৃদ্ধ, দুর্বল। কেউ যদি জোর করে চুনিটা কেড়ে নেয় বা ঘুমের মধ্যে চুরি করে? এ চুনি সে এখানে বিক্রি করবে না। মান্দালয় শহরে নিয়ে যাবে। সেখানকার জহুরিদের সঙ্গে দরদস্তুর করলে তার দৃঢ় বিশ্বাস আরও কয়েক হাজার টাকা বেশি পাওয়া যাবে।

ভেবেচিন্তে মঙ কুটির ছেড়ে বেরিয়ে জঙ্গলের পথে হাঁটা দিল।

মঙ কোথায় আত্মগোপন করেছিল, কোথায় সে ঘুমিয়েছিল কেউ জানে না। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক পরে সে যখন গ্রামে আবির্ভূত হল তাকে দেখে সবাই হতভম্ব।

উশকোখুশকো চেহারা। চোখ লাল। পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে এবং হাতে একটা মস্ত ধারালো কাটারি।

কী ব্যাপার! ব্যাপারটা অচিরেই জানা গেল। মঙ জঙ্গলের ভিতর ঘুমিয়েছিল। সেই সময় কেউ নাকি তার চুনি চুরি করেছে।

মঙ উন্মাদের মতো পথে পথে ছুটে বেড়াতে লাগল। যাকে দেখে তার দিকেই ভয়ংকর ভাবে কাটারি তুলে তেড়ে যায়।

—'বলো, কে চুরি করেছে আমার পাথর? নিশ্চয় জান। বুঝেছি ষড়যন্ত্র। বেশ, আমিও দেখে নেব কেমন সে আমার হকের ধন হজম করে। ঠিক খুঁজে বের করব এই শয়তানকে। আমি তাকে খুন করব।'

গ্রামের লোক মঙের সেই বিভীষণ মূর্তি দেখে যে যার ঘরে ঢুকে দোর দিল। চুনির শোকে বুড়োর মাথার ঠিক নেই। কী জানি কী করে বসে।

মঙকে ছুটে আসতে দেখে লী ঝটপট দোকানের ঝাঁপ ফেলে ভিতরে বসে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। মঙ বাইরে থেকে তারস্বরে চেঁচাল, 'বুঝেছি, এ তোর কীর্তি লী। ভালোয় ভালোয় পাথর বের করে দে, নইলে এর শোধ আমি তুলব।'

লী কোনো সাড়াশব্দ দিল না।

সেখান থেকে মঙ ছুটল বা-থিনের উদ্দেশে।

বা-থিন অবশ্য আগে থেকেই খবর পেয়ে দোকান বন্ধ করে সরে পড়েছিল!

মঙ অনেকক্ষণ এইভাবে চেঁচামেচি ও আস্ফালন করে তার কুটিরে ফিরে গেল। তার চুনির কিন্তু কোনো হদিস মিলল না।

গ্রামে তো বেজায় হুলুস্থুল। কে চুরি করল মঙের চুনি?

একদল বলল, 'এ নির্ঘাত বেঁটে চ্যাং-এর কীর্তি।' লোকটা দাগী চোর এবং অনেকে তাকে মঙের পিছন পিছন যেতে দেখেছে। আর-এক দলের রায়, 'এটি ফুজির হাতসাফাই। বিকেলবেলা ও বনে ঢুকেছিল কী করতে?'

ফুজি ও চ্যাং দুজনেই গুজব কানে যাওয়া মাত্র দৃঢ়ভাবে সব অভিযোগ অস্বীকার করল। তাছাড়া তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণও কিছু নেই। হাতেনাতে কেউ ধরেনি। মঙও বলতে পারছে না কে নিয়েছে।

লী ও বা-থিনের মতো ব্যবসায়ীরা দারুণ ঘাবড়ে গেল। ছি ছি কী কাণ্ড! এরকম চুরি-চামারি হলে ব্যাবসা চলে কীভাবে! যে চুরি করেছে, সে তো পাথরটা নিয়ে সটকাবে এবং অন্য কোথাও বেচবে। এতে এই পাথর কেনাবেচা করে তারা যে লাভটুকু করত সেটি মাঠে মারা গেল।

লী বেঁটে চ্যাং-এর এক সাকরেদকে পাকড়ে মিষ্টি মিষ্টি করে শোনাল।— 'দেখো ভাই, কেউ যদি একখানা ভালো চুনি বিক্রি করতে চায় তো আমার কাছে পাঠিয়ো! উচিত দাম দেব! হ্যাঁ, পাথর সে কোত্থেকে পেয়েছে! কেমন করে? এসব নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র মাথাই ঘামাব না! আর কথা দিচ্ছি যেই বিক্রি করুক-না-কেন, তার নাম ধাম আমি গোপন রাখব।'

ইতিমধ্যে বা-থিনও একই বার্তা প্রচার করেছিল!

মঙ সে রাতে কেমন করে কাটালে কেউ খোঁজ করেনি। খোঁজ করার সাহসও ছিল না কারো। যাহোক পরদিন সকালে তাঁকে দেখা গেল নদীর ঘাটে বসে আছে।

সেদিন মান্দালয়গামী স্টিমার আসার দিন। ইরাবতী নদীপথে যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে স্টিমার আসা-যাওয়া করে। তবে রোজ নয় কয়েকদিন অন্তর অন্তর। স্টিমার গ্রামের ঘাটে থামে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি শহরে যাওয়ার বা আসার এই একমাত্র উপায়। নইলে নৌকোয় বা ডাঙাপথে অনেক বেশি সময় লাগে।

স্টিমার এল। মঙ ছাড়াও ঘাটে আর কয়েকজন যাত্রী ছিল। সবাই উঠল।

গ্রামের লোক কৌতূহলী হয়ে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল— 'মঙ, কোথায় চললে?'

অনেকক্ষণ পরে মঙ চিৎকার করে উত্তর দিল— 'থানায়।'

এখান থেকে ঘণ্টাখানেক স্টিমারে গেলে থানা। ওই থানার দারোগার উপর এ অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার।

ডেকের এককোণে মঙ কাঠের মতো খাড়া হয়ে বসে রইল। তার তীব্র উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি জলের দিকে নিবদ্ধ। যাত্রী ও মাল্লারা ফিসফিসিয়ে তার দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। কেউ অবশ্য তার কাছে ঘেঁষল না। এমনকী তার কাছে স্টিমারের টিকিট অবধি চাইতে গেল না কেউ।

থানার ঘাটে স্টিমার ভিড়তেই মঙ লাফ দিয়ে ডাঙায় নামল। সারেংকে আদেশ দিল— 'খবরদার, কাউকে নামতে দেবে না। আমি পুলিশ ডাকছি। তল্লাশি হবে।'

থানার দারোগা মঙের নালিশ শুনে বলল, 'তাই তো, খুবই দুঃখের ব্যাপার। তোমার এত বড়ো লোকসান হল। নাঃ, ওই গ্রামের বদমাসগুলো বড়ো জ্বালাচ্ছে। একবার আচ্ছা করে কড়কে না দিলে দেখছি চলছে না। তবে এখন লঞ্চে তল্লাশি করে কিস্‌সু ফল হবে না। যে চুরি করেছে সে কি আর এই স্টিমারে চলেছে? মনে হয়, সে আপাতত গ্রামেই আছে। পরে সুযোগ বুঝে পালাবে। আমি বরং গ্রামে সেপাই পাঠাচ্ছি। কিন্তু চুনি ফিরে পাওয়ার আশা কম। কে নিয়েছে যখন দেখতে পাওনি।'

মঙ নাছোড়বান্দা।— নিশ্চয় ওই গ্রাম থেকে যারা আসছে তাদের মধ্যে কেউ চুরি করেছে আমার চুনি। তাদেরই কারো কাছে আছে। তাড়াতাড়ি শহরে চলেছে বিক্রি করতে।'

অগত্যা বাধ্য হয়ে দারোগা উঠল। নইলে যে বুড়ো নড়বে না।

মঙের সঙ্গে আরও আটজন লোক ওই গ্রামের ঘাট থেকে স্টিমারে উঠেছিল। তাদের জামাকাপড় জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেও হারানো চুনির পাত্তা পাওয়া গেল না। বিরক্ত দারোগা সেপাইদের নিয়ে ফিরে গেল।

যাবার আগে দারোগা মঙকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করবে?' 'জানি না'— মঙ উত্তর দিল।

—'এই স্টিমারেই যাবে?'

—'হ্যাঁ।'

থানার এক সিপাই ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল ওই স্টিমারে। দারোগা তাকে

ডেকে বলল।— 'লোকটার ওপর একটু নজর রেখো হে। শেষে আত্মহত্যা না করে বসে। তাহলে আরও ভোগাবে আমায়।'

মঙ ডেকে কোণে গিয়ে বসেছে। তার মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। ডান হাতের তালু মুখের ওপর চাপা। সমস্ত ভঙ্গিতে চরম হতাশা ও রিক্ততার ভাব। মঙের অবস্থা দেখে অন্যদের দুঃখ হচ্ছিল। তবে তার গ্রামের সঙ্গী কজন বেজায় চটেছে। তারা দূর থেকে মুণ্ডপাত করছিল বুড়োর। মঙের অবশ্য কোনো খেয়াল নেই। নিজের চিন্তায় ডুবে আছে।

মান্দালয়ে স্টিমার থামতে মঙ নামল। সিপাইটি দারোগার কথামতো কিছুক্ষণ মঙকে চোখে চোখে রেখেছিল। কিন্তু জাহাজঘাটায় ভিড়ের মধ্যে হুস্ করে মঙ কোথায় যে হারিয়ে গেল! সিপাইটির তাড়া ছিল। একটা ক্ষ্যাপা বুড়োর পিছনে বাজে সময় নষ্ট না করে সে ছুটল শ্বশুরবাড়ি যাবার নৌকো ধরতে।

আরও দুদিন পরে।

দুপুরবেলা এক নির্জন মাঠের ধারে মঙ বাস থেকে নামল। একজন লোক সেই বাসে উঠবে বলে দাঁড়িয়েছিল। মঙকে দেখে চেঁচিয়ে বলল— 'আরে মঙ যে, অনেক কাল পর। থাকবে তো কিছুদিন?'

—'হ্যাঁ ভাই, এবার দেশেই থাকব ঠিক করেছি। আর ফিরব না।' মঙ হাসিমুখে উত্তর দিল।

—'বেশ বেশ। পরে দেখা হবে, গল্প হবে।' বলতে বলতে লোকটি চলন্ত বাসে উঠে পড়ল। মঙ একা একা দাঁড়িয়ে রইল।

দূরের মাঠের ওপারে গাছপালা ঘেরা তার নিজের গ্রামটির দিকে তাকিয়ে মঙ একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে বের করল একটি থলি। থলিটা টিপেটুপে দেখল। আঃ, নোটে ঠাসা। কড়কড়ে পঁচিশ হাজার টাকা। মান্দালয়ে চুনি বিক্রি করে পেয়েছে।

—'একটু হিসেব করে চললে এখন বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে আরামে কাটাব।' মঙ নিজের মনে বলল। 'মঙ বোকা, চিরকাল কেবল ঠকেই এসেছে। তাই না? এখন কেমন? চোর-ডাকাতকে ফাঁকি দিলাম এবং অতগুলো পাওনাদারকে বেবাক কলা দেখালাম। কাউকে একটি পয়সা ধার শোধ করতে হল না।'

দারোগাকে মঙ নিছক মিছে কথা বলেনি। স্টিমারে ওই গ্রামের যাত্রীদেরই কারো কাছে ছিল তার চুনি। তবে লোকটি যে স্বয়ং মঙ তা কে ভাববে!

বিচিত্র এক ষড়যন্ত্র

দিনটা ছিল শনিবার। হাফ ডে স্কুলের পর বাবলু গিয়ে ঢুকল ঘোষদের বাগানে কুলের লোভে। তেমন বড়ো নয় বাগানটা। গ্রামের সীমানায় বিঘে দুই জমিতে ছোটো এক পুকুর ঘিরে কটা আম নারকেল পেয়ারা ইত্যাদি গাছ। একটা কুলগাছও আছে। বড়ো বড়ো কুল হয়। খেতে খাসা।

বাবলু পকেট ভর্তি করে কুল নিল। তারপর ঝোপের আড়ালে বসে ঝাল-নুন সহযোগে তারিয়ে তারিয়ে কুল খেতে থাকে।

এই বাগানে তেমন কোনো পাহারা নেই। বাগানের এক কোণে সাধুচরণের কুঁড়েঘর। সাধুচরণই যেটুকু পাহারা দেয় বাগানটা। তবে তার বেশি মাথাব্যথা আম আর নারকেল নিয়ে। অন্য ফল নিয়ে বিশেষ গা করে না।

সাধুচরণের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। দোহারা মাঝারি লম্বা। শক্তপোক্ত গড়ন। সে একা থাকে। স্ত্রী তা গত হয়েছে বছর দুই। একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে কাছেই এক গ্রামে, বেশ কয়েক বছর আগে। অল্প চাষের জমি আছে সাধুচরণের। তাতে চাষ করে আর এই বাগান পাহারার কাজে কিছু দক্ষিণা পেয়ে তার পেট চলে যায়। অবসর সময়ে সে আড্ডা দেয় আর গান বাজনা নিয়ে থাকে। গানের গলাটি তার খাসা। নানান পল্লিগীতি গায়। আমুদে রসিক সাধুচরণের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসে গাঁয়ের লোক। ডেকে এনে তার গানও শোনে। গাঁয়ের সব বাড়িতেই তার যাতায়াত আছে।

এখনকার সাধুচরণের সঙ্গে বছর দশের আগের সাধুচরণের কিন্তু মিল নেই। এককালে সাধু ছিল নামজাদা চোর। তার ভয়ে তটস্থ থাকত শুধু এই পারুলডাঙা গ্রাম নয়, আশেপাশের সব গাঁয়ের লোক। বারকয়েক জেলও খেটেছে সাধু। তবে

বেশি দিনের মেয়াদ নয়। পুলিশ কোনো দিনই জুৎসই ভাবে কব্জা করতে পারেনি চতুর সাধুচরণকে।

নানা মুনি, নানা মত। কেউ কেউ বলে যে চোর বাপের বদনামে মেয়ের সম্মানহানি হচ্ছিল শ্বশুরবাড়িতে। তাই আদরের মেয়ের কান্নাকাটি অনুরোধে সাধু চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করে। আবার কেউ বলে যে সাধু নাকি এক সন্ন্যাসীর প্রভাবে চুরি ছেড়েছে। যা হোক চোর সাধু সত্যিকার সাধু হওয়ায় পারুলডাঙা এবং আশপাশের গাঁয়ের লোক পরম স্বস্তি পেয়েছে।

বাবলুর কিন্তু সাধুচরণকে বেশ রহস্যময় ঠ্যাকে। সে খানিক সমীহও করে ওকে। একবার এই বাগানে আম চুরি করতে এসে সে সাধুচরণের চোখে পড়ে যায়। সাধু তাকে গাছ থেকে নামিয়ে, তার হাত পাকড়ে বিদ্রূপের সুরে বলেছিল— ঠিক মতন আম চুরিরও এলেম নেই বাছা! ছ্যা ছ্যা। এই বলে সে বাবলুর পকেট থেকে সব কটা কাঁচা আম কেড়ে নিয়েছিল। আরও বলেছিল— তোমার বাড়িতে নালিশ করব না। লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে যাবে। তবে ফের ধরা পড়লে কিন্তু নালিশ করব তোমার বাবাকে।

তারপর অবশ্য সাধুচরণ এই নিয়ে আর কথা তোলেনি। বরং দেখা হলে হেসেছে। একবার সে নিজে বাবলুকে দুটো বড়ো বড়ো পাকা ল্যাংড়া আম দিয়েছিল খেতে।

কুল খেতে খেতে বাবলু সাধুচরণের কুটিরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সহসা দেখে যে বাগানের পথে সাধুচরণের কুটিরের দিকে চলেছেন বৃদ্ধ উমাপতি ঘোষমশাই। অর্থাৎ এই বাগানের মালিক।

বাবলু আরও লুকিয়ে বসে ঝোপের আড়ালে।

ঘোষমশাই সাধুর কুটিরের সামনে গিয়ে নীচু স্বরে ডাকলেন— সাধু!

সাধু দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলল, পেন্নাম হই বাবু। আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন?

ঘোষমশাই গম্ভীর ভাবে বলেন, এলেম কি সাধে? তোর পাত্তাই নেই। সেই কাজটা মনে আছে তো?

—আজ্ঞে তা কি ভুলি। কথা যখন দিইচি, কাজ ঠিক হাসিল করব। তবে বাবু এসব কর্মে আর মন চায় না। নেহাত আপনারা বলছেন তাই—

—কেন। তোমার ভয় করছে নাকি?

—ভয়? সাধুচরণ নীরবে হাসে।— ও বস্তুটি আমার নেই। স্বেচ্ছায় এ বৃত্তি

ত্যাগ করেছি। তাই আপনাকে বলছি, আমার মন চাইছে না। এই ভার আর কাউকে দিলে পারতেন।

—না না। ঘোষমশাই বাধা দেন, তোমায় ছাড়া আর কাউকে এ কাজে বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না। জানাজানি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি হবে।

ঘোষমশাই আরও কী সব বলেন চাপা গলায় উদ্‌বিগ্ন মুখে। বাবলুর কানে তা ভালোভাবে পৌঁছয় না। সে উৎকর্ণ হয়ে শোনে টুকরো টুকরো বাক্য। যেমন— হাতে বেশি সময় নেই। প্ল্যানট্যান সব—

সাধুচরণ বলে, আজ্ঞে সে সব হয়ে গ্যাছে। কাল সকালে যাব একবার দেখে নিতে—

ঘোষমশাই বলেন, খুব হুঁশিয়ার। রাখহরির মেজো ছেলেটা আস্ত গুণ্ডা।

জবাব হয়— গুরুর কৃপায় সাধুচরণ কোনো মানুষকে ডরায় না। তার বেশি ভয় বরং কুকুরকে। ভারি বেয়াড়া জানোয়ার।

—কুকুর থাকলে সে বাড়িতে চুরি করনি?

—এ কেমন কথা? সাধু নিঃশব্দে হাসে, বাঘা ডালকুত্তার পাহারা দেওয়া কত বাড়ির সিন্দুক সাফ করেছি। কুকুরকে বশ করার বিদ্যে না জানলে কি এ লাইনে উন্নতি করা যায়? আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। এখন বিদায় নিন। কেউ দেখলে কী আবার সন্দেহ করে বসে।

ঘোষমশাই সন্ত্রস্ত চোখে চারপাশ দেখে নিয়ে গুটিগুটি ফিরে চললেন। সাধুচরণ ঢুকে গেল তার ঘরে।

আরও মিনিট পনেরো বাদে বাবলু চুপিচুপি সরে পড়ল বাগান থেকে। কোনো অভাবিত রহস্যের সম্ভাবনায় সে তখন উত্তেজনায় থরথর।

এবার বাবলুর কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে বাবলুর গ্রামের নাম পারুলডাঙা। বাবলু পড়ে স্কুলে, ক্লাস নাইনে। সে বেজায় ডানপিটে আর খেলাধুলায় চৌকস। পড়াশুনায় মোটামুটি। ইদানীং বেশ-কিছু রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা গল্প পড়ে তার মন উত্তেজিত হয়েছে। কোনো রহস্যের গন্ধ পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার সমাধানে।

পরদিন রবিবার। ভোর থেকে গিয়ে বাবলু লুকিয়ে রইল ঘোষদের বাগানে। ঘণ্টাখানেক বাদে সাধুচরণ বেরিয়ে এল তার কুটির থেকে। তার পরনে গেরুয়া রঙের ফতুয়া ও সাদা ধুতি। হাতে দোতারা।

সাধুচরণ ধীরে ধীরে চলল গ্রামের ভিতর। সে যেন না দেখতে পায় এমনভাবে দূরত্ব রেখে বাবলু সাধুকে অনুসরণ করে।

সাধুচরণ পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের কয়েকজনের সঙ্গে রসালাপ করল। একজনের বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কীর্তন গাইল কয়েক কলি। এপথ ওপথ খানিক ঘুরে সে গিয়ে ঢুকল রাখহরি বোসের বাড়ির ভিতর। ওই বাড়িতে সে রয়ে গেল।

মিনিট দশেক বাদে বাবলু বোসবাড়ির সামনে দিয়ে যাবার ছলে আড়চোখে ভিতরে দেখে নিল আধখোলা দরজা পথে—

বোসবাড়ির এলাকাটা বেশ বড়ো। প্রায় বিঘেখানেক জায়গা মাটির উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে দোতলা পাকা বসতবাড়ি, গোয়ালঘর ইত্যাদি। গোয়ালঘরে খড়ের চালে ছেয়ে আছে মস্ত এক লাউ গাছ। বড়ো বড়ো লাউ ধরেছে গাছে।

বাবলু দেখল যে বৃদ্ধ রাখহরি বোস দাওয়ায় বসে আছেন চেয়ারে। সমুখে মোড়ায় বসে হাসিমুখে কথা কইছে সাধুচরণ। একটু বাদেই কানে আসে সাধুচরণের গান দোতারা বাজিয়ে গাইছে বাউল সাধু। বোসমশাই বাউল গানের ভক্ত।

বাবলু দূরে পথের মোড়ে প্রতীক্ষায় থাকে, বোসবাড়ির ওপর নজর রেখে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে সাধুচরণ বেরুল বোসবাড়ি থেকে। খানিক এপথ ওপথ ঘুরে সে এবার ঢুকল উমাপতি ঘোষের বাড়ি।

ঘোষবাড়ির ধাঁচ বোসবাড়ির মতনই। খানিক বাদে ঘোষবাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় বাবলু লক্ষ করে যে উমাপতি বসে আছেন উঠোনে খাটিয়ায় আর সাধু সামনে টুলে বসে। দুজনে কথা বলছে নীচু স্বরে।

ঘোষবাড়ি থেকে বেরিয়ে সাধুচরণ সোজা ফিরে গেল তার নিজের কুটিরে।

বাবলু বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবে।— গোপন ব্যাপার/প্ল্যান-ট্যান চুরি— এসবের অর্থ কী? মনে হচ্ছে, উমাপতি সাধুচরণকে দিয়ে রাখহরি বোসের বাড়ি থেকে কিছু চুরি করতে অভিসন্ধি এঁটেছেন। তা চাইতেই পারে। দুবাড়ির যা সম্পর্ক। হয়তো দামি কিছু। বোসদের জব্দ করতে। তাই সাধুচরণকে বলে-কয়ে রাজি করিয়েছেন। কী হতে পারে? ঘোর রহস্য। গভীর ষড়যন্ত্র। বাবলুর মনে চিন্তার ঝড়।

এখন এই ঘোষ এবং বোস, দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন তা জানানো দরকার।

উমাপতি ঘোষ এবং রাখহরি বোস পরস্পরের দূর সম্পর্কের ভাই অর্থাৎ আত্মীয়। কিছুকাল আগেও দুই পরিবারের মধ্যে দিব্যি ভাব ছিল। রাখহরি উমাপতি কাছাকাছি বয়সি। বছর সত্তর ছুঁয়েছে। তখন উমাপতি প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় রাখহরির বাড়িতে যেতেন দাবা খেলতে।

দুই পরিবারই বেশ অবস্থাপন্ন। বছর তিনেক আগে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতায় হঠাৎ চিড় ধরে। কারণটা তুচ্ছ অতি। ফি বছর পারুলডাঙা ক্লাব দুর্গাপুজোয় যাত্রা করে। সেবার ঘোষদের বড়ো এবং বোসদের মেজো দুই ছেলেই চায় সেনাপতির পার্ট। তাই থেকে মন কষাকষি। সেনাপতির পার্টটা অবশ্য দু-জনের কারোর বরাতেই জোটেনি। কিন্তু সম্পর্কে ফাটল ধরল। এরপর থেকে খুচখাচ ঝগড়া মামলা লেগেই আছে দুই পরিবারের মধ্যে। উমাপতি আর যান না বোসবাড়িতে দাবা খেলতে। তবে দাবার নেশায় দুজনেই গিয়ে জোটেন দত্ত বাড়িতে দাবার আসরে। সেখানেও দুজনে পরস্পরকে এড়িয়ে চলেন। তাই রাখহরিকে জব্দ করতে উমাপতির কোনো ষড়যন্ত্র করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

বাবলু ভাবে একবার, পুলিশকে জানালে কেমন হয়? না; পুলিশ হয়তো আমার ধারণাকে পাত্তাই দেবে না। এ রহস্য উদ্‌ঘাটন আমায় একাই করতে হবে। কড়া নজর রাখব সাধুচরণের ওপর।

দুদিন বাদে রাত আটটা নাগাদ। পৌষের শীতে গ্রাম তখন জবুথবু নিঝুম। চাদর মুড়ি দিয়ে বসে বাবলু পড়া করছিল নিজের বাড়িতে। সহসা 'আগুন আগুন'— বহুকণ্ঠের চিৎকার শুনে বাবলু উঠে পড়ে লাফ দিয়ে বেরুল পথে।

পুব পাড়ার আকাশটা লাল হয়ে গেছে। বাবলু দৌড়ল সেদিকে। গ্রামের নানা বয়সি পুরুষ তখন নানাদিক থেকে ধেয়ে চলেছে পুব পাড়ায়।

আগুন লেগেছে পুব পাড়ায় বিধু দাসের উঠোনে রাখা খড়ের গাদায়। কদিন আগে একটা খড়ের চালা নতুন করে ছেয়ে পুরনো খড় ডাঁই করে রাখা হয়েছিল ওখানে। তাতেই লেগেছে আগুন। বাজে খড় পোড়ার জন্য মাথাব্যথা নেই বিধু দাস বা অন্যদের। ভয়টা হল আগুন না ছড়িয়ে পড়ে।

কিছু খড় ভিজে ছিল। তাই ধোঁয়া উঠছে প্রচুর। খড়ের গাদায় মেশা কাচা বাঁশের টুকরোগুলি ফাটছে পটকার মতো। জ্বলন্ত খড়ের গাদায় জল ঢালা হচ্ছে, বাঁশ দিয়ে পেটানো হচ্ছে, বিরাট হাঁকডাক চলছে।

বাবলু খেয়াল করে যে জনতার ভিড়ে সাধুচরণকে তো দেখছি না। সে ভাবল একবার বোসবাড়িতে দেখি গিয়ে। যাবার পথে বাবলু দেখল যে ঘোষবাড়ির

মেয়েরা ও বাচ্চারা ওদের বাড়ির সামনে ভিড় করে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। উমাপতিকে দেখা গেল বাড়ির মেয়েদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাখহরি বোসের বাড়িতেও একই দৃশ্য। বাড়ির মেয়েরা ও বাচ্চারা কেউ সদর দরজার কাছে, কেউ কেউ ছাদে। সবারই উৎসুক চোখ অগ্নিকাণ্ডের দিকে। রাখহরিবাবু বা বাড়ির অন্য পুরুষদের দেখা মিলল না।

কয়েক মিনিট বোসবাড়ির কাছে কাটিয়ে বাবলু ভাবল যে এখানে থেকে লাভ নেই। সাধুচরণের বাসায় গিয়ে দেখি। আগুন লাগার সুযোগে কিছু হাতিয়ে নিয়ে ও যদি ঘরে ফেরে তখন ধরব ওকে।

সাধুচরণের কুটিরে আলো নেই। হালকা চাঁদের আলোয় চারপাশে আবছা আঁধার। দূর থেকে ভেসে আসছে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে কলরব। বাবলু সাধুচরণের কুটিরের কাছে লুকিয়ে অপেক্ষা করে। দেখা যাক ও আসে কি না?

সহসা এক ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটে সেখানে। সে কুটিরের দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে। ঘরে মিটমিটে আলোর আভা দেখা যায়। এবার বাবলু নিঃশব্দে কাছে গিয়ে কুটিরের আধভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে নজর করে ভিতরে।

ঘরে একটা কুপি জ্বলছে। সাধুচরণ মেঝেতে বসে। তার সামনে দুটো পেটমোটা থলি মাটিতে শোয়ানো। হাঁপাচ্ছে সাধু। হয়তো ওই ভারী থলি দুটো বয়ে আনার পরিশ্রমে। নির্ঘাত চোরাই মাল আছে থলি দুটোয়।

বাবলু আর দেরি করে না। কপাট দুটো হাট করে খুলে সে দরজা আগলে দাঁড়ায়। সাধুচরণ চমকে তাকায় বাবলুর দিকে। বাবলু সোজা থলি দুটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করে, ও দুটোয় কী আছে?

সাধুর চোখ ধকধক করে ওঠে রাগে। সে চাপা গর্জন ছাড়ে, বেরিয়ে যাও। ডেঁপোমি হচ্ছে? এককোঁটা ছোঁড়া।

বাবলু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, বেশ আছি। তবে কোথায় যাব জানো? থানায় পুলিশের কাছে।

—পুলিশে কেন? সাধুর কণ্ঠে উদ্‌বেগ।

—পুলিশ এসেই বের করুক ওই থলি দুটোয় কী চোরাই মাল আছে। বাবলু এক পা পেছয়।

—দাঁড়াও। সাধুর স্বর খাদে নামে। খানিক গুম মেরে থেকে সে বলে, উত্তম, তুমি নিজেই দ্যাখো, কী আছে এতে? কী ধনদৌলত।

সাধু একটা থলির মুখ ফাঁক করে যা টেনে বের করে তা দেখে বাবলু থ।

—একটা প্রকাণ্ড লাউ।

সাধু দ্বিতীয় থলিটা থেকেও বের করে অনুরূপ আকারের এক বিরাট লাউ। সাধুর চোখে বিদ্রূপ।

—একী? লাউ! কাদের বাড়ির? বাবলুর ভ্যাবাচ্যাকা প্রশ্ন।

—একটা উমাপতিবাবুর, আর একটা রাখহরিমশায়, বোসমশায়ের বাড়ির। সাধুর জবাব।

—এইজন্য এত কাণ্ড। ঘোষমশায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র। যাঃ! বাবলুকে থামিয়ে বলে সাধু, শুধু ঘোষমশাই নয়, রাখহরি বোসমশাইও আছেন এই ষড়ে। তাঁদের কথাতেই আমি একাজ করেছি। চুরিবিদ্যে ছেড়ে দিয়েছিলাম। নেহাতই ওঁদের অনুরোধ ফেলতে পারলাম না।

—একজন বুঝি অপরজনের বাড়ির লাউ চুরি করিয়েছেন তোমায় দিয়ে?

—মোটেই না। যে যার নিজের বাড়ির লাউ চুরির অর্ডার দিয়েছিলেন আমায়। দুই কর্তাই জানেন পুরো ব্যাপারটা। কদিন বাদেই এই লাউ দুটো যেত লাভপুরে কম্পিটিশনে।

—সাধুদা একটু খুলে বলো প্লিজ। কিস্‌সু মাথায় ঢুকছে না। বাবলু ঘরে ঢুকে বসে পড়ে সাধুচরণের সামনে।

সাধু সামলে নিয়েছে নিজেকে। মুচকি হেসে বলে, বসো, বলছি সব। তবে সময় নেই হাতে। এখুনি মাল পাচার করতে হবে। অল্প কথায় বলি।

সাধুচরণ বলল এক বিচিত্র কাহিনি।

গ্রামের সবাই জানে যে পুব পাড়ায় ঘোষ ও বোস পরিবারের মধ্যে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। যা তারা জানে না তা হল, দুই বাড়ির দুই বৃদ্ধ কর্তাদের এই ঝগড়াঝাঁটিতে সায় নেই মোটে। তাঁরা ছেলেদের নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় পারেননি। বাইরে উমাপতি ও রাখহরি পরস্পরকে এড়িয়ে চলেন ছেলের ভয়ে। কিন্তু ফাঁক পেলেই দুজনে কথা বলেন গোপনে। দুঃখ করেন। অথচ পুরনো দিনগুলি ফিরে পাবার উপায় খুঁজে পান না। এই ঝগড়া কমার লক্ষণ নেই। বরং কয়েকদিন বাদে লাভপুরে কৃষি প্রদর্শনী উপলক্ষে হয়তো তা আরও বাড়বে।

প্রতি বছর লাভপুরে কৃষি প্রদর্শনীতে নানান ফুল ফল তরকারি ফলনের প্রতিযোগিতা হয়। আশেপাশের চাষিরা যোগ দেয় তাতে। সেরা ফুল ফল তরকারি ফলনের জন্য দেওয়া হয় মানপত্র পদক অর্থপুরস্কার। এই প্রতিযোগিতায়

ফার্স্ট হওয়া রীতিমতো গৌরবের ব্যাপার। স্বয়ং কৃষিমন্ত্রী এবং জেলাশাসক আসেন পুরস্কার বিতরণ করতে।

এবার রাখহরি বোসের এক ছেলে জোগাড় করে আনে স্পেশাল জাতের লাউয়ের বীচি। তাই থেকে চারা জন্মায়। খবরটা চলে যায় ঘোষবাড়িতে। দুই বাড়িতেই দুপক্ষের চর আছে, দু বাগাল ছেলে। তারা নিয়মিত উৎকোচ পেয়ে থাকে দু বাড়ির গোপন খবর সরবরাহের বিনিময়ে। ব্যস, সেই স্পেশাল লাউয়ের বীচি চর মারফত চুরি হয়ে আসে ঘোষ বাড়িতে। তাই থেকে চারা তৈরি হয় সেখানেও। এদিকে বোসবাড়িতে খবর যায় যে ঘোষরা কম্পিটিশনের জন্য এবার লাউ ফলাচ্ছে। চারা তুলেছে। তবে সেই বীচি যে কোত্থেকে এসেছে, খবরটা ফাঁস হয়নি।

বোসরা খোঁজ রাখে ঘোষরা লাউয়ে কী কী সার দিচ্ছে। খবর আসে, ওরা নাকি স্পেশাল সার দিচ্ছে লাউয়ের সাইজ বাড়াতে। বোসবাড়ির গুপ্তচর ঘোষদের লাউ গাছের জন্য স্পেশাল সারের খুঁটিনাটি খবর পৌঁছে দিতে থাকে রাখহরির ছেলেদের।

স্পেশাল বীচি, স্পেশাল সার, ফলে দুই বাড়িরই লাউ গাছে ফল ধরে মস্ত মস্ত। লাউগাছ পাহারা দেয় দুপক্ষই, পাছে অন্যজন তাদের লাউ গাছের ক্ষতি করে বা চুরি করে প্রতিযোগিতার জন্য রাখা লাউ, সব চাইতে বড়ো লাউটা।

লাউ নিয়ে এই বিবাদ থামাতে চেয়েছিলেন উমাপতি এবং রাখহরি। যথারীতি তাঁরা ব্যর্থ হন। কদিন আগে তাঁরা জানতে পারেন যে দু বাড়ির ছেলেরাই অসৎকর্ম করেছে এই লাউ ফলানো নিয়ে।

দুই কর্তাই গেলেন বেজায় চটে। অবাধ্য গোঁয়ার পুত্রদের শায়েস্তা করতে তাঁরা অন্য পন্থা ধরলেন। দুজনে যুক্তি করে সাধুচরণকে ভার দিলেন, দুই গাছের দুটো লাউ হাপিজ করতে, যে দুটো লাউ কম্পিটিশনে পাঠাতে চায়। কারণ দুই পরিবারের কারোর বরাতেই ফার্স্ট প্রাইজ না জোটা উচিত।

সাধুচরণ গম্ভীর ভাবে বলল, শুনলে তো সব। এখন ঠিক করো পুলিশে খবর দেবে কিনা? কর্তাদের মন রাখবে, না দুবাড়ির বিবাদটা আরও বাড়াবে?

বাবলু মাথা চুলকিয়ে বলে, নাঃ থানা-পুলিশে দরকার নেই। আমি বলব না কাউকে এ ব্যাপারে।

সাধুচরণ হাঁফ ছাড়ে খুশিতে।

—আরে বাপু, এ লাইনে পাঁচজনা এখনও আমায় মান্যি করে। রিটায়ার

করেচি। তবু এ কাজে হাত দিলেম শুধু দশের মঙ্গলের জন্য। টাকার লোভে নয়। বোসদের গুণ্ডা মেজোছেলে আর ঘোষদের খেঁকি কুকুরটার নজর এড়িয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে দুই পেল্লাই লাউ সরাতে এই শর্মা ভিন্ন এ তল্লাটে আর কে পারবে? কর্তারা অবশ্য পান খেতে আমায় দেবেন সামান্য। লাউ পিছু পঞ্চাশ টাকা। আর লাউ দুটো ফাউ।

—আগুন কি তুমি লাগিয়েছ? জানতে চায় বাবলু।

—হ। একটা গোলমাল পাকালে মাল হাতাতে সুবিধে হয়।

—লাউ দুটো নিয়ে কী করবে? খাবে বুঝি?

—বাপরে। এ দুটো দিয়ে তো গোটা গাঁয়ে ভোজ লাগানো যায়। এ বস্তু এক্ষুনি পাচার করতে হবে। ধরা পড়লে সর্বনাশ। বলেই সাধু দরজার বাইরে গিয়ে সজোরে দুবার শিস দিয়ে ভিতরে এল।

একটু বাদেই নিঃসাড়ে ঘরে ঢুকল বছর কুড়ির এক ছোকরা। তার রং মিশকালো। লম্বা পাকানো শরীর। সাধু দ্রুত বলে গেল তাকে, গুটে, চটপট লাউ দুটো কেটে ফ্যাল টুকরো করে। তাপ্পর থলিতে ভরে নিয়ে যা। একটা বড়ো টুকরো আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দিবি। বলবি, আমার গাছের লাউ পাঠিয়েছি। দু টুকরো তুই নিবি। বাকি লাউ জঙ্গলে পুঁতে দিবি।

গুটে নীরবে একটা বড়ো ছুরি নিয়ে খচাখচ লাউ দুটো টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর খণ্ডগুলো থলিতে ভরে কাঁধে ফেলে মিলিয়ে গেল বাইরে অন্ধকারে।

সাধুচরণ বাবলুকে বলল, এবার তুমি যাও। আমি বেরুব। দেখি, ওখানে কী ঘটছে?

দুজনে বাইরে আসে। বাবলু হঠাৎ খেয়াল করে যে সাধুচরণ উধাও হয়েছে। তখনও পুব পাড়ার হৈ চৈ চলছে। তবে আগুনের আভাটা আর নেই। বাবলুও চলল পুব পাড়ার উদ্দেশে।

বাবলু উমাপতির বাড়ির সামনে এসে দেখে যে সেখানে বিরাট জটলা, বেজায় উত্তেজনা। আবিষ্কার হয়েছে— রান্নাঘরের চাল থেকে প্রতিযোগিতার জন্য রাখা লাউটা চুরি হয়ে গেছে। এ নির্ঘাত বোসদের কীর্তি। উমাপতির ছেলেরা দলবল জুটিয়ে তড়পাতে তড়পাতে চলল বোসবাড়ির দিকে। কিন্তু মাঝপথে তাদের সঙ্গে মোলাকাত হল বোসবাড়ির লোকজনদের। তারাও আবিষ্কার করেছে যে তাদের কম্পিটিশনের লাউ উধাও এবং ঘোষদের অপরাধী

ঠাউরে তারা হুংকার দিতে দিতে আসছিল। দুই বাড়িরই লাউ চুরি গেছে শুনে দুপক্ষই হতভম্ব। তারা একে অপরের বাড়ি গিয়ে যাচাই করে আসে ঘটনাটা সত্যি কিনা।

এবার দুপক্ষই গিয়ে বসল উমাপতির বাড়ির আঙিনায়। দুদলেরই সন্দেহ এ নির্ঘাত মথুরাপুর গ্রামের সাহাদের অপকর্ম। সাহারা লাউ ফলনে এক্সপার্ট। গত দু বছর ওদের লাউ ফার্স্ট হয়েছে লাভপুরে। পাছে এবার হেরে যায় তাই এই চক্রান্ত। পারুলডাঙার পুবপাড়ার উমাপতি ও রাখহরিদের সঙ্গে তাদের বেজায় রেষারেষি।

দুঃখের বিষয় কম্পিটিশনে ফার্স্ট হবার মতন আপাতত তেমন আর বড়ো লাউ নেই ঘোষ বা বোসবাড়ির গাছে। এই দুই লাউয়ের আকার যাতে খুব বাড়ে তাই অন্য বড়ো লাউ সব কেটে ফেলা হয়েছে প্রথামাফিক। সাহাদের টেক্কা দিতে তেমন কোনো লাউ নেই পারুলডাঙার কারও গাছে। দুই বাড়ির সঙ্গে সুর মিলিয়ে গোটা গাঁ শ্রাদ্ধ করতে থাকে মথুরাপুরের সাহাদের।

বাবলু দেখতে পায় যে ভিড়ে সাধুচরণও রয়েছে।

উমাপতি রাখহরিও ছিলেন জমায়েতে। পাশাপাশি বসে চুপচাপ শুনছিলেন সব। হঠাৎ উমাপতি মৃদু গম্ভীর গলায় বললেন, রাখু এবার ফুলকপি কেমন হয়েছে? দেওয়া যাবে কম্পিটিশনে?

—তা দেওয়া যাবে। প্রাইজ পাবার মতনই সাইজ। জানান রাখহরি।

—আমাদের বাঁধাকপির সাইজও হয়েছে খাসা। তা এবার যদি তোমরা ফুলকপি আর আমরা বাঁধাকপি পাঠাই কম্পিটিশনে পারুলডাঙার হয়তো কিছুটা প্রেস্টিজ বাঁচে। গতবার তো তোমাদের ফুল আর আমাদের বাঁধা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল। আসচেবার ফের লাউ ট্রাই করব। হয় তোমরা, নাহয় আমরা। কেউ-না-কেউ পারুলডাঙার মুখ রক্ষা করতে পারব ঠিক। কী বল?

—উচিত কথাই বলেছ উমা। সায় দিলেন রাখহরি। হৈ হৈ করে তাঁদের সমর্থন জানায় গাঁয়ের অন্য লোকেরা। আর এক প্রস্থ সাহাদের মুণ্ডপাত ক'রে সভা ভঙ্গ হল।

বাড়ি ফেরার পথে সহসা বাবলু নজর করে যে সাধুচরণ হাঁটছে তার পাশে পাশে। বাবলু সাধুদার দিকে তাকাতেই সে বাবলুর চোখে চোখ রেখে মিচকে হেসে সরে গেল।

ড্রাগন ফ্লাই

সকালবেলা দৈনিক প্রভাতী সংবাদপত্রটা নিয়ে সবে মাত্র বসেছি এমন সময় ফোন বেজে উঠল। সুনন্দ ফোন করছে— ওরা মাত্র গতকালই নাকি কলকাতায় ফিরেছে। আমার প্রতি আদেশ হল যে সেদিনই বিকেলে ওর বাড়িতে হাজির হতে হবে— আড্ডা মারতে। অনেকদিন সে আড্ডা মারতে পারেনি।

সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম।

আমি জানতাম সুনন্দরা অর্থাৎ সুনন্দ এবং তার মামা নবগোপালবাবু দক্ষিণ আমেরিকার কোথায় জানি গিয়েছেন। সুনন্দ আমার স্কুলের বন্ধু। ও প্রাণীবিদ্যায় Msc. পাস করে প্রোফেসর নবগোপালবাবুর অধীনে গবেষণা করছে। নবগোপালবাবু একজন বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী। অবশ্য আরও নানান বিষয়েও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। চিরকুমার নবগোপালবাবুর সংসারে ওই একমাত্র ভাগনে সুনন্দ ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। বালিগঞ্জে নবগোপালবাবুর নিজের বাড়িতে মামা-ভাগনের বাস।

বিকেলে সুনন্দের বাড়ি হাজির হলাম। আমায় দেখেই পরম উল্লসিত সুনন্দ দুর্বোধ্য ভাষায় হড়বড় করে কীসব বকে যেতে লাগল। গালমন্দ করাতে আপত্তি জানালে সুনন্দ বলল, সে নাকি রেড-ইন্ডিয়ান ভাষায় আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

গম্ভীর হয়ে জানাই যে ইন্ডিয়ান হলেও আমি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কাজেই বাংলোতেই কথাবার্তা হোক।

ড্রইংরুমে ঢুকে জুত করে বসলাম আড্ডা জমাতে। একটুক্ষণ পরে হঠাৎ দেয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা শো-কেসের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল।

শো কেসের মধ্যে পিচবোর্ডের ওপর নীলচে পাখিওয়ালা ইঞ্চিতিনেক লম্বা মস্ত একটা ফড়িং পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে। এটা আবার কোত্থেকে এল? আগে তো দেখিনি!

সুনন্দকে জিজ্ঞেস করি— 'কী ব্যাপার। রেড ইন্ডিয়ান কায়দায় ঘর সাজানো হয়েছে বুঝি?'

সুনন্দ বেশ চটে গেল। বলল, 'আজ্ঞে না। এটা একটি স্মৃতিচিহ্ন। জেনে রাখ এদের কৃপাতেই সেদিন প্যামপাসের তৃণভূমিতে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পেয়েছিল। আর এদের কল্যাণে কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটে গেছে।'

—'তার মানে?' আমি এবারে অথৈ জল। 'দয়া করে খুলে বল।'

সুনন্দ ফড়িংটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওটা কি বল তো?'

—'ফড়িং।'

—'হুঁ। ড্রাগন-ফ্লাই।'

—'আরে ব্বাপ। সে আবার কী?' আমার তো পিলে চমকানোর জোগাড়।

সুনন্দ আশ্বাস দেয়, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই বন্ধু। নামটা রাক্ষুসে হলেও এগুলো একজাতের বড়ো ধরনের ফড়িং-ই। নেহাতই নিরীহ। ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর আরও অনেক জায়গাতেই এদের পাওয়া যায়। বোধহয় লক্ষ্য করে থাকবি এই বাংলাদেশে বৃষ্টির ঠিক আগে বা পরে এইরকম ফড়িং ঘাসবনে ফরফর করে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। অবশ্য আমাদের দেশে এতবড়ো 'ড্রাগন ফ্লাই' সাধারণত দেখা যায় না। দুজোড়া পাতলা ঝিল্লিযুক্ত পাখাওয়ালা এই-জাতীয় ফড়িংকে ইংরেজিতে 'ড্রাগন ফ্লাই' বলে।'

অধৈর্য হয়ে ওকে থামিয়ে দিই— 'বুঝেছি, আপাতত ফড়িং-এর ওপর লেকচার বন্ধ রেখে ওই, প্রাণরক্ষা আর অর্থপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কী যেন বলছিলি, সেটা খোলসা কর।'

সুনন্দ বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে তাই বলছি। তা তোরা হলি শহরের ছেলে। জীবজন্তুর সম্বন্ধে ধারণা কম। তাই 'ড্রাগনফ্লাই' সম্পর্কে একটু প্রাথমিক জ্ঞান বিতরণ করলাম। নে চা খা, আরম্ভ করছি।'

ইতিমধ্যে দুজনের সামনে ধূমায়িত চা পরিবেশন করা হয়েছিল। চায়ে এক চুমক মেরে সুনন্দ তার কাহিনি আরম্ভ করল।

বোধহয় জানিস আমরা দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেনটিনায় গিয়েছিলাম। আর্জেনটিনার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সুবিস্তীর্ণ তৃণভূমির জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা

করাই ছিল মামাবাবুর উদ্দেশ্য। ওই তৃণভূমির নাম 'প্যামপাস'। পূর্বে 'প্যারানা' নদীর কিছু পর হতে আরম্ভ করে পশ্চিমে 'আন্ডিস' পর্বতমালার প্রায় পাদদেশ পর্যন্ত এবং উত্তরে ৩০ ডিগ্রি অক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে কলোরাডো নদী অবধি প্রায় দশ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এই প্রেরী-জাতীয় তৃণভূমি অঞ্চলে নানান বিচিত্র পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের বাস। কিছুদিন আগে মামাবাবু এই অঞ্চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সময়ের অভাবে সেবার নাকি ভালো করে অনুসন্ধান করতে পারেননি।

আমরা জাহাজে চড়ে আর্জেনটিনার রাজধানী বুয়েনস এয়ার্সে এসে হাজির হলাম। এখানে দিন তিনেক কাটালাম একটা হোটেলে। মামাবাবুর এখানে পরিচিতের সংখ্যা বড়ো কম নয়। বিশেষত তাঁর পুরোনো বন্ধু খনিজ ব্যবসায়ী মি. অ্যান্ডারসন তো রয়েছেনই।

এখান থেকে একটা বড়ো স্টেশন ওয়াগন ভাড়া করে তাতে নানারকম জিনিসপত্র বোঝাই করে আমরা প্যামপাসের দিকে যাত্রা করলাম। তৃণভূমিতে ঢোকবার ঠিক মুখে একটা ছোটো গ্রামে এসে থামলাম। এখানে একটা সরাইখানায় আমাদের কিছু মালপত্র জমা রেখে, তাঁবু, খাবারদাবার, জীবজন্তু ধরার জাল ও গবেষণার দরকারি কাগজপত্র ও যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে সেই মোটরে করেই আমরা প্যামপাসের অভ্যন্তরে যাত্রা করলাম।

এছাড়াও আমাদের সঙ্গে ছিল মামাবাবুর নিত্যসঙ্গী রাসায়নিক গবেষণার প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র ভরা একটি ছোটো বাক্স।

আমরা তিনজন— আমি, মামাবাবু আর টমাস। টমাস মামাবাবুর পূর্বপরিচিত ওই অঞ্চলের আদিবাসী, গুয়াচো সম্প্রদায়ভুক্ত রেড ইন্ডিয়ান। অতি বিশ্বস্ত ও সাহসী সহচর। ওই ছিল আমাদের ড্রাইভার। আর তার ওপরে যা রান্নার হাত কী বলব!

প্যামপাসের ভিতরে প্রায় পঞ্চাশ মাইল ঢুকে গিয়ে পথচারীদের জন্য খোঁড়া একটা কূপের পাশে আমাদের তাঁবু পড়ল। গ্রীষ্মকাল, প্রায় সমস্ত তৃণভূমি ৭।৮ ফুট লম্বা শুষ্ক শ্বেততৃণদ্বারা আচ্ছাদিত। মাঝে মাঝে বাবলা-জাতীয় একপ্রকার কাঁটা ঝোপ।

জনহীন সুবিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চল। মাঝে মধ্যে কেবল আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান জাতীয় 'গুয়াচো'রা ঘোড়ায় চড়ে প্যামপাসের মধ্যে শিকার করতে আসে। তবে রক্ষে যে একমাত্র পুমা ছাড়া হিংস্র জন্তু নেই বলে এই নির্জনে থাকতে আমাদের বিশেষ ভাবনা হচ্ছিল না।

সারাদিন দুর্লভ জীবজন্তু কীটপতঙ্গের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকতাম। কোনো কোনো দিন আমি আর মামাবাবু একসঙ্গে বেরোতাম। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই আমরা আলাদা আলাদা বেরিয়ে পড়তাম।

পিঠে একটা থলিতে নিতাম খাবার আর জল। হাতে পাখি বা কীটপতঙ্গ ধরবার জাল। গলায় ঝোলাতাম বায়নকুলারটা আর কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে এক-এক দিন এক-একদিকে বেরিয়ে পড়তাম। অবশ্য কম্পাস আর দু-একটা গবেষণার দরকারি জিনিসও সঙ্গে থাকত।

সারাদিন ঘুরতাম। কোনো একটা ঝোপের মধ্যে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিতাম। তারপর তাঁবুতে ফিরতাম বিকেলে, সূর্য ডোবার ঠিক আগে। মামাবাবুও ওই সময়ে ফিরতেন। দুজনে সারাদিনের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রহ নিয়ে খানিক আলোচনা করতাম, আর তখন নিজের তাঁবুর সামনে টমাস আগুন জ্বেলে রাতের খাবার তৈরি করত।

এরপর খাওয়া ও শোওয়া। আমি খেয়েই শুয়ে পড়তাম, কিন্তু মামাবাবু মাঝে মাঝে রাত জেগে কী সব আঁকা-জোঁকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। ওই সময়ে বুঝতাম তিনি একা থাকতে চাইছেন। কারো সঙ্গ তিনি পছন্দ করতেন না।

এক-এক দিন অনেক রাত অবধি চোখে ঘুম আসত না। আমাদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা পাশাপাশি তিনটি তাঁবু। নিজের তাঁবুতে নিদ্রাহীন শুয়ে শুয়ে ভাবতাম। সুদূর বাংলাদেশ— বন্ধুবান্ধব, পরিচিতদের কথা মনে হত। কোথায় সেই কলকাতায় আড্ডা হৈ চৈ ছেড়ে এই তেপান্তরের মাঠের মাঝে পড়ে আছি। সবটাই কীরকম অবিশ্বাস্য অবাস্তব মনে হত! তাঁবুর দরজা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতাম।

তখন শুক্লপক্ষ চলছে। জ্যোৎস্নারাতে শ্বেতশুভ্র দিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন তৃণভূমি। মৃদু মৃদু বাতাসে ঘাসবনের স্বল্প আন্দোলন— রহস্যের কুহক রাতের মায়ায় মগ্ন হয়ে যেতাম। মনে হত কোনো রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছি।

মামাবাবুর তাঁবু থেকে মাঝে মাঝে নস্যি নেওয়ার আওয়াজ ও সজোরে হাঁচির শব্দ পাওয়া যেত।

ক্রমে চোখে ঘুম নেমে আসত।

এইভাবে দিনসাতেক কেটে গেছে। সেদিন সন্ধ্যার সময় দৈনিক পরিভ্রমণ সেরে এসে আমরা তাঁবুর বাইরে বসে আছি। বেশ গরম আর গুমোট। ক্লান্ত দেহে কথাবার্তা বলছি আর মাঝে মাঝে মাংসের হাঁড়ি নিয়ে ব্যস্ত, টমাসের কাছ থেকে ভেসে আসা অপূর্ব সুগন্ধের আঘ্রাণ নিচ্ছি... এমন সময় হঠাৎ খুব কাছে

দুটো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। ভাবলাম হয়তো দুজন রেড ইন্ডিয়ান শিকারি তৃষ্ণা উপশমের উদ্দেশে আমাদের তাঁবুতে আসছে।

দ্রুত দুজন অশ্বারোহী তাঁবুর কাছে এসে থামল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ে তারা রান্নার আগুনের পাশটাতে এসে দাঁড়াল। তাদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম— এরা আবার কারা! স্থানীয় লোক তো নয়।

দুজনেরই গুন্ডা প্রকৃতির চেহারা। একজন বেজায় ঢ্যাঙা। ছোটো ছোটো ধূর্ত চোখ আর মাঝখানে খাঁড়ার মতো নাকটা। সঙ্গীটা মোটা ও বেঁটে। গোল গোল রসগোল্লার মতন চোখ দুটোতে বোকা বোকা ভাব। দুজনেরই চুল কদমফুলের মতো ছোটো করে ছাঁটা। আর দুজনেরই কোমরে মোটা বেল্ট এবং হাতে উদ্যত রিভলবার! আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ঢ্যাঙা লোকটা স্প্যানিশ ইংরেজির খিচুড়ি ভাষায় কর্কশ গলায় হুংকার ছাড়ল, 'খবরদার কেউ নড়বে না। বেয়াদপি দেখলেই মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। শয়তানের শপথ।'

টমাসকে বলল, 'তুই এখানে এসে দাঁড়া।' বলে আমাদের পাশটা দেখিয়ে দিল।

টমাস আধসিদ্ধ মাংসটা ছেড়ে আসতে একটু ইতস্তত করায় বিষম এক তাড়া লাগাল। টমাস নিরুপায় হয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। 'লোক দুটোকে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি' ব'লে ঢ্যাঙা মোটাকে হুকুম দিল, 'এদের সঙ্গে কোনো পিস্তল টিস্তল আছে কিনা দেখে নে।'

মোটা লোকটা তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করল। আমাদের সঙ্গে অবশ্য তখন কোনো অস্ত্রটস্ত্র ছিল না।

ঢ্যাঙা ফের মোটাকে আদেশ দিল— 'তুই চটপট তাঁবুগুলোর ভিতরটা খুঁজে আয়।'

মোটা তাড়াতাড়ি তাঁবুর দিকে চলে গেল, আর ঢ্যাঙাটা রিভলবার বাগিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

মামাবাবু এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, এইবার কথা বললেন— 'কী ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ঢ্যাঙা খেঁকিয়ে উঠল, 'আমরা ম্যাপটা চাই। বুঝলে হে। ভালোয় ভালোয় বের করে দাও, নইলে...।'

—'ম্যাপ কিসের?' মামাবাবু আকাশ থেকে পড়ল।

—'সোনার খনির ম্যাপ। প্যামপাসের মধ্যে যে সোনার খনি আছে তার।' উত্তেজনায় ঢ্যাঙা বাঁ হাত দিয়ে শূন্যে একটা ম্যাপ আঁকার চেষ্টা করে।

মামাবাবু আরও অবাক হলেন 'প্যামপাসে সোনা! আশ্চর্য! দেখুন, আপনারা ভুল করছেন। আমরা সোনার খবর রাখি না। জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করতে এসেছি।'

ঢ্যাঙা খিঁচিয়ে উঠল, 'বটে! বটে! শুধু জীবজন্তু! আমাদের বোকা ঠাউরেছিস, গিরগিটি ধরবার জন্যে এই মাঠের মাঝে পড়ে রয়েছিস? আমরা সব খবর রাখি। প্যামপাসের মধ্যে তোরা সোনার খনির খোঁজ পেয়েছিস।'

এমন সময় মোটা লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বলল— 'কোথাও পেলাম না। অনেক খুঁজলাম।' শুনে ঢ্যাঙার মুখ চোখ ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল।

সে মোটাকে বলল, 'তুই দাঁড়া, এবার আমি দেখছি।'

মোটা গুন্ডাটা রিভলবার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর ঢ্যাঙা আমাদের জামাপ্যান্টের সব পকেটগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজল। এমনকী জুতোর মধ্যে দেখতেও ছাড়ল না। কিন্তু ম্যাপ-ট্যাপ কিছু মিলল না।

ঢ্যাঙা এবার ক্রোধে আগুন হয়ে চিৎকার করতে লাগল— 'ভালো চাস তো ম্যাপ বের করে দে, হতভাগা ভারতীয় জোচ্চোর। আর আধ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। ম্যাপ না মিললে প্যামপাসের জন্য তিনটে মৃতদেহ উপহার দেব, আর তারপর সমস্ত তৃণভূমি খুঁড়ে ফেলব, দেখি সোনা পাই কিনা।'

হঠাৎ মনে পড়ল লোকদুটোকে বুয়েনস এয়ার্সে আমাদের হোটেলের কাছে দু-একবার দেখেছিলাম বটে। একবার নাকি হোটেলের রুম-বয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে— আমরা কোথায় যাচ্ছি, কী করতে যাচ্ছি এইসব খবর জিজ্ঞেস করেছিল। আমি অবশ্য জানতে পেরেও ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্ব দিইনি।

মামাবাবু নির্বিকার হয়ে আগুনের দিকে চেয়ে আছেন। এক-একটা মুহূর্ত অতিক্রান্ত হচ্ছে আর দু-দুটো উদ্যত রিভলবারের দিকে চেয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল। কী ম্যাপ! সোনাই বা কোত্থেকে এল, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। নিস্পন্দ 'প্যামপাস'। মৃদু চাঁদের আলোয় স্বল্পালোকিত তৃণভূমিতে মৃত্যুশীতল নীরবতা। মামাবাবুর ওপর বেজায় রাগ হচ্ছিল। সত্যি যদি সোনার ম্যাপ থাকে তো দিয়ে দিন-না। শেষে কি টাকার লোভে প্রাণটা খোয়াবেন।

ঢ্যাঙা গুন্ডাটা আবার হুংকার ছাড়ল, 'আর পনেরো মিনিট।'

সহসা কেমন একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ ভেসে এল পিছনে তাঁবুগুলোর দিক থেকে। তারপরেই আকাশ ছেয়ে বিরাট এক ফড়িং-এর ঝাঁক উড়ে এল মাথার ওপর দিয়ে। ভীষণ বেগে ফড়িংগুলো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উড়ে চলে গেল। কিন্তু বেশ-কিছু ফড়িং আমাদের জামাকাপড়ে এসে অবতীর্ণ হল। মনে হল মস্ত একটা কালো মেঘ ভেসে গেল মাথার ওপর দিয়ে আর তার থেকে যেন আচমকা এক পশলা ফড়িং বৃষ্টি হয়ে গেল আমাদের ওপর। মস্ত বড়ো বড়ো এক জাতের ড্রাগন-ফ্লাই। ওগুলোরই একটা ওই শো-কেসে সাজানো রয়েছে।

আমরা এবং গুন্ডা দুজন প্রাণপণে জামাকাপড় থেকে ফড়িংগুলো ছাড়াতে লাগলাম। সহজে কি আর ফড়িং মুক্ত করা যায়। দারুণভাবে ওগুলো লম্বা ঠ্যাং দিয়ে আমাদের জামাকাপড় আঁকড়ে ধরেছিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় গুন্ডা দুটোর মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল। একহাতে ফড়িং ছাড়াতে ছাড়াতে মোটা ষাঁড়ের মতো হাঁকতে লাগল— 'ইস, জঘন্য জায়গা। এই হতভাগারা, আর দশ মিনিট, তারপর এই পাপের ফল ভোগাচ্ছি।'

মামাবাবু হঠাৎ একটা ফড়িং তুলে ধরলেন। তারপর গুন্ডা দুজনকে জিজ্ঞেস করলেন— 'এগুলো কী ফড়িং বলতে পারেন? বেশ বড়ো বড়ো তো? আর এমন দল বেঁধে উড়ে যাওয়ার মানেই বা কী? ভারি আশ্চর্য ব্যাপার কিন্তু!'

তাই শুনে দুজনে রাগে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। ঢ্যাঙা মুখ বিকৃত করে বলে ওঠে, 'বটে! রসিকতার আর সময় পেলি না— কী ফড়িং। খুব মজার খেল। প্রাণে বহুৎ রস আছে তো?'

মামাবাবু কিন্তু নিরীহ স্বরে আবার প্রশ্ন করলেন, 'আমি জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করি কিনা তাই। তা আপনারা ফড়িং-এর ঝড়ের কথা কিছু জানেন না। সত্যি?'

টমাস এই সময় মৃদুস্বরে কী জানি বলতে গেল। মামাবাবু তাকে ধমক দিলেন— 'চুপ।' টমাস তৎক্ষণাৎ ভাবলেশহীন মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঢ্যাঙা এদিকে তেড়েফুড়ে উঠল, 'আলবাৎ জানি না। আর সাত মিনিট। তারপর প্রাণভরে গবেষণা করিস। অনন্তকাল ধরে সময় পাবি।'

মামাবাবু আনমনে কী জানি একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'দেখুন, যদি এক টিপ নস্যি নিই তো আপত্তি আছে? যা বিপদে পড়েছি, মগজটা সাফ করা একান্ত দরকার।' এই বলেই বুক পকেট থেকে তাঁর নস্যির ডিবাটা বের করলেন। হরিণের শিঙের বেশ বড়ো নস্যির কৌটা।

মোটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, 'খবরদার, কোনো চালাকির চেষ্টা যদি করেছিস তো আর আস্ত রাখব না বলছি।'

মামাবাবু শশব্যস্ত হল— 'না না, কোনো চালাকি নেই, কেবল এক টিপ নস্যি...।' এই বলে নস্যির কৌটাটা খুলে ফেললেন; তারপর বললেন, 'যাঃ, নস্যিটা দেখছি একদম জমে গেছে।' এই বলে বাঁ হাতের তালুতে সমস্ত নস্যি ঢেলে ফেললেন। অনেকখানি নস্যি প্রায় একমুঠো হবে। তারপর তিনি ডানহাতের দু আঙুলে এক টিপ নস্যি নিয়ে নাকে গুঁজে দিলেন। দুটো প্রচণ্ড হাঁচলেন, অতঃপর গুন্ডা দুজনের দিকে ফিরে বললেন— 'তা হলে সত্যিই আপনারা ম্যাপ না নিয়ে ছাড়বেন না?'

দুজনের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মোটা ঘোঁৎ করে উঠল, 'এবার বাবা পথে এসো। তোর নস্যির গুণ আছে দেখছি।'

মামাবাবু করুণ মুখ করে বললেন, 'কিন্তু আমি তো ম্যাপ এখনও তৈরি করিনি, করব ভাবছিলাম।'

মনে মনে মামাবাবুর ওপর খুব রাগ হল। উঃ, সত্যি তাহলে সোনার খবর জানেন। আর এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। ভাগ্যিস এখন সুবুদ্ধি হয়েছে।

ঢ্যাঙা বললে, 'কুছ পরোয়া নেই। জায়গাটার হদিস দিয়ে দাও, খুঁজে নেব। তবে হ্যাঁ, চালাকি যদি করেছো তো...।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মামাবাবু বললেন, 'আমরা ছাড়া পাব তো?'

—'হ্যাঁ জরুর, বলে দিলেই পাবে।' ঢ্যাঙা আর ধৈর্য রাখতে পারছিল না।

মামাবাবু চকিতে একবার পিছন ফিরে তাঁবুর দিকে তাকিয়ে নিলেন। মনে হল কান পেতে কী জানি শোনবার চেষ্টা করলেন। তারপরেই ডানহাত দিয়ে জামার বুকপকেট থেকে একটা ছোটো পাথুরে ঢেলা বার করলেন। হাত বাড়িয়ে গুন্ডা দুটোর দিকে ঢেলাটা বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'দেখুন, এটা চিনতে পারেন? আকরিক সোনা।'

ঢ্যাঙা আর মোটা পরম আগ্রহে হাত বাড়াল।

ওরা কিন্তু ভারি হুঁশিয়ার। ঢ্যাঙা প্রথমে ঢেলাটা পরীক্ষা করল, মোটা আমাদের দিকে রিভলবার বাগিয়ে ধরে থাকল। তারপর মোটা পরীক্ষা করল আর ঢ্যাঙা তাক করে রইল। দুজনেই মাথা নেড়ে সায় দিল— হ্যাঁ, সোনার আকরই বটে।

ছোট্ট একটা আগ্নেয়শিলার টুকরো। চকচক করছে। সোনা আছে বেশ বোঝা যায়।

লক্ষ্য করছিলাম মামাবাবু এই সময় একমনে কী জানি শোনবার চেষ্টা করছিলেন। আমারও হঠাৎ মনে হল বহুদূরে আমাদের পিছন দিক থেকে কেমন একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ ভেসে আসছে। ঘাস বনে জোরে হাওয়া দিলে যেমন হয়।...

মামাবাবু চকিতে আবার যেন সজাগ হয়ে উঠলেন। তাঁর কথাবার্তা কাণ্ডকারখানা কীরকম আমার অদ্ভুত ঠেকছিল। সহসা তিনি বুকপকেট থেকে তাঁর ঝরনা কলমটা খুলে নিলেন। তারপর কী এক কায়দায় কলমটার ওপর দিকে চাপ দিতেই মাথার দিকটা গেল খুলে। মাটির ওপর খোলা দিকটা উপুড় করে ধরলেন আর অমনি ভেতর থেকে কতকগুলো ছোট্ট ছোট্ট ধাতুর টুকরো ঝরে পড়ল মাটিতে। তখন তিনি একটি টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ডানহাতের দু-আঙুলে তুলে ধরে উচ্চস্বরে বলে উঠলেন— 'ভালো করে দেখুন একটি সোনার টুকরো। আর এই সোনা আমি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বের করেছি ওই আকর থেকে। এখন এই আবিষ্কারের জন্য কিছু ভাগ আশা করা কি আমার অন্যায় হবে? বলুন আপনারা? '

আগুনের আভায় হলদে সোনার টুকরোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গুন্ডা দুজনের চোখও লোভে উঠল জ্বলে। দুজনেই কাছে এগিয়ে এল।

মামাবাবু আবার কণ্ঠস্বরকে আরও কয়েক পর্দা উঁচুতে তুলে চিৎকার করে উঠলেন। এত জোরে কথা বলাটা আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকল।

—'ভালো করে দেখুন খাঁটি সোনা। আমার অনেক কষ্টের ফল।'

দু জোড়া চোখ আরও কাছে এগিয়ে এল।

আমার কানে এল সেই সাঁ সাঁ আওয়াজটা। মনে হল খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখলাম মামাবাবুর নস্যিভর্তি বাঁ হাতের মুঠোটা একটু একটু করে ওপরে উঠছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঠান্ডা ঝোড়ো দমকা বাতাস প্রবল বেগে, চারদিক লন্ডভন্ড করে আমাদের ওপর এসে পড়ল। ঝড়টা এগিয়ে এল আমাদের পিছন দিক থেকে অর্থাৎ গুন্ডা দুটোর সামনাসামনি। মুহূর্তে মামাবাবুর বাঁ হাতের মুঠোটা আততায়ী দুজনের মুখের সামনে খুলে গেল আর অমনি হাতে ধরা সমস্ত নস্যিটা বাতাসের বেগে লোক দুটোর চোখমুখের ওপর উড়ে গিয়ে পড়ল।

বিকট চিৎকার করে দু-হাতে মুখ ঢেকে দুজনেই মাটিতে বসে পড়ল, আমরাও তৎক্ষণাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ঝড়ের বেগ মিনিট দশেক পরে কমে গেল। লোক দুটো তখন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে সমানে চেঁচাচ্ছে, চোখ রগড়াচ্ছে এবং গালাগালি দিয়ে আমাদের চতুর্দশ পুরুষকে উদ্ধার করছে। মামাবাবু ইতিমধ্যে একটা প্যাকিং বাক্সের

ওপর পা তুলে জুত করে বসেছিলেন। তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন— 'মহাশয়রা খুব সম্ভব স্থানীয় অধিবাসী নন?'

—'না। তাতে ক্ষতিটা কী হয়েছে?' ঢ্যাঙার তেজ তখনও কমেনি।

—'তা ক্ষতি একটু হয়েছে বৈকি। আচ্ছা আপনাদের ভাষা ও উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে মহাশয়রা ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিবাসী? কেমন, ঠিক বলিনি?'

—'হুম। জ্যামাইকান।' মোটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

—'তা বেশ। যা হোক, প্যামপাসে ড্রাগন ফ্লাই-এর ঝড়ের রহস্য না জানার জন্য আপনাদের আর এ যাত্রায় সোনার ম্যাপ মিলল না বলে দুঃখিত।'

উনি এবার আমার দিকে ফিরলেন— 'কী? ঝড়ের বৃত্তান্ত জান না কি!'

মাথা নাড়লাম— 'না।'

—'বেশ তবে শোনো।' এই বলে মামাবাবু আমাদের তিনজনের দিকে উৎসাহিত দৃষ্টিতে তাকালেন (টমাস ততক্ষণে আবার মাংসের হাঁড়ি নিয়ে ব্যস্ত)। অতঃপর এক টিপ নস্যি নিয়ে সজোরে গোটা দুই হাঁচলেন। ইতিমধ্যে তাঁর বন্দী শ্রোতা দুজন স্প্যানিশ ইংরেজির খিচুড়ি ভাষার তোড় ছুটিয়ে দিল— তাদের আপাতত এই অসম্মানজনক বন্ধনদশার প্রতিবাদে।

শ্রোতাদের অমনোযোগিতায় অসন্তুষ্ট মামাবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। ডান হাতের তর্জনী উত্তোলন করে ধমক লাগালেন— 'আঃ, চুপ। আমায় বলতে দিন।'

এই কড়া মাস্টারের মেজাজে ভীত হয়ে অথবা ফড়িং ঝড়ের রহস্য জানাবার আগ্রহে, যে কারণেই হোক-না-কেন তারা এবার মুখ ছোটানো ক্ষান্ত দিয়ে চুপচাপ মামাবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। যেন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছেন এমনি ভঙ্গিতে মামাবাবু বলতে আরম্ভ করলেন—

'প্যামপাসে মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা উত্তর-পশ্চিম বায়ুর স্বল্পস্থায়ী ঝড় ওঠে। এর নাম এদেশে 'প্যামপেরো'। ঝড়ের পূর্বে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয় না তাই ঝটিকার আগমন হয় নিঃশব্দে প্রচণ্ড বেগে। নীলচে রঙের এই-জাতীয় ফড়িং বা 'ড্রাগন ফ্লাই'-এর ঝাঁক হল এইরকম ঝড়ের অগ্রদূত। ঝড়ের আগে আগে এরা ধেয়ে চলে বোধহয় পশ্চাদ্ধাবমান ঝড়ের কবল থেকে বাঁচবার আশায়। ফড়িং-এর ঝড়ের মিনিট দশেকের মধ্যেই আসল ঝড়ের আবির্ভাব হয়। এটা হচ্ছে প্যামপাসের আবহাওয়ার সম্পূর্ণ নিজস্ব এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। আমি আগের বার এই অঞ্চলে এসে এই 'প্যামপেরো' সম্বন্ধে অবহিত হই, আর তাই ফড়িং-এর ঝাঁকের আগমন দেখেই পশ্চাদ্ধাবনকারী ঝড়ের সম্ভাবনায় মুঠো ভরা নস্যি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

যতক্ষণ না ঝড়টা এসে পড়ে ততক্ষণ এই অতিথি দুজনকে আমার সোনা আবিষ্কারের খবরাখবর নিয়ে কালক্ষেপ করছিলাম আর উন্মুখ কান পেতে ছিলাম ত্রাণকর্তা পবনদেবের আবির্ভাব শোনার আশায়।'

মামাবাবু এইবার টমাসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি তো বাপু আর একটু হলে বলেই ফেলেছিলে আর কি।' টমাস লজ্জিত ভাবে একটু হাসল।

পরদিন সকালেই আমরা তাঁবু গুটোলাম। বন্দী দুজনকে সঙ্গে নিয়ে তৃণভূমির নিকটে যে গ্রামে আমাদের জিনিসপত্র রেখে এসেছিলাম সেখানে উপস্থিত হলাম।

মামাবাবুর সঙ্গে স্থানীয় পুলিস ইন্সপেক্টরের কী জানি কথাবার্তা হল। সেদিন দুপুরে ইন্সপেক্টর সাহেব আমাদের কাছে নেমন্তন্ন খেলেন। প্রচুর চর্ব্যচোষ্য গলাধঃকরণ করে তিনি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। এর ওপর আবার মামাবাবুর প্রদত্ত গোটা কয়েক দামি উপহারও পকেটস্থ করলেন। মোট কথা মামাবাবুর সঙ্গে তার বেজায় খাতির জমে গেল। তারপর বন্দীদের ইন্সপেক্টরের জিম্মায় রেখে দিয়ে জিনিসপত্র সব সঙ্গে নিয়ে আমাদের মোটর পরদিন সকালে বুয়েনস এয়ার্সে যাত্রা করল।

পথে কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে মামাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা মামাবাবু সোনার ব্যাপারটা কি সত্যি?'

মামাবাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান— 'তা সত্যি বটে। আগের বার যখন এখানে আসি তখন একজন স্থানীয় 'গুয়াচোর' কাছে কয়েকটা আকরিক সোনার পাথুরে ঢেলা দেখতে পাই। লোকটা বলে প্যামপাসের মধ্যে এক জায়গায় সে এই চকচকে পাথরগুলো কুড়িয়ে পেয়েছে। দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এইগুলি প্রচুর পরিমাণ সোনা মিশ্রিত একপ্রকার আগ্নেয় শিলা। তা সেবার হাতে সময় না থাকায় অনুসন্ধান করতে পারিনি। কেবল মোটামুটিভাবে যেখান থেকে পাথরগুলো কুড়িয়ে পেয়েছে সেই জায়গাটার একটা আন্দাজ নিয়ে ফিরে যাই। এবার ভেবে রেখেছিলাম জায়গাটা খুঁজে বার করব। পরীক্ষা করছি, জায়গাটাতে সত্যিই একটা সোনার খনি রয়েছে।'

—'কিন্তু গুন্ডা দুটো জানল কী করে?'

—'আরে বুয়েনস এয়ার্সে একটা রেস্তোরাঁয় বসে অ্যান্ডারসনকে ব্যাপারটা বলছিলাম, তখন পাশের টেবিলে ওরা বসে ছিল। মাতাল ভেবে খেয়াল করিনি, ব্যাটারা কিন্তু সব শুনছিল। আর তারপর থেকে সমানে পিছনে লেগেছিল। ডুবিয়ে দিয়েছিল আর কি, ভাগ্যিস সময়মতো ফড়িং-এর ঝড়টা এল। বাঁচার উপায়টাও

তখন চট করে মাথায় খেলে গেল, নইলে ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পারছিলাম না?'

—'কিন্তু ম্যাপ?

—'হয়ে গেছে। এই কলারের মধ্যে আছে।' মামাবাবু তাঁর জামার কলারে দুবার টোকা মারলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'লোক দুটোর কী করলেন?'

—'ওঃ, থানায় জমা দিয়ে দিলাম, গুন্ডামির অপরাধে। ইন্সপেক্টর বলেছেন তিনি ওদের উত্তম শিক্ষা দিয়ে দেবেন। তাঁর এলাকায় গুন্ডামি করে এত বড়ো সাহস! আর এই শিক্ষা দান করতে অন্তত তিনদিন সময় লাগা উচিত বলে তিনি মনে করেন। অবশ্য ওই তিনদিন সময়টা আমারই সাজেশন। কারণ আমাদের কার্যোদ্ধারের জন্য তিনদিন সময়ই যথেষ্ট।'

সেইদিন সন্ধ্যায় বুয়েনস এয়ার্সে পৌঁছলাম। পরদিন মামাবাবু সমস্তদিন ব্যস্ত থাকলেন। খুব ঘোরাঘুরি করলেন। আর সেইদিন রাত্রিতে আমরা দুজন কলিকাতা-গামী প্লেনে চড়লাম।

প্লেন যখন আকাশে উঠেছে মামাবাবু আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন— 'মাত্র পাঁচ হাজার ডলারে ম্যাপটা অ্যান্ডারসনকেই বিক্রি করে দিলাম, বুঝলে। হাজার হোক বন্ধু লোক। কী বল? আর এতক্ষণে ওর ম্যাপে নির্দিষ্ট জায়গাটা ইজারা নেবার সব বন্দোবস্তও আশা করি কমপ্লিট হয়ে গেছে।'

দেখলাম মামাবাবু জামার বুকপকেট থেকে অতি সন্তর্পণে একটি মৃত 'ড্রাগন ফ্লাই' বের করলেন। অর্ধনিমীলিত চক্ষে ফড়িংটির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন— 'সবই এঁদের কৃপায়, বুঝলে সুনন্দ। সবই...।'

সুনন্দের বিবরণী শেষ হল।

আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সুনন্দের ডাকে আমার চমক ভাঙে, 'কী রে চা খেলি না, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।'

জবাব না পেয়ে শো-কেসটার দিকে তাকিয়ে থাকি।

১৯৬৬

আমার অগ্রজ

সেই সহজ মানুষটি

আদ্যন্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যিক অজেয় রায়

জীবনপঞ্জি

আমার অগ্রজ

শ্রীমতী অপর্ণা চৌধুরী

অজেয় রায় এবং আমি পিঠোপিঠি ভাইবোন। দাদাকে আমি অনেকসময় একটু ঈর্ষা করতাম। কারণ দাদার নাম রেখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৫ সালে ২৭ আগস্ট দাদার জন্ম হয় শান্তিনিকেতনে। কিন্তু আমার জন্ম কলকাতায়। ছোটো থেকে আমি খুব আলাপী ছিলাম। আমার বন্ধুবান্ধব অনেক। কিন্তু দাদা ছিল খুব লাজুক। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও একান্ত কয়েকজন। আমার বন্ধুবান্ধব এলে দাদা সেখান থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়ত।

সাহিত্যের বাইরে নাটক এবং খেলার প্রতি দাদার আগ্রহের কথা অনেকেই জানে না। শান্তিনিকেতনে কলেজে ছাত্রাবস্থায় দাদার পরিচয় ছিল ভালো স্পোর্টসম্যান হিসেবে। ক্রিকেট ফুটবলের সঙ্গে স্পোর্টসের মাঠে ৮০০ মিটার দৌড়, হপস্টেপ জাম্পে প্রথম দুজনের মধ্যে ছিল ধরাবাঁধা পুরস্কার।

ছোটোবেলা থেকেই দাদার খেলার দিকে বেশ ঝোঁক ছিল। তখন আমরা কলকাতায় বালিগঞ্জের যতীন দাস রোডে থাকতাম। আমাদের পাড়ায় ছেলেদের মধ্যে গুলি ডাংগুলি বিট্টু খেলার খুব চল ছিল। দাদার হাতের টিপ ছিল খুব ভালো। তাই সব খেলাতে প্রায়ই দাদা জিতে যেত। বিপক্ষের সব গুলি জিতে গেলে অন্যরা গায়ের জোরে দাদার কাছ থেকে গুলিগুলো কেড়ে নেবার চেষ্টা করত। দাদার বরাবরই রোগা পাতলা চেহারা। আমার সেজো ভাই ছিল একটু ষণ্ডামার্কা। সে তখন অন্যদের মেরে জেতা গুলি সহ দাদাকে নিয়ে বাড়ি ফিরত। ১৫ বছর বয়সের পর দাদা লম্বা হতে আরম্ভ করে। তখন শুরু হয় ক্রিকেট ফুটবল খেলা। দাদা ওই পাতলা চেহারা নিয়েই বিশ্বভারতী এবং কলকাতায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করার সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট টিমে খেলত। ক্যারাম টেবিল টেনিসেও সমান উৎসাহ ছিল। পরবর্তী সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে অনেকেই দাদার ওই পাতলা চেহারায় খেলোয়াড় জীবন মেলাতে পারত না।

ছোটোবেলায় দাদা লাজুক স্বভাবের হলেও ভিতরে ভিতরে খুব কৌতুকপ্রিয় ছিল। রসবোধও ছিল প্রখর। শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠানের নাটকগুলো দেখে বাড়িতে এসে একটু মজার ধরনের চরিত্রের নকল করে দেখাত। 'শ্যামা' নাটকে কোতোয়ালের অভিনয়ও লম্ফঝম্প করে দেখিয়ে দিত। কিন্তু লাজুক স্বভাবের জন্য নিজে স্টেজে অভিনয় করার ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারত না।

বিশ্বভারতীতে অ্যাগ্রো-ইকনমিক রিসার্চ সেন্টারে কাজ করার সময় একবার বিদ্যাভবনের অধ্যাপক কবি অশোকবিজয় রাহা 'ফাল্গুনী' নাটকে নবযৌবনের দলে অভিনয় করার জন্য দাদাকে বললেন। খুবই সামান্য কথা। এইসব চরিত্রে অভিনয় করার জন্য লোক পাওয়া যায় না। দাদা বলত— 'আমি কিন্তু সেই পার্টটুকু করার জন্য রোজ গিয়ে প্রথম

থেকে বসে থাকতাম। সকলের অভিনয় খুব মন দিয়ে লক্ষ করতাম। বাড়িতে এসে ওইটুকু পার্টই কীভাবে বলব, স্টেজে কোথায় কীভাবে দাঁড়াব তার অভ্যেস করতাম।' এইভাবে দাদা লজ্জা-সংকোচ কাটিয়ে নাটকে অভিনয় আরম্ভ করে। চিকিৎসা-সংকট, ভূতপত্রীর যাত্রা, ভূষণ্ডীর মাঠ নাটকে দাদার অভিনয় সকলের প্রশংসা পেয়েছে।

তখন দাদা দুই মেয়ের বাবা। 'ভূষণ্ডীর মাঠ' নাটকের রিহার্সাল চলছে। একদিন সন্ধেবেলা হিঁ-হিঁ-হিঁ করে সরু গলায় এমন হাসি দিল যে বছর-চারেকের মেয়ে ঝুমা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। দাদা হেসে বলল, 'দেখলাম পেত্নীর অভিনয়টা ঠিক করতে পারছি কিনা।' স্টেজে দাদার সেই পেত্নীর অভিনয় দেখে কে বলবে বাইরে দাদা এত চুপচাপ!

আমাদের বাড়িতে বই পড়ার খুব চল ছিল। ছেলেবেলায় আমাদের জন্মদিনে বাবা এক গোছা বই উপহার দিতেন। অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য-রোমাঞ্চ বইয়ের প্রতি আমাদের দারুণ আকর্ষণ ছিল। হেমেন্দ্রনাথ রায় এবং নীহাররঞ্জন রায় দাদার প্রিয় লেখক ছিলেন। বিশেষত হেমেন্দ্রনাথের অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্য-রোমাঞ্চের নায়ক বিমল কুমার এবং জয়ন্ত মানিক ছিল দাদার প্রিয় চরিত্র।

জন্মদিনের বিকেলে বাবা কী কী বই আনবেন অধীর আগ্রহে তার জন্যে দাদা অপেক্ষা করত। দেবসাহিত্য কুটিরের নতুন বইয়ের সুন্দর গন্ধ জন্মদিনের লুচি মাংসের গন্ধকে যেন ছাপিয়ে যেত।

তখন থেকেই ওইসব অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্য রোমাঞ্চ বোধহয় দাদার মনে গল্প লেখার বীজ বুনেছিল। কলেজে পড়ার সময় আমাদের থেকে দশ-বারো বছরের ছোটো ভাইবোনদের দাদা বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাত। যদিও গল্প লেখা শুরু করে অনেক পরে, ২৭/২৮ বছর বয়সে।

আমার বিয়ের আগে মেদিনীপুরে পাঁচেটগড়ে দাদা আমার ভাবি শ্বশুরবাড়ি দেখতে গিয়েছিল। আমার স্বামীর কাছে শুনেছি— চৈত্রের খররৌদ্রে সাঁতার কাটবে বলে পুকুরঘাটে বসেছিল আমার স্বামী গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে। এমন সময় পোস্টম্যান এসে রেজিস্ট্রি বুকপোস্টে সই করিয়ে একটা পত্রিকা দাদাকে দিয়ে গেল। 'শুকতারা' পত্রিকা। তাতে দাদার গল্প ছাপা হয়েছে। দাদা তখন অন্তু রায় নামে গল্প লিখত।

'শুকতারা' পত্রিকায় দাদার গল্প দেখে সবাই হই হই করে উঠল। ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত নিজের প্রথম গল্প দেখে দাদা কিন্তু মনের উচ্ছ্বাস বাইরে বিশেষ প্রকাশ করল না। একটু লাজুক হাসির সঙ্গে পত্রিকাটা অন্যদের দেখতে দিল।

সেই সহজ মানুষটি

শ্রীঅনাথনাথ দাস

কোনো অগ্রিম সংকেত না দিয়ে, অনেক কিছু কথা অসমাপ্ত রেখে অজয়দা চলে গেলেন। ছোটোদের কাছের মানুষ ছিলেন তিনি, সৃজনশীল জগতে তাঁর বিচরণ ছিল। আমাদের কাজের সঙ্গে ব্যবধান থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু হয়তো কোথাও একটা সম্বদ্ধতা ছিল বলে ক্রমশ অজেয়দা আমাদের কাছের মানুয হয়ে পড়েছিলেন। সময় পেলেই তিনি বাড়িতে এসে যেতেন, আর আমিও চলে যেতাম তাঁদের কাছে। মঞ্জুবৌদি আর অজেয়দা— এই দম্পতির সান্নিধ্য ভালো লাগত, মনে হত নিজের বাড়িরই অংশ। কতদিন কত বৎসর ধরে এই যাতায়াত, তার কোনো হিসেব নেই। আমাদের পরিবারের সবাই অজেয়দা এলে খুশি হত। তাঁর শূন্য স্থানটি আর ভরাট হবে না।

মৃত্যুসংবাদ শান্তিনিকেতনে এসেছে অজেয়দার চরিত্রের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্য রেখে— কতকটা নিঃশব্দে, ব্যক্তিটির প্রচারবিমুখতার কথা যেন মনে রেখে। কলকাতার এক প্রকাশক আমাদের আগেই সংবাদটি জেনেছিলেন। দূরভাসে তাঁর অশ্রুভারাক্রান্ত অবরুদ্ধ কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া তখন সম্ভব হয়নি। 'পরে যোগাযোগ করছি'— বলে এখনো পর্যন্ত চুপ করে আছি।

স্মৃতি সবসময়ই সুখের। এ কথা বলা যায় না। কিছু সুখের, কিছু দুঃখের, কিছু বা সুখ-দুঃখ মিশ্রিত। অজেয়দার সঙ্গে অনেক দিনের যোগাযোগসূত্রে যে-সমস্ত স্মৃতি, তা এই মুহূর্তে সুখ দুঃখের সীমানা ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র এক অনুভবের জগতে নিয়ে আসছে। গভীর রাত্রিতে সোনাঝুরি বনের পিকনিকে ঘুমিয়ে পড়া, ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে কয়েক শতাব্দী প্রাচীন রেশমকুঠির আদিম লতাগুল্মময় জগতে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরে বেড়ানো, সাহেবদের গোরস্থানে গিয়ে ফলকের গায়ে সেইসব মৃত অশ্বারোহীদের নাম পড়া, পাশের বিশাল দিঘির গভীর জলে বেলাশেষে দীর্ঘ গাছের ছায়া পড়ার ছবিতে নিমগ্ন থাকা, গ্রামের মানুযের সঙ্গে সান্ধ্য আলাপনে তাঁর সরল আচরণে তাঁদের মুগ্ধতা, অথবা বনবাসী অধ্যাপক বিকাশদার বাড়িতে দিনভর গল্পগুজব, অথবা রাসযাত্রায় পঁচেটগড় যাব বলে বেরিয়ে পড়ে কয়েক ঘণ্টা রাস্তার ধারে শুয়ে বসে বাস না পেয়ে মোটামুটি ললাটের লিখন ধরে নিয়ে বাড়ি ফেরা— এইসব কত মিশ্রিত অনুভব।

অজেয়দার পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের যোগ কয়েক পুরুষের। মাতামহী ননীবালা রায় রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়ন কর্মের একজন সার্থক ধাত্রী। নিবিড়ভাবে তিনি নিজেকে গ্রামসেবায় উৎসর্জন করে গিয়েছেন। অজেয়দার মা লতিকা মাসিমা রবীন্দ্রনাট্যে যোগ দিয়ে যেমন রবীন্দ্রনাথ ও দর্শকমণ্ডলীকে আনন্দ দিয়েছেন, অন্যদিকে প্রায় গৌরী বসুর মতোই ইতিহাস তৈরি করেছেন নাট্যমঞ্চে নারীর আবির্ভাবে। যদিও তিনি প্রথমা নন।

অজেয়দা এই পরিবারের ব্যক্তি। তাঁর জগৎটি ছিল শিশুসাহিত্যকেন্দ্রিক। তাঁর বইগুলি আমরা পড়েছি। গল্প জমানোর শিল্পটি তিনি অনুসরণ করে গিয়েছেন। 'মুঙ্গু', 'ফোরোমন', আমাজনের গহনে'— এইসব লেখার আগে শুধু প্লট নয়, সেইসঙ্গে তিনি নিবিষ্টভাবে পড়েছেন বাংলা ইংরেজি অনেক বিজ্ঞানের বই। একটু অন্য ধরনের বই 'ফসিল'। বিষয়টি নিয়ে একটি ছোট্ট তথ্যপূর্ণ সহজ ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের বই।

অজেয়দাকে নবপর্যায় 'সন্দেশ' পত্রিকার লেখক বলাই ঠিক বলে মনে করি। আমাদের ছাত্রাবস্থায় শারদীয়া 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'মুঙ্গু' উপন্যাস বের হলে শান্তিনিকেতনের পাঠকসমাজ খুব খুশি হয়েছিলেন। আগাগোড়া চিত্রালংকরণ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত অজেয়দার প্রায় সব গল্প উপন্যাসই সত্যজিৎ রায়ের তুলির ছোঁওয়া পেয়েছে। অজেয়দাকে লেখা সত্যজিৎ রায়ের চিঠির সংখ্যা শতাধিক হতে পারে, তেমনি লীলা মজুমদারেরও। এইসব চিঠিপত্রগুলি একটি বইয়ের আকারে হাতে পেলে অনেকেই আনন্দিত হবেন, একটু অন্যভাবে অজেয়দাকে স্মরণ করাও হবে।

সত্যজিৎ রায়ের মেঘমন্দ্রস্বরে 'কী অজেয়, কী লেখা নিয়ে আছ' এখনও কানে বেজে ওঠে। আর লীলাদির এখানকার বাড়িতে পড়ন্ত বিকেল থেকে রাত্রি প্রায় আটটা পর্যন্ত যে আসর জমত, অজেয়দা তার মধ্যে অবশ্যই একটি বিশেষ স্থান নিতেন। 'পাকদণ্ডী'র শেষের দিকে লীলাদি তার একটু ছোঁওয়া দিয়ে গিয়েছেন।

সেই লীলাদির অতি স্নেহের অজেয় হঠাৎই যেন কোনো এক কুয়াশা-ঘেরা ছোট্ট স্টেশনে 'আসি' বলে নেমে গেলেন। এদিকে শান্তিনিকেতনে সান্ধ্য আড্ডায় চায়ের দোকানে অমল-অতনু-অমর্ত্যরা যে অপেক্ষা করে আছে এই খেয়ালটুকু করলেন না, এটাই আশ্চর্য!

অজেয়দা নেই। আজ, এখন, এই মুহূর্তে 'অজয়াদ্রি' বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, কন্যা, ভাইবোন, আত্মীয় বন্ধুসমাজ একটি স্মরণসভায় নিমগ্ন আছেন। শেষপর্যন্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী!

আদ্যন্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যিক অজেয় রায়

শ্রীদেবাশিস সেন

শিশু-কিশোর সাহিত্যিক অজেয় রায়। হ্যাঁ, তাঁর সাহিত্য-জীবনের একশো শতাংশই ছোটোদের। বড়োদের জন্য লেখার ফাঁকফোকরে ছোটোদের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বে কলম ধরা নয়— দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের সাহিত্য জীবনের পুরোটাই তিনি ভেবেছেন ছোটোদের জন্যই। ১৩৭০ থেকে ১৪১৫— এই পঁয়তাল্লিশ বছরে অজেয় রায় ছোটোদের জন্য লিখেছেন অজস্র গল্প, উপন্যাস এবং সামান্য কিছু প্রবন্ধও। ১৩৭০-এর মাঘ মাসের ‘শুকতারা’য় প্রকাশিত হয়েছিল অজেয় রায়ের প্রথম গল্প— ‘যেমন ইচ্ছা সাজো’। আর শেষ গল্প? না, সঠিকভাবে কোনো একটি গল্পকে তাঁর শেষ প্রকাশিত লেখা বলে চিহ্নিত করা যাবে না। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ বছরে অন্তত তিনটি শারদীয়ায় তাঁর তিনটি ছোটো গল্প প্রকাশিত হয়েছে— শারদীয়া ‘কিশোর ভারতী’তে মামাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার ‘মহাসাগরে মহাদুর্যোগ’, শারদীয়া ‘শুকতারা’য় ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টার দীপক রায়ের ‘মরণ ভয়’ এবং বার্ষিক ‘ঝালাপালা’তে ‘মন্দ বরাত’।

ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং অ্যাডভেঞ্চার— এই তিনের অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটেছে মামাবাবুর অভিযানগুলিতে। এবং একইসঙ্গে নানান ধরনের অজস্র চরিত্র চিত্রণ। সুনন্দ এবং অসিতের সঙ্গে আমরাও হয়ে যাই মামাবাবুর ভাগ্নে-কাম-সহকারী।

বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষী নদীর পাড়ে ছোট্ট গ্রাম চন্দনার দুই কিশোর শিব আর দেবুর নানান কীর্তিকলাপ নিয়ে বেশ ক-টি উপন্যাস লিখেছেন অজেয় রায়। তিনি নিজে পছন্দ করতেন উপন্যাস লিখতে। তাঁর মতে একজন সাহিত্যিকের সঠিক মূল্যায়ন হয় উপন্যাস রচনাতেই।

কিন্তু আমার মতে অজেয় রায়ের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর অসাধারণ কিছু ছোটো গল্প। খুবই সাধারণ বিষয়বস্তুকে তাঁর লেখনীর গুণে করে তুলতেন সরল গল্প। কখনো বা মানবিকতার ছোঁয়ায় আপ্লুত হতাম আমরা। ‘ভূতো’ (আনন্দমেলা) গল্পের বাচ্চা ভূতটির মনখারাপের সঙ্গী হয়ে থাকি আমরা, গল্প শেষ করার পরও বহুক্ষণ, বহুদিন। ‘লেজকাটা’ গল্পের ইঁদুরটির সঙ্গী হয়ে যাই আমরা। প্রচুর দৌরাত্ম্য করলেও আমরা কিন্তু ওকে ভালোবেসে ফেলি। ‘বেটুদার ফেয়ারওয়েল’ গল্পে আমাদের চারপাশে দেখা বহু ক্রিকেট পাগলেরই প্রতিনিধিত্ব করেন বেটুদা। ‘মোটর সাইক্লিস্ট’ (সন্দেশ) গল্পের মানুষ এবং যান্ত্রিক বাহনের আত্মিক টানকে কখনোই অবাস্তব মনে হয় না। ‘কবিতা স্যার’ (সন্দেশ), ‘ছানা’ (সন্দেশ), ‘বটুকবাবুর ছুরি’— প্রতিটি গল্পই বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন দখল করে নিয়েছে।

পার্ট টাইম নন, শিশু-কিশোর সাহিত্যের ফুলটাইম লেখক অজেয় রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরেই শিশু-কিশোর সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। বড়োদের জন্য লেখার সম্ভাবনা তাঁর কলমে থাকলেও তিনি সেই চেষ্টা কখনো করেননি। শিশু কিশোর সাহিত্যের আগামী প্রজন্মের পাঠকেরাও আশা করি মামাবাবু, দীপক, ভূতো, বেটুদাদের ভুলে যাবে না।.

জীবনপঞ্জি

অজেয় রায়ের জন্ম ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে। দিদিমা ননীবালা রায় শ্রীনিকেতন সেবাবিভাগের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। অজেয় রায়ের মা লতিকা রায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-অভিনয়ে লতিকা রায় একাধিক বার নৃত্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর পুত্রের নাম 'অজেয়' রাখেন রবীন্দ্রনাথ। পিতা পূর্ণেন্দু রায়। অজেয়রা ছয় ভাইবোন। অজেয় বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বিশ্বভারতীর কৃষি-অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রে গবেষককর্মী রূপে যুক্ত ছিলেন ও যথাসময়ে অবসর গ্রহণ করেন। অজেয় শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন বহু বছর ধরে। লেখিকা লীলা মজুমদারের উৎসাহ ও উপদেশ তাঁর লেখক জীবনের প্রধান প্রেরণা।

প্রচুর গল্প ও একাধিক উপন্যাস লিখেছেন সন্দেশ, আনন্দমেলা, কিশোর ভারতী, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকায়। সরস ও রহস্য রচনা, বিজ্ঞানভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদি ছিল অজেয়র প্রিয় বিষয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে 'মুঙ্গু', 'ফেরোমন' 'মানুক দেওতার রহস্য সন্ধানে' ইত্যাদি। তাঁর কিছু ছোটো গল্প হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে।

শিশু সাহিত্যিক অজেয় রায় অনেকগুলি সাহিত্য-সম্মান লাভ করেছেন। জগত্তারিণী স্মৃতি পুরস্কার, বিশ্বভারতী-প্রদত্ত আশালতা সেন স্মৃতি-পুরস্কার, 'সন্দেশ'-প্রদত্ত সুবিনয় রায় স্মৃতিপদক ও পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশুসাহিত্যে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-পুরস্কার প্রভৃতি।

৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ হায়দ্রাবাদে অল্পকাল রোগ ভোগ করে প্রয়াত হয়েছেন অজেয় রায়। তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা ও নাতি নাতনি বর্তমান।

'আমার অগ্রজ' ও 'সেই সহজ মানুষটি' শান্তিনিকেতনে অজেয় রায়ের স্মরণসভায় (১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮) প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা : কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন তার পর বিশ্বভারতীর কৃষি অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রে গবেষক কর্মী রূপে যুক্ত থাকেন দীর্ঘকাল।

শিশু ও কিশোরদের জন্য লিখেছেন অনেক বছর ধরে। সরস, রহস্য, বিজ্ঞাননির্ভর, অ্যাডভেঞ্চার— ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাদের ছোটোদের লেখায় বিশেষ পারদর্শী। প্রচুর গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন সন্দেশ, আনন্দমেলা, শুকতারা, কিশোর ভারতী প্রভৃতি ছোটোদের পত্রপত্রিকায়। তাঁর কিছু গল্প ছোটোদের হিন্দি পত্রিকায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

অজেয় রায় লাভ করেছেন নানান সাহিত্য সম্মান- বিশ্বভারতী-প্রদত্ত 'আশালতা সেন স্মৃতি পুরস্কার', শিশু সাহিত্য পরিষদের পুরস্কার ও পদক, সন্দেশ পত্রিকার 'সুবিনয় রায় স্মৃতি পদক' এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রদত্ত শিশু সাহিত্যে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার'।
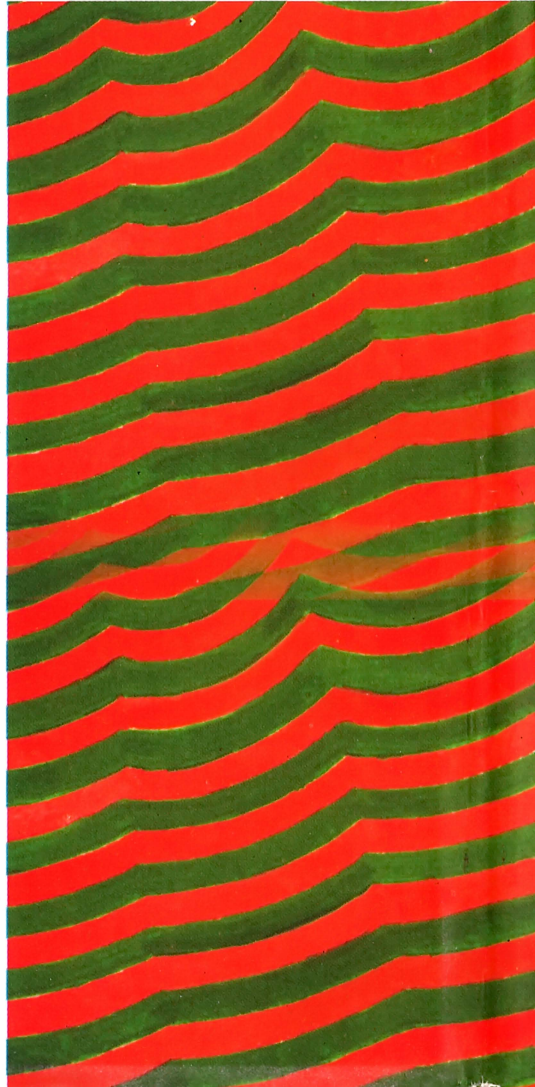
লেখকের কথায়

সম্পাদিকা (লীলা মজুমদার)-র নির্দেশ একটি রচনা সম্পর্কে

সম্পাদিকার এক চিঠি পেলাম। পড়ে আমি থ! লিখেছেন— তোমার রোমাঞ্চকর উপন্যাসটা শিগগির পাঠাও। সামনের পুজোসংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় (সন্দেশ) ছাপতে চাই।

সেই শুরু। তার পর থেকে লিখেই চলেছি। নানা রকম ছোটো গল্প। বড়ো বড়ো অ্যাডভেঞ্চার।